सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

ভারতীয় সমাজ

দ্বাদশ শ্রেণির সমাজতত্ত্ব পাঠ্যবই

প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি ।

অনুবাদ ও অভিযোজন

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

© এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

এন সি ই আর টি অনুমোদিত
প্রথম বাংলা সংস্করণ-
প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ২০২০

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : পিংকি দেবনাথ

মূল্য: ১১০ টাকা মাত্র

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই
এন সি ই আর টি-র
Indian Society-Sociology পাঠ্যপুস্তকের
২০১৮ সালের পুনর্মুদ্রণের অনূদিত সংস্করণ।

প্রকাশক
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ,
ত্রিপুরা।

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

উপদেষ্টা

১। ড. অর্ণব সেন, সহ অধ্যাপক, এন ই আর আই ই, শিলং, এন সি ই আর টি।

২। ড. অরূপ কুমার সাহা, সহ অধ্যাপক, আর আই ই, ভুবনেশ্বর, এন সি ই আর টি।

পুস্তকটি যাঁরা অনুবাদ করেছেন

১। রশ্মিতা দেব, শিক্ষিকা
২। আপি বসাক, শিক্ষিকা
৩। আলোশিখা নাথ, শিক্ষিকা

ভাষা পরিমার্জনায়

১। গৌতম রুদ্রপাল, শিক্ষক
২। এমেলী নাগ, শিক্ষিকা
৩। প্রবুদ্ধ সুন্দর কর, শিক্ষক

FOREWORD

The National Curriculum Framework (NCF) 2005, recommends that children's life at school must be linked to their life outside the school. This principle marks a departure from the legacy of bookish learning which continues to shape our system and causes a gap between the school, home and community. The syllabi and textbooks developed on the basis of NCF signify an attempt to implement this basic idea. They also attempt to discourage rote learning and the maintenance of sharp boundaries between different subject areas. We hope these measures will take us significantly further in the direction of a child-centred system of education outlined in the National Policy on Education (1986).

The success of this effort depends on the steps that school principals and teachers will take to encourage children to reflect on their own learning and to pursue imaginative activities and questions. We must recognise that, given space, time and freedom, children generate new knowledge by engaging with the information passed on to them by adults. Treating the prescribed textbook as the sole basis of examination is one of the key reasons why other resources and sites of learning are ignored. Inculcating creativity and initiative is possible if we perceive and treat children as participates in learning, not as receivers of a fixed body of knowledge.

These aims imply considerable change in school routines and mode of functioning. Flexibility in the daily time-tables is as necessary as rigour in implementing the annual calendar so that the required number of teaching days are actually devoted to teaching. The methods used for teaching and evaluation will also determine how effective this textbook proves for making children's life at school a happy experience, rather than a source of stress or problem. Syllabus designers have tried to address the problem of curricular burden by restructuring and reorienting knowledge at different stages with greater consideration for child psychology and the time available for teaching. The textbook attempts to enhance this endeavour by giving higher priority and space to opportunities for contemplation and wondering, discussion in small groups, and activities requiring hands-on experience.

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) appreciates the hardwork done by the textbook development committee. We wish to thank the Chairperson of the advisory group in Social Sciences, Professor Hari Vasudevan, and the Chief Advisor for this textbook, Professor Yogendra Singh, for guiding the work of this committee. Several teachers also contributed to the development of this textbook; we are grateful to their principals for making this possible. We are indebted to the institutions and organisations which have generously permitted us to draw upon their resources, material and personnel. We are especially

grateful to the members of the National Monitoring Committee, appointed by the Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development under the chairpersonship of Professor Mrinal Miri and Professor G.P. Deshpande, for their valuable time and contribution. As an organisation committed to systemic reform and continuous improvement in the quality of its products, NCERT welcomes comments and suggestions which will enable us to undertake further revision and refinement.

Director
National Council of Educational
Research and Training

New Delhi
20 November 2006

এই পাঠ্যবইকে কিভাবে ব্যবহার করবে

দ্বাদশ শ্রেণির সমাজতত্ত্বের দুটো পাঠ্যবইয়ের মধ্যে এটা হচ্ছে প্রথম বই। এই বইটিকে জাতীয় পাঠ্যক্রম রূপরেখা, 2005 এর জারি করা নতুন নির্দেশিকার উদ্দীপনাকে উৎসাহিত এবং সেই সঙ্গে NCERT (১নং বই) দ্বারা গৃহীত সমাজতত্ত্ব পাঠ্যক্রমের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছিল।

বাক্স 1 সমাজতত্ত্ব পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য, NCERT 2005

- ☐ শিক্ষার্থীদের তাদের বাইরের পরিবেশের সঙ্গে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম করে তোলা।
- ☐ সমাজতত্ত্বের প্রাথমিক ধারণাগুলোর সঙ্গে তাদের পরিচয় করানো যাতে তারা সামাজিক জীবনকে পর্যবেক্ষণ এবং ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়।
- ☐ সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহের জটিলতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।
- ☐ ভারতীয় সমাজের এবং বৃহত্তর বিশ্বের সামাজিক বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান জাগিয়ে তোলা।
- ☐ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমসাময়িক ভারতীয় সমাজের পরিবর্তনকে বোঝার এবং বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তৈরি করা।

একাদশ শ্রেণিতে ‘ভারতীয় সমাজ’কে দুটো বইয়ের আকারে প্রকাশ করা হয়েছে যার পরিপূরক রূপ হল দ্বাদশ শ্রেণির দ্বিতীয় বই ভারতে সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন। NCERT পাঠ্যসূচির অধ্যায় এবং বিভাগের সঙ্গে নির্দিষ্ট সাদৃশ্যতা বাক্স 2 এ দেওয়া হয়েছে। এটা একটা প্রস্তাবিত সাদৃশ্য; শিক্ষক-শিক্ষিকারা পাঠ্যসূচির অংশের সঙ্গে বিভাগের আরও প্রাসঙ্গিকতা বা উপযোগিতা খুঁজে পেতে পারেন।

বাক্স ঃ সমাজতত্ত্ব পাঠ্যসূচির প্রাসঙ্গিকতা

(পাঠ্যসূচির প্রতিটি বিভাগের পরে বন্ধনীয় ভেতর পাঠ্যসূচির বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত পাঠ্যবইয়ের অধ্যায় এবং বিভাগগুলোকে নির্দেশ করা হয়েছে।

Unit I (একক I) ভারতীয় সমাজের কাঠামো

1.1 ভারতীয় সমাজের পরিচিতি (অধ্যায় 1 ; ‘ 4.1 উপনিবেশবাদ ও নতুন বাজারের আবির্ভাব’ ; 6.1 -এ ‘সম্প্রদায়, জাতি এবং জাতি-রাষ্ট্র’)

1.2 জনসংখ্যার পরিকাঠামো (অধ্যায়-2)

1.3 গ্রামীণ-নগরীয় সংযোগ এবং পার্থক্য (অধ্যায় 2.6; 4.1) ‘সাপ্তাহিক উপজাতীয় বাজার’)

Unit II (একক II) সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্তন

2.1 পরিবার এবং আত্মীয়তা (অধ্যায় 3.3, অধ্যায় 5.3)

2.2 জাতি প্রথা (অধ্যায় 3.1; 4.1 -এ ‘জাতি-ভিত্তিক বাজার এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্র’; অধ্যায় 5.3)

2.3 উপজাতি সমাজ (অধ্যায় 3.2; 4.1-এ 'সাপ্তাহিক উপজাতি বাজারের একটি অংশ)

2.4 বাজার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান (অধ্যায় 4)

UNIT III (একক III) সামাজিক প্রতিষ্ঠান (অধ্যায় 4)

3.1 জাতি পক্ষপাত, তপশিলি জাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণি (অধ্যায় 5.1, 5.2)

3.2 উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রান্তীকীকরণ (অধ্যায় 5.1, 5.2)

3.3 নারী ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম (অধ্যায় 5.3, 3.2)

3.4 ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা (অধ্যায় 6.1, 6.3)

3.5 ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য যত্নশীলতা (অধ্যায় 5.4)

UNIT IV (একক IV) বৈচিত্রের মাঝে ঐক্যের সংপ্রশ্ন (Challenge)

4.1 সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতাবাদ ও জাতিভেদের সমস্যা (অধ্যায় 6, 5.1, 5.2)

4.2 বহুজাতিক এবং অসম সমাজে রাষ্ট্রের ভূমিকা (অধ্যায় 6, 6.1), (অধ্যায় 6, 5.1, 5.2)

4.3 আমরা সেখানে অংশগ্রহণ করি (অধ্যায় 6, 6.1, 6.4)

UNIT V (একক V) ঃ প্রকল্প (অধ্যায় 7)

ব্যবহার/প্রয়োগের জন্য পরামর্শ

ইতোমধ্যেই বলা হয়েছে যে এই পাঠ্যবইটির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল জাতীয় পাঠ্যক্রম রূপরেখার উদ্দীপনাকে প্রতিফলিত কর, যেখানে বাচ্চাদের পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত বোঝা, বিশেষ করে তথ্য আকারে পুনরুৎপাদন করাকে কম করতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও পাঠ্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাচ্চাদের সমসামায়িক সামাজিক পরিবেশ এবং দৈনন্দিন জীবনের সম্বন্ধ স্থাপন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অগত্যা এই বৈশিষ্ট্যগুলো পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু এবং বিন্যাসের পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত এবং অবশ্যই শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যবইয়ের ব্যবহারের ধরনকেও পাল্টে দিয়েছে। যদিও প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের নির্দিষ্ট শ্রেণীতে এই পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের নিজস্ব একটি ধরনের বিকাশ করবে, তাসত্ত্বেও NCF, এই নতুন পাঠ্যবই চর্চার রূপরেখা হিসেবে তথ্যকে মুখস্থ করে লেখার পদ্ধতিকে কম এবং শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করা, কার্য এবং প্রকল্পের মতো পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

NCF এর এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো যা সকল বিষয়কেই প্রভাবিত করবে, তাছাড়াও এই বইয়ের পাঠ্যসূচির সঙ্গে সম্পর্কিত নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা বিশেষভাবে প্রস্তুত করার আবশ্যকতা হতে পারে। কিছু স্পষ্ট উদাহরণ অধ্যায় 3,5 এবং 6 -এ দেওয়া আছে যেখানে জাতি এবং অন্যান্য ধরনের বৈষম্য ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কিত বিষয় আছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে তাঁর নিজের শ্রেণিকক্ষের সামাজিক গঠনের উপর ভিত্তি করে এবং কোনো সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীকে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে না ফেলে এই ধরনের সংবেদনশীল বিষয়কে উপস্থাপন করার নিজস্ব পদ্ধতি তৈরি করতে হবে। সেই সঙ্গে এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে সমাজের প্রভাবশালী বর্গের শিক্ষার্থীদের নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া বিষয় এবং মতামতের উপর পুনরায় চিন্তাধারা করার জন্য উৎসাহিত করা। আংশিকভাবে এই বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে, তৃতীয় অধ্যায়ে কাজের সংখ্যা কম রাখা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট শ্রেণি ও অবস্থার ভিত্তিতে পদ্ধতি নির্ণয়ের দায়িত্ব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এই ব্যতিক্রম ছাড়া, পাঠ্যবইয়ের বাকি অংশ কার্যভিত্তিক করার চেষ্টা করা হয়েছে। কাজগুলোকে খুব যত্নসহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এগুলো পাঠ্যবইয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হতে পারে। স্থানীয় পরিস্থিতি অনুসারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এগুলোর সংশোধন অবশ্যই করতে পারে, কিন্তু দয়া করে যেন এড়িয়ে না যায়। এখানে বিভিন্ন ধরনের কাজ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে এক ধরনের নতুন কাজ রয়েছে যাকে অনুশীলনী বলা হয়। এগুলো পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত নির্দিষ্ট পাঠ্য বা সারণীর উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের এটার নির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। এগুলোকে বাধ্যতামূলক হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। তথ্য বাক্স যা প্রাসঙ্গিক উপাদান সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং যা মূল্যায়নমূলক সামগ্রীর অংশ নয় (যেমন, শিক্ষার্থীদের এই উপাদানের উপর পরীক্ষা করা হবে না) এই বাক্সগুলো রঙিন (অর্থাৎ ছাই রং ছাড়া অন্যান্য আদর্শ রঙের বাক্সগুলো)।

পাঠ্যকে অতিরিক্ত চাপযুক্ত না করার জন্য, আমরা খুব বেশি সহায়ক (reference) বা উদ্ধৃতির উল্লেখ করিনি। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে প্রদত্ত সহায়কগুলো শুধুমাত্র একটি তালিকা হিসেবে দেওয়া হয়নি, সেটা গ্রন্থপঞ্জি লেখার উদ্দেশ্যে দেওয়া। যা হোক, যেখানে নির্দিষ্ট তথ্য অথবা উদ্ধৃতি জড়িত সেখানে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা কোনও অতিরিক্ত পাঠ্য বা পাঠ্য সামগ্রী প্রয়োজনীয় মনে করলে সেটার ব্যবহারকে অবশ্যই স্বাগত জানানো হবে। পাঠ্যবইয়ের শেষে একটি সুসংহত শব্দকোশ রয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের এটির সাহায্য নিতে উৎসাহিত করা উচিত। পাঠ্যবইয়ের বিশদ বর্ণিত ধারণা বা তথ্যাদি সাধারণত শব্দকোশে অন্তর্ভুক্ত থাকে না। পাঠ্যপুস্তকে প্রথমবার ব্যবহৃত শব্দ যা শব্দকোশে দেওয়া আছে, সেগুলোকে বেশিরভাগ bold আকারে লেখা হয়। মনে রাখবে, bold আকারে লেখা প্রত্যেকটি শব্দ শব্দকোশে পাওয়া যাবে, কিন্তু সেই সঙ্গে শব্দকোশে আরও অনেক শব্দ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

প্রকল্প এবং ব্যবহারিক কাজ সম্পর্কে একটি বিশেষ কথা। বৈশিষ্ট্যটি নতুন এবং মূল্যায়নের পদ্ধতিতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন জড়িত। যেহেতু, সমাজতত্ত্বে, কুড়ি শতাংশ (20%) নম্বর এই বিভাগে প্রদান করা হয়, তাই এটার উপর গভীর মনোযোগ দেওয়া উচিত। একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে (সমাজতত্ত্ব পরিচয়, পঞ্চম অধ্যায়) আলোচিত পদ্ধতিগুলোর সংক্ষিপ্ত অনুচিন্তনের পাশাপাশি কিছু পরামর্শও সপ্তম অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের কাজের সময়সূচি বিবেচনায়, সপ্তম অধ্যায়টিকে তুলনামূলকভাবে প্রথমদিকে আলোচনা করা হোক (অন্যান্য সকল অধ্যায়ের শেষে না করে), সাধারণতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় আলোচনার পরে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের শেষ পর্যায়ে সপ্তম অধ্যায়ের পুনর্বিবেচনা করতে পারে, তবে প্রকল্পগুলোর নির্বাচন এবং সেগুলোর উপর কাজ অনেক আগেই শুরু করা উচিত। প্রকল্পের পরামর্শগুলো নিছক নির্দেশক; অনুগ্রহ করে সপ্তম অধ্যায়ে উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতা এবং পদ্ধতিগত বিবেচনার কথা মাথায় রেখে নির্দ্বিধায় নিজস্ব প্রকল্প রূপায়ণ করতে পারো।

দ্বাদশ শ্রেণির জন্য NCF -এর নতুন উদ্যোগকে তুলে ধরতে এটা NCERT- এ প্রথম প্রচেষ্টা। এই পাঠ্যবইকে আরও উন্নত করতে আমরা ইতোমধ্যে কিছু উপায় সম্পর্কে অবগত হয়েছি এবং আমরা আরও আত্মবিশ্বাসী যে আগামী বছরের মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আরও অনেক পরামর্শ এবং মন্তব্য নিয়ে আসবে যা এটিকে সংশোধন করতে আমাদের সহায়তা করবে। আমাদের এখানে লিখতে হলে দয়া করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখুন; বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষা বিভাগ, সমাজ বিজ্ঞান ও মানবতত্ত্ব, NCERT শ্রী অরবিন্দ মার্গ, নতুন দিল্লি-110016. (The Head, Department of Education in the Social Sceinces and Humanities, NCERT, Shri Aurobindo Marg, New Delhi-110016.) অথবা ncertsociologytexts@gmail.com এই id তে ইমেলও পাঠাতে পারেন। আমরা প্রচ্ছদ এবং বিন্যাসের উন্নতিসাধনের জন্য আপনাদের প্রতিক্রিয়া এবং পরামর্শের সঙ্গে সমালোচনামূলক মন্তব্যের অপেক্ষায় থাকলাম। আমরা এই বইয়ের পরবর্তী সংস্করণে সকল প্রয়োজনীয় পরামর্শ স্বীকার করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

TEXTBOOK DEVELOPMENT COMMITTEE

Chairperson, Advisory Committee for Social Sciences Textbooks at the Higher Secondary Level

Hari Vasudevan, *Professor*, Department of History, University of Kolkata, Kolkata.

Chief Advisor

Yogendra Singh, *Emeritus Professor*, Centre for the Study of Social Systems, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

Advisors

Satish Deshpande, *Professor*, Department of Sociology, Delhi School of Economics, University of Delhi, Delhi.

Maitrayee Chaudhuri, *Professor*, Centre for the Study of Social Systems, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

Members

Amita Baviskar, *Professor*, Institute of Economic Growth, Delhi.

Anjan Ghosh, *Fellow*, Centre for Studies in Social Sciences, Kolkata.

Carol Upadhya, *Fellow*, National Institute of Advanced Studies, Bangalore.

Khamyambam Indira, *Assistant Professor*, North East Regional Institute of Education, NCERT, Shillong.

Kushal Deb, *Professor*, Department of Humanities and Social Sciences, Indian Institute of Technology, Mumbai.

Manju Bhatt, *Professor*, Department of Education in Social Sciences, NCERT, New Delhi.

Tasong Newmei, *Assistant Professor*, North East Regional Institute of Education, NCERT, Shillong.

Member-coordinator

Sarika Chandrawanshi Saju, *Assistant Professor*, RIE, Bhopal.

ACKNOWLEDGEMENTS

The many debts incurred in meeting the challenge of producing this textbook under a very tight schedule are gratefully acknowledged here. First of all, thanks to all the colleagues who took time off from their other commitments to devote their energies to this task. For contributing substantially to the content of this textbook, thanks to the editorial team members: Amita Baviskar, Kushal Deb, Anjan Ghosh and Carol Upadhya. We are also grateful to Prof. Nandini Sundar, Department of Sociology, University of Delhi; Ms. Nitya Ramakrishnan, Advocate, New Delhi; Ms. Lata Govindan, Lucknow; Ms. Seema Banerjee, Laxman Public School, New Delhi; and Mr. Dev Pathak, Bluebell International School, New Delhi for their feedback and inputs.

Special thanks are due to Ms. Shweta Rao, who took on the challenge of designing this book and procuring some photographs from different sources in record time. Her contributions are visible on every page.

Prof. Yogendra Singh, our Chief Advisor, was, as always, a pillar of support who gave us the necessary confidence to proceed. He and Professor Krishna Kumar, Director of the NCERT, provided the *abhay hastha* that enabled and guided our collective efforts. Professor Savita Sinha, Head, Department of Education in the Social Sciences and Humanities lent unstinting support. Dr. Shveta Uppal, *Chief Editor* at NCERT, not only facilitated our work but encouraged us to aim higher than we would have dared to otherwise.

Special thanks are due to Ms. Vandana R. Singh, *Consultant Editor*, NCERT for going through the manuscript and suggesting relevant changes. The Council gratefully acknowledges the contributions of Ms. Nazia Khan, *DTP Operator*; Mr. R. P. Singh and Mr. Kshirod Chandra Patra, *Proof Readers*; and Mr. Dinesh Kumar, *Incharge*, Computer Station in shaping this textbook. We are also grateful to the Publication Department, NCERT for all their support.

Finally, we are grateful to all the institutions and individuals who have kindly allowed us to use material from their publications, each of which is acknowledged in the text. Thanks are due to Dr. C.P. Chandrashekhar, Dr. Ramachandra Guha, and Mr. Basharath Peer for use of material from their articles in *Frontline*, the *Times of India*, and *Tehelka* respectively. The NCERT is specially grateful to Mr. R. K. Laxman for allowing us to use his cartoons in this textbook, and to Dr. Malavika Karlekar for the use of photographs from her book, *Visualizing Indian Women 1875-1947*, published by Oxford University Press, New Delhi. Some photographs were taken from material published by the Rajasthan Tourism Department, Government of India, New Delhi; *India Today*, *Outlook* and *Frontline*. The Council thanks the authors, copyright holders and publishers of these materials. The Council also acknowledges the Press Information Bureau, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi for allowing the use of photographs available in their photo library. A collage was prepared by a Class VI student of St. Mary's, New Delhi, Ms. Mahima Chopra, and the NCERT is grateful to her. Some photographs were provided by the Samrakshan Trust, New Delhi; Ms. Aarti Nagraj, New Delhi; Mr. Y. K. Gupta and Mr. R. C. Das of the Central Institute of Educational Technology, NCERT, New Delhi. The Council gratefully acknowledges all these contributions.

CONSTITUTION OF INDIA

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

Fundamental Duties – It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

পাঠ্যসূচি

এই পাঠ্যবইকে কিভাবে ব্যবহার করবে	
প্রথম অধ্যায়	
ভারতীয় সমাজের পরিচিতি	1-8
দ্বিতীয় অধ্যায়	
ভারতীয় সমাজে জনসংখ্যার পরিকাঠামো	9-40
তৃতীয় অধ্যায়	
সামাজিক প্রতিষ্ঠানঃ ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্তন	41-60
চতুর্থ অধ্যায়	
বাজার- একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান	61-80
পঞ্চম অধ্যায়	
সামাজিক অসাম্য ও বহিষ্কারের নমুনা	81-112
ষষ্ঠ অধ্যায়	
সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের প্রতিবন্ধকতা	113-140
সপ্তম অধ্যায়	
প্রকল্প রূপায়ণের জন্য পরামর্শ	141-152
শব্দকোশ	153-160

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় সমাজের পরিচয়

এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থে বা যৌক্তিকতায়, সমাজতত্ত্ব যে-কোনো অন্য বিষয় থেকে ভিন্ন যেগুলো হয়তো তোমরা পূর্বে অধ্যয়ন করেছ। এই বিষয়টি এমন একটি বিষয়, যার অধ্যয়ন শূন্য থেকে শুরু হয় না, কেন না — সকলেরই সমাজ সম্পর্কিত অল্প কিছু হলেও ধারণা থাকে। অন্য বিষয়গুলি সম্পর্কে আমরা শিখি কারণ, সেগুলো আমাদের পড়ানো হয় (বিদ্যালয়ে, বাড়িতে কিংবা অন্য কোথাও); কিন্তু সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞান হল অর্জিত, তবে স্পষ্ট শিক্ষণ দ্বারা নয়। "স্বাভাবিক" ভাবে বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই সামাজিক জ্ঞান অর্জন করা হয়, যা বেড়ে উঠার প্রক্রিয়ায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। কোনো শিশু থেকে এটা প্রত্যাশিত নয় যে বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে তার ইতিহাস, ভূগোল, মনোবিজ্ঞান বা অর্থনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান থাকবে। কিন্তু দেখা যায় ছয় বছর বয়সি শিশুরও সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্কের উপর খানিকটা ধারণা থাকে। তাহলে এটাও সত্য, যে একজন আঠারো বছরের প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে কোনো অধ্যয়ন ছাড়াই তোমাদেরও সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে, বিশেষ করে যে সমাজে তোমরা বসবাস করছ।

সমাজতত্ত্ব সমাজের অধ্যয়ন করে। সমাজ সম্পর্কিত পূর্ব জ্ঞান বা পরিচিতি উভয়ই সুবিধা ও অসুবিধা রূপে কাজ করে। সুবিধা হল যে সাধারণত ছাত্রদের সমাজতত্ত্বের অধ্যয়ন নিয়ে কোনো ভীতি থাকে না — তাদের মনে হয় এটা কোনো কঠিন বিষয় নয়। তবে অসুবিধাটি হল এই যে পূর্ব জ্ঞান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তখনই যখন সমাজতত্ত্বকে জানতে এবং শিখতে গেলে, আমাদের সমাজ সম্পর্কিত পূর্ব ধারণাগুলি ভুলে যেতে হয়। আসলে প্রাথমিক স্তরে সমাজতত্ত্বের শিক্ষা গঠিত হয় এই ধরনের পূর্বের শেখা ধারণাগুলোকে ভোলার চেষ্টার উপর। এই প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক, কেন না আমাদের সমাজ সম্পর্কিত পূর্ব ধারণা — আমাদের সাধারণ বোধ কোনো বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে অর্জিত হয়। এই দৃষ্টিকোণটি একটি সামাজিক গোষ্ঠী এবং সামাজিক পরিবেশ থেকে গড়ে ওঠে, যেখানে আমরা সামাজিকীকৃত হই। আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট আমাদের সমাজ এবং সমাজ সম্পর্কিত অভিমত, বিশ্বাস ও প্রত্যাশাকে আকার দেয়। সাধারণত সেই বিশ্বাসগুলি ভুল নয়, তবে ভুল হতেও পারে — সমস্যা এটা যে তারা 'আংশিক' ভাবে সত্য হতে পারে। 'আংশিক' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে দুটি ভিন্ন অর্থে — অসম্পূর্ণ ('সমগ্র' শব্দের বিপরীত), এবং পক্ষপাতদুষ্ট ('নিরপেক্ষ' শব্দের বিপরীত)। তাই আমাদের 'অনায়ত্ত' জ্ঞান বা সাধারণ জ্ঞান সামাজিক বাস্তবতার আংশিক রূপকেই দেখতে সাহায্য করে; তাছাড়া এই বিশ্বাসগুলো আমাদের সামাজিক গোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণ ও স্বার্থের উপর নির্ভরশীল।

সামাজিক বাস্তবতাকে কীভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা যেতে পারে, এই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্বের কাছে কোনো সমাধান নেই। সমাজতত্ত্ববিদরা বিশ্বাস করে যে এই ধরনের অনুকূল পরিস্থিতি বিদ্যমান নয়। সেই ক্ষেত্রে আমরা সমাজকে কেবল একটি বিশেষ 'স্থানে' দাঁড়িয়ে দেখতে পাই, কিন্তু প্রতিটি 'স্থানেই' পৃথিবীর আংশিক দৃশ্য দেখায়। সমাজতত্ত্ব আমাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথিবীকে অবলোকন করতে শেখায় — এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র আমাদের ব্যক্তিগত নয়, তবে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের সমষ্টি। আমাদের সুবিধাজনক অবস্থান থেকে আমরা শুধুমাত্র এক আংশিক সত্যই উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু যখন আমরা অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গির সাথে নিজেদের ধারণাগুলির তুলনা করি, তখন আমরা বুঝতে সক্ষম হই সমগ্র পৃথিবীর ধারণা কেমন এবং প্রত্যেকটি দৃষ্টিভঙ্গিতে কী কী সুপ্ত রয়ে গিয়েছিল।

একটি দারুণ মজার বিষয় হল যে সমাজতত্ত্ব দেখাতে পারে অন্যদের দৃষ্টিতে তোমার প্রতিচ্ছটি কেমন; তাই বলতে গেলে এই বিষয়টি শেখায় কীভাবে তুমি অন্যদের দৃষ্টি থেকে নিজেকে দেখবে। এটাকেই 'স্বপ্রতিক্রিয়াশীলতা' (**'self-reflexivity'**), বা কখনও কখনও 'প্রতিক্রিয়াশীলতা' (**reflexivity**) বলা হয়। এটাই হল নিজেকে নিজে প্রতিফলিত করার ক্ষমতা, নিজের দৃষ্টিকে নিজের উপর স্থির বা নিক্ষেপ করা, (যা সাধারণত বহির্মুখী হয়)। কিন্তু এই আত্মপরিদর্শন সমালোচনামূলক হতে হবে — অর্থাৎ নিজের সমালোচনার গতি দ্রুত অথচ প্রশংসা ধীর গতিতে করতে হবে।

তোমরা বলতে পারো যে প্রাথমিক স্তরে, ভারতীয় সমাজ এবং তার পরিকাঠামো এক ধরনের সামাজিক মানচিত্র তৈরি করে, যেখানে তোমরা নিজেকে শনাক্ত (locate) করতে পারো। ভৌগোলিক মানচিত্রের মতো, নিজেকে সামাজিক মানচিত্রে শনাক্ত করাও অর্থবহুল কারণ এটাই তোমাদের বুঝতে সাহায্য করবে যে অন্যদের তুলনায়, সমাজে তোমাদের অবস্থান কোথায়। উদাহরণস্বরূপ, ধরো তুমি অরুণাচল প্রদেশে বসবাস কর। এবারে যদি তুমি ভৌগোলিক মানচিত্র দেখ, লক্ষ করবে যে তুমি ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্যে বসবাস করছো এবং আরও জানবে যে তোমার রাজ্য অন্য বড়ো রাজ্য যেমন উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ-এর তুলনায় ছোটো। কিন্তু সেই রাজ্য আবার মণিপুর, গোয়া, হরিয়ানা, পাঞ্জাব এর মতো রাজ্যগুলি থেকে বড়ো। মানচিত্রের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি দেখলে, তোমরা জানতে পারবে, অরুণাচলপ্রদেশে কী ধরনের ভূখণ্ড রয়েছে (পাহাড়, জঙ্গল) এবং অন্যান্য রাজ্যের ও অঞ্চলগুলির তুলনায়, অরুণাচলে কী প্রকারের প্রাকৃতিক সম্পদ পরিপূর্ণ।

একটি তুলনামূলক সামাজিক মানচিত্র এটা বলতে সক্ষম যে সমাজে তোমরা কোথায় অবস্থিত। উদাহরণস্বরূপ যে সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত একজন 17 বা 18 বছরের ছেলে বা মেয়ে আছে, তাকে তরুণ (Young People) বলা হয়। তোমাদের সমবয়সি বা তোমাদের চেয়ে ছোট বয়সের লোকদের নিয়ে ভারতবর্ষের 40 শতাংশ জনসংখ্যা গড়ে উঠেছে। তোমরা হয়তো কোন বিশেষ আঞ্চলিক বা ভাষাগত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, যেমন একজন গুজরাটি ভাষাভাষী সাধারণত গুজরাটের বাসিন্দা বা একজন তেলেগু ভাষী অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা হয়ে থাকে। দেখা যায়, তোমার পিতামাতার পেশা ও পরিবারের আয় নির্ধারণ করে থাকে যে তুমি কোন্ অর্থনৈতিক শ্রেণির সদস্য হবে যথা নিম্ন, মধ্যবর্তী বা উচ্চ শ্রেণি। আবার হতে পারে তুমি কোনো বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়, জাতি বা উপজাতি কিংবা অন্য সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য। এই প্রতিটি পরিচিতি তোমাকে সামাজিক মানচিত্রে শনাক্ত করতে এবং সামাজিক সম্পর্কের জালগুলোকে বুঝতে সাহায্য করবে। তাই সমাজতত্ত্ব এটা বলতে পারে যে সমাজে কী প্রকারের গোষ্ঠী রয়েছে, তাদের একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কগুলি কীরূপ এবং তোমাদের নিজের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পর্কগুলো কীভাবে কাজ করছে।

সমাজতত্ত্ব শুধু নিজেকে এবং অন্যদের চিহ্নিত করতে সাহায্য করে না, উপরন্তু বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর পরিস্থিতিকেও বর্ণনা করে। বিখ্যাত আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ C.Wright Mills লিখেছেন, সমাজতত্ত্ব 'ব্যক্তিগত সমস্যা' এবং 'সামাজিক সমস্যা'র মধ্যে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করে। এখানে Mills ব্যক্তিগত সমস্যা বলতে বিভিন্ন প্রকারের ব্যক্তিগত উদ্বেগ, সমস্যা বা উত্তেজনাকে বুঝিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, হয়তো বা তুমি তোমার পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ বা ভাইবোন কিংবা বন্ধুদের ব্যবহারে অখুশি, আবার হতে পারে তোমার ভবিষ্যৎ বা চাকরির সম্ভাবনা নিয়ে তুমি চিন্তিত। কিন্তু এই সবকিছুই একজন ব্যক্তি সম্পর্কিত এবং তার অর্থও ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে, সামাজিক সমস্যা বড়ো গোষ্ঠী সম্পর্কিত হয় এবং কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে না।

তাই "প্রজন্মগত ব্যবধান" বা প্রবীণ এবং নবীন প্রজন্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব হল এক সামাজিক পরিঘটনা, যা সাধারণত বেশির ভাগ সমাজে ও সময়কালে দেখা গেছে। বেকারত্ব বা পরিবর্তনশীল ব্যবসায়িক পরিকাঠামোর প্রভাব এক অন্যতম সামাজিক সমস্যা যা বিভিন্নভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরূপ, তথ্য প্রযুক্তি দফতরে

আকস্মিকভাবে চাকরির বৃদ্ধি ও তারই সঙ্গো কৃষি শ্রমের চাহিদায় হ্রাস এরই অন্তর্গত। সাম্প্রদায়িকতা বা দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্য বিদ্বেষ, অথবা জাতিবাদ তথা জাতিভেদ যেখানে কিছু জাতিরা অন্য জাতিদের নির্যাতন বা বহিষ্কার করে থাকে — এই ধরনের সমস্যা ব্যাপকভাবে সমাজে বিস্তার লাভ করছে। উপরিউক্ত পরিস্থিতিগুলোতে একজন ব্যক্তি কী ধরনের ভূমিকা পালন করবে সেটা ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান তথা পরিস্থিতি নির্ধারণ করে থাকে। তাই তথাকথিত একজন উচ্চ জাতি বা বর্ণের ব্যক্তি, যে জাতিবাদে বিশ্বাসী — সে এই স্থিতিতে অপরাধী। অন্যদিকে তথাকথিত নিম্ন জাতিবর্ণের ব্যক্তিটিও এই পরিস্থিতিতে একজন প্রতারিত মানুষ রূপে সংযুক্ত। একই প্রকারে স্বতন্ত্র সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে, পুরুষ ও মহিলা উভয়ই, লিঙ্গ বৈষম্য দ্বারা প্রভাবিত — কিন্তু ভিন্ন রূপে।

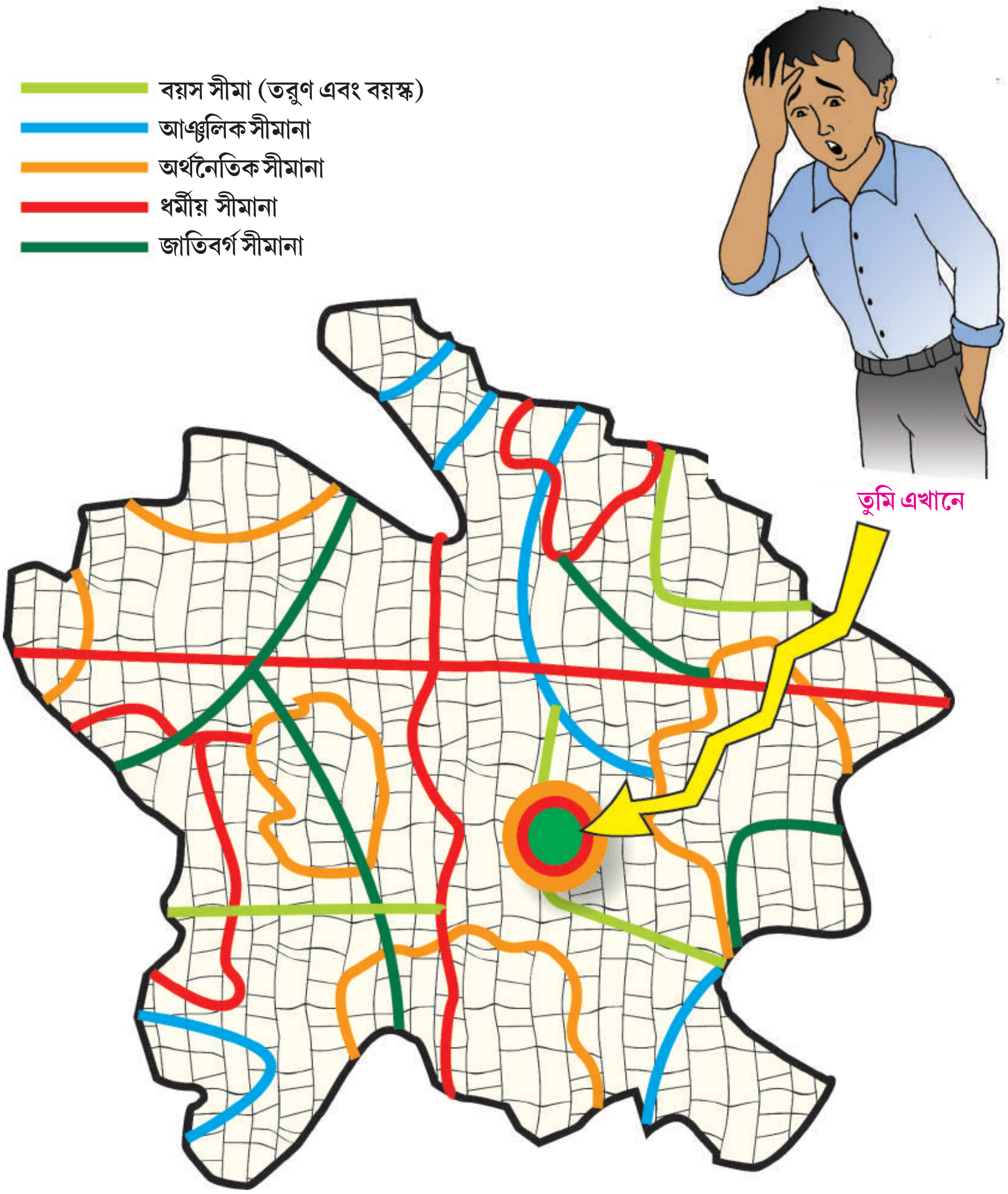

সামাজিকীকরণ বা যে পদ্ধতিতে আমরা পৃথিবীকে অনুভব করতে শিখি, এই প্রকারেরই এক মানচিত্র যা আমরা শৈশবেই প্রাপ্ত করে থাকি। এই মানচিত্রটি হল সাধারণ বোধের বা জ্ঞানের মানচিত্র। কিন্তু যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, এই ধরনের মানচিত্র বিভ্রান্তিকর হতে পারে। আমাদের কাছে সাধারণ বোধের মানচিত্র ছাড়া, অন্য কোনো তৈরি মানচিত্র নেই। এর কারণ হল আমাদের সামজিকীকরণ বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীতে না হয়ে শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠীতেই হয়ে থাকে। তাই যদি আমাদের অন্য প্রকারের মানচিত্রের প্রয়োজন হয়, তাহলে সেই মানচিত্র তৈরি করতে শিখতে হবে। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ সেই সব সামাজিক মানচিত্র তৈরি করতে শেখায়।

1.1 এক পরিচয়ের পরিচিতি ...

এই পাঠ্যপুস্তকটির উদ্দেশ্য হল ভারতীয় সমাজের সাথে তোমাদের পরিচয় করানো। কিন্তু সেই পরিচয়টি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে হবে এবং সাধারণ বোধ থেকে নয়। তবে এই পরিচয়ের পরিচিতি সম্পর্কে কী বলা যেতে পারে? সম্ভবত, এই মুহূর্তে ভারতীয় সমাজকে আকার দিতে যেই সকল বৃহত্তর প্রক্রিয়াগুলি কাজ করেছে, সেই প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে করা হবে।

বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে, ভারতীয় চেতনার উদ্ভব ঔপনিবেশিক শাসনকালে ঘটে। ঔপনিবেশিক শাসন প্রথমবারেরর মতো ভারতবর্ষের একত্রীকরণ করে এবং পুঁজিবাদী আর্থিক পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচয় করায়। সাধারণত সেই সময় যে সব পরিবর্তন ঘটে তা ছিল অপরিবর্তনীয় --- সমাজ তার পূর্বস্থিত পরিস্থিতিতে কোনো দিনও আর ফিরতে পারে নি। ঔপনিবেশিক শাসনকালে অনেক সাধন করে ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক একতা ঘটে। ভারতীয় সমাজ ঔপনিবেশিক শোষণ ও তার প্রভাবে ভীত হয়ে ওঠে। কিন্তু এটাও সত্য যে উপনিবেশবাদই তার নিজ শত্রু 'জাতীয়তাবাদকে' জন্ম দেয়।

ঐতিহাসিক স্তরে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদই ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে গড়ে উঠতে আকার দেয়। একই প্রকারের ঔপনিবেশিক প্রভাবের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে একত্রিত করতে এবং বল প্রদানে সাহায্য করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সাহায্য নিয়ে সেই সময়ের উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণিগুলো উপনিবেশবাদের বিরোধিতা করতে শুরু করে। গভীরভাবে দেখতে গেলে উপনিবেশবাদ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাই ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনঃআবিষ্কারের প্রেরণা যোগায়। এইভাবে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক গতিবিধি বিকশিত হয় যা সেই সময়ের উদীয়মান সম্প্রদায়গুলিকে রাষ্ট্রীয় এবং আঞ্চলিক স্তরে ঘনীভূত করে।

উপনিবেশবাদ নব্য শ্রেণি এবং সম্প্রদায়ের জন্ম দেয় যারা পরবর্তী সময়ের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যায়। নগরীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি জাতীয়তাবাদের মূল বাহক হয়ে ওঠে এবং তারাই স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপে ধর্মীয় এবং জাতিভিত্তিক সম্প্রদায়গুলি নিশ্চিত রূপ পায়। এরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমকালীন ভারতীয় সমাজের ভাবী ইতিহাস, যেসব জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিকশিত হয়। সেই সম্পর্কিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে করা হয়েছে।

1.2 পাঠ্যপুস্তকটির প্রাক্ পরিচয়

সমাজতত্ত্বের দুইটি পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে, প্রথম পাঠ্যপুস্তকে তোমরা ভারতীয় সমাজের মৌলিক পরিকাঠামোর সঙ্গো পরিচিত হবে। দ্বিতীয় পাঠ্যপুস্তকটি ভারতীয় সমাজের সামাজিক পরিবর্তন এবং উন্নয়নের বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করবে।

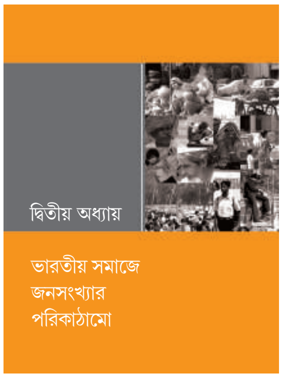

আমরা ভারতীয় সমাজের জনসংখ্যা পরিকাঠামোর (অধ্যায় ২) আলোচনা দিয়ে শুরু করব। তোমরা নিশ্চয়ই জান, ভারতবর্ষ এখন পৃথিবীর দ্বিতীয় জনবহুল দেশ এবং অনুমান করা হচ্ছে, আগামী কয়েক দশকের মধ্যে চিনকে ছাড়িয়ে, ভারত পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ হয়ে উঠবে। সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা এবং জনসংখ্যাবিদরা কীভাবে জনসংখ্যা অধ্যয়ন করেন? জনসংখ্যার কোন্ দিকগুলি সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এই বিষয়গুলিতে কী কী ঘটেছে? আমাদের জনসংখ্যা কি উন্নয়নের প্রতিবন্ধক নাকি উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে কিছু প্রকারে সাহায্যও করছে? এই ধরনের কিছু প্রশ্নের উত্তর অধ্যায়টি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবে।

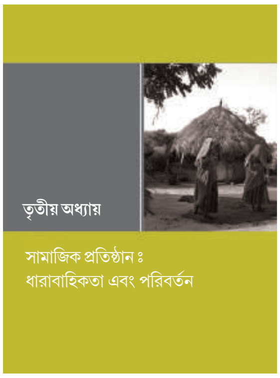

তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতীয় সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ-জাতি, উপজাতি এবং পরিবার সম্পর্কিত বিষয়গুলি পুনরায় দেখা হবে। ভারতীয় উপমহাদেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে জাতি সর্বদা বিভিন্ন পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কী প্রকারে প্রতিষ্ঠানটির পরিবর্তন ঘটছে এবং সম্প্রতিকালে জাতি বলতে কী বোঝায়? কী প্রসঙ্গে ভারতীয় সমাজে উপজাতি ধারণাটির সূচনা হয়? উপজাতিদের কী প্রকারের সম্প্রদায় হওয়া উচিত এবং তাদের এইভাবে সংজ্ঞায়িত করতে কী ধরনের ঝুঁকি পরিলক্ষিত হয়? সমসাময়িক ভারতে উপজাতি সম্প্রদায়গুলি নিজেদের কীভাবে সংজ্ঞায়িত করে? সর্বশেষে, দ্রুত এবং তীব্র সামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে, পরিবারকে এক প্রতিষ্ঠানরূপে ব্যাপক চাপের সম্মুখীন হতে হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধরনের পরিবারগুলিতে কী কী প্রকারের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে গিয়ে, তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতীয় সমাজের অন্যান্য দিকগুলো যেমন - জাতি, উপজাতি এবং পরিবারকে দেখার ভিত তৈরি করে।

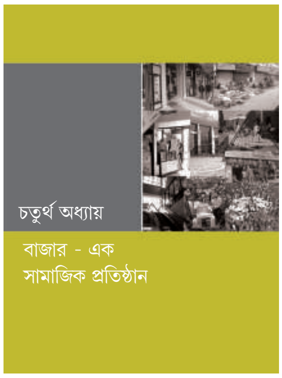

চতুর্থ অধ্যায়ে, বাজার- যা এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, তার সামাজিক -সাংস্কৃতিক মাত্রাগুলি অনুসন্ধান করা হবে এবং পাশাপাশি আলোচনা করা হবে কীভাবে বিশ্ব ইতিহাসে 'বাজার' হয়ে উঠেছিল পরিবর্তনের বাহক। ভারতবর্ষে প্রথমত উপনিবেশবাদ ও পরবর্তী সময়ে উন্নয়নশীল নীতি দ্বারা ব্যাপক এবং দ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। এই অধ্যায়টিতে আরও দেখবে ভারতে কীভাবে বিভিন্ন প্রকারের বাজারের উদ্ভব হয় এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রতিক্রিয়ার গতি শুরু হয়।

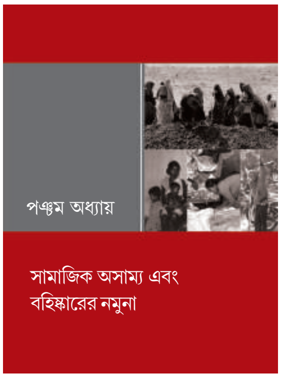

আমাদের সমাজের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সব থেকে চিন্তনীয় বিষয় হল সামাজিক অসাম্য এবং বহিষ্কার করার অপরিমিত ক্ষমতা। পাঠ্যপুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে। এই অধ্যায়ে অসাম্য এবং বহিষ্কারকে জাতি, উপজাতি, লিঙ্গ ও অক্ষমতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। কুখ্যাত জাতি ব্যবস্থা সমাজে বিভাজন এবং অন্যায় ঘটিয়ে থাকে, তা রাষ্ট্র ও নিপীড়িত জাতি দ্বারা সংশোধন বা বাতিল করারও প্রয়াস হয়েছে। এই প্রয়াসগুলো কী কী প্রকারের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে? অতীতের আন্দোলন জাতি বহিষ্কারকে বিরোধিতা করতে কতটা সফল হয়? উপজাতি আন্দোলনের বিশেষ সমস্যাগুলি কী ছিল? বর্তমানে কী পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতিরা নিজ পরিচিতি পুনঃস্থাপন করতে চাইছে? এই ধরনের প্রশ্নগুলি লিঙ্গ সম্পর্কিত এবং অক্ষমদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝার চেষ্টা হয়েছে। আমাদের সমাজ সামাজিকভাবে অক্ষমদের প্রয়োজনীয়তাগুলি নিয়ে কতটুকু সংবেদনশীল? যে সব সামাজিক প্রতিষ্ঠান নারী নির্যাতনের সহায়ক, তাদের উপর নারী আন্দোলনের কতটা প্রভাব পড়েছে?

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হবে যে ভারতীয় সমাজের অপরিসীম বৈচিত্র্য কীভাবে কিছু কঠিন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই অধ্যায় আমাদের স্বাভাবিক সুবিধাজনক চিন্তাধারা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে আহ্বান করে। ভারতবর্ষের সুপরিচিত স্লোগান ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য’ — এই কথাটিরও কঠিন এবং জটিল দিক রয়েছে। সকল ব্যর্থতা এবং অপ্রতুলতা থাকা সত্ত্বেও এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রদর্শন ভালো ছিল।

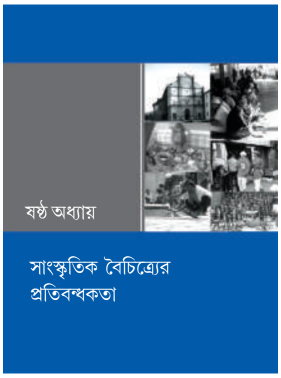

কী ছিল আমাদের শক্তি এবং দুর্বলতা? আমাদের দেশের তরুণ প্রাপ্তবয়স্করা কীভাবে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, আঞ্চলিক বা ভাষাগত, উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং জাতিভেদকে দূরে না সরিয়ে, কিংবা তাতে মগ্ন না হয়ে, সেই সব কিছুর মোকাবিলা করে? ভারতের যৌথ ভবিষ্যতের জন্যে, এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের দেশে, সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতা বা বিপন্ন বোধ করে না?

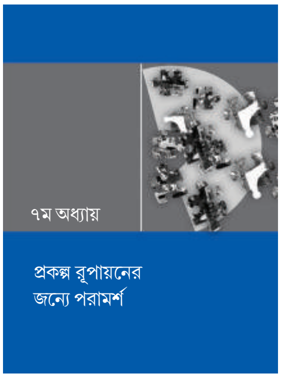

সর্বশেষে, সপ্তম অধ্যায়ে তোমাদের এবং তোমাদের শিক্ষকদের জন্য কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যা পাঠ্যবিষয়ের প্রায়োগিক দিক চিন্তা করতে সাহায্য করবে। তোমরা অনুভব করবে, এই প্রকল্প রূপায়ন— মজাদার এবং আনন্দদায়ক।

Notes

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় সমাজে জনসংখ্যার পরিকাঠামো

জনতত্ত্ব (Demography) হল জনসংখ্যার সুশৃঙ্খল অধ্যয়ন। ইংরেজি শব্দ Demography-র উৎস গ্রিক ভাষা থেকে এবং দুটি গ্রিক শব্দ Demos (জনতা/জনসাধারণ) এবং graphein (বর্ণনা করা) দ্বারা গঠিত। জনতত্ত্ব বিষয়টির অন্তর্গত, জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবণতা ও প্রক্রিয়ার অধ্যয়ন করা হয়ে থাকে, যেমন জনসংখ্যার আকারের পরিবর্তন; জন্ম, মৃত্যু ও প্রচরণের এর নমুনা; এবং জনসংখ্যার গঠন ও পরিকাঠামো, অর্থাৎ মহিলা, পুরুষ এবং বিভিন্ন বয়সি গোষ্ঠীর (age group) আপেক্ষিক অনুপাত। জনতত্ত্বের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে যেমন নিয়মমাফিক জনতত্ত্ব (Formal demography) যা পরিমাণাত্মক / পরিমাণগত ক্ষেত্র নিয়ে বেশির ভাগ কাজ করে থাকে এবং সামাজিক জনতত্ত্ব যা জনসংখ্যার সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করে। সকল প্রকারের জনতত্ত্বের অধ্যয়ন গণনা প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল যেমন, জনগণনা বা সার্ভে যেখানে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করা জনগণ বা লোকের নিয়মবদ্ধ ভাবে উপাত্ত (data) সংগ্রহ করা হয়।

জনতত্ত্ব এমন একটি বিষয় যা সমাজতত্ত্বের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত সমাজতত্ত্বের উদ্ভব এবং এক সমৃদ্ধশালী শিক্ষাগত বিষয় রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য অনেকভাবেই জনতত্ত্বের কাছে ঋণী। আঠারোশো শতাব্দীর শেষভাগে, মোটামুটি একই সময়ে ইউরোপে দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রথমত, মুখ্য রাজনৈতিক সংগঠন রূপে জাতি রাষ্ট্রের (nation states) গঠন, এবং দ্বিতীয়ত পরিসংখ্যান সম্পর্কিত আধুনিক বিজ্ঞানের প্রারম্ভ। পরবর্তী সময়ে এই ধরনের আধুনিক রাষ্ট্র, নিজেদের ভূমিকা এবং কার্যাবলির বিস্তার ঘটাতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ, --- এরা প্রাথমিক জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, কৃষি এবং শিল্প সম্পর্কিত অর্থনৈতিক নীতি, কর এবং রাজস্ব উৎপাদন ও নগরীয় শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদিতে সক্রিয় আগ্রহ দেখায়।

রাষ্ট্রের নতুন কার্যকলাপগুলোর প্রতিনিয়ত বিস্তৃতির জন্য প্রয়োজন ছিল নিয়মাবদ্ধ এবং নিয়মিত সামাজিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা --- তার সঙ্গে জনসংখ্যার ও অর্থনীতির বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের পরিমাণগত উপাত্ত সংগ্রহ করা। রাষ্ট্র দ্বারা এই সামাজিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ করার পরিশীলন বহু পুরোনো, কিন্তু 1800 শতাব্দীর শেষভাগে, রাষ্ট্র এই পরিশীলন পদ্ধতির আধুনিক স্বরূপ বা নমুনাটি সম্পর্কে অবগত হয়। সম্ভবত 1790 -এর আমেরিকার জনগণনাকে প্রথম আধুনিক জনগণনা হিসাবে ধরা হয়, এবং 1900 শতাব্দীর প্রথমভাগে সমগ্র ইউরোপে এই পদ্ধতিটি প্রচলিত হয়। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম জনগণনা ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 1867-72 সালের মাঝামাঝি সময়ে সম্পন্ন হয়। এরপর 1881 সাল থেকে, নিয়মিতভাবে প্রতি দশ বছর অন্তর জনগণনা রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত হয়। স্বতন্ত্র ভারতেও এই জনগণনার রীতি মানা হয় এবং পদ্ধতিটি চালু রাখা হয়। ভারতে 1951 সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দশ বছর অন্তর অন্তর সাতটি জনগণনা পরিচালিত হয়েছে, যার মধ্যে সব থেকে সাম্প্রতিক হল 2011 সালের জনগণনা। পৃথিবীর জনগণনা কার্যের মধ্যে ভারতীয় জনগণনাকে সবচেয়ে বড়ো বলে মানা হয়। (যদিও চিনের জনসংখ্যা ভারতের তুলনায় অধিক কিন্তু সেখানে নিয়মিতরূপে জনগণনা পরিচালিত হয় না।)

যে- কোনো রাষ্ট্রে নীতির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য, বিশেষ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনকল্যাণের ক্ষেত্রে, জনতাত্ত্বিক উপাত্তের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সামাজিক পরিসংখ্যানগুলো যখন প্রথমবার প্রকাশিত হয়ে প্রকাশ্যে আসে, সেটি সমাজতত্ত্বের এক নতুন বিষয়ের অধ্যয়নকে খুব দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। লক্ষ লক্ষ মানুষের সমন্বয়ে গঠিত জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত মোট পরিসংখ্যান (Aggregate statistics) বা সংখ্যাগত বৈশিষ্ট্য, সামাজিক ঘটনাবলির অস্তিত্বের পক্ষে প্রবল এবং জোরদার তর্ক প্রদান করে। যদিও রাষ্ট্রীয় স্তরে বা রাজ্যস্তরে কিছু পরিসংখ্যান

11

যথা মৃত্যুর হার (death rate) কিংবা প্রতি 1000 -এর জনসংখ্যায় মোট সংখ্যাটি, পৃথক পৃথক মৃত্যুর ঘটনাগুলিকে যোগ করে পাওয়া যায়। তথাপি মৃত্যুর হার কথাটি নিজেই একটি সামাজিক ঘটনা এবং সামাজিক স্তরে তার ব্যাখ্যা আবশ্যক। এই ক্ষেত্রে, একটি ভালো উদাহরণ হল, এমিল দুর্কহেইম (Emile Durkheim) এর বিখ্যাত অধ্যয়ন যা বিভিন্ন দেশে আত্মহত্যার হারের ভিন্নতা বা পার্থক্য ব্যাখ্যা করে। Durkheim-এর মতে, আত্মহত্যার হারের (1,00,000 জনসংখ্যার মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনার সংখ্যা) সামাজিক কারণগুলির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। যদিও প্রতিটি আত্মহত্যার ঘটনায় হয়তো আত্মঘাতী ব্যক্তির পরিস্থিতি বা আত্মহত্যার কারণ ভিন্ন হতে পারে।

কখনো কখনো প্রথাগত জনতত্ত্ব (Formal demography) এবং জনসংখ্যা অধ্যয়নের বৃহত্তম ক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সাধারণত প্রথাগত জনতত্ত্ব জনসংখ্যার পরিবর্তনের উপাদানের পরিমাপ ও বিশ্লেষণের সঙ্গে সম্পর্কিত। এটি পরিমাণগত বিশ্লেষণের উপর জোর দেয়। প্রথাগত জনতত্ত্বে দৃষ্টিপাত করা হয় অত্যন্ত উন্নত গাণিতিক পদ্ধতির, যার দ্বারা জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা পরিবর্তনের পূর্বানুমান করা সম্ভব। অন্যদিকে জনসংখ্যা অধ্যয়ন বা সামাজিক জনতত্ত্ব, জনসংখ্যার গঠন বা পরিবর্তনের বিস্তৃত কারণগুলির অনুসন্ধান করে। সামাজিক জনসংখ্যাবিদ্‌রা বিশ্বাস করে যে সামাজিক প্রক্রিয়া এবং গঠনই জনতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজতত্ত্ববিদগণের মতে জনসংখ্যাবিদ্‌রাও সেইসব সামাজিক কারণগুলির অনুসন্ধান করে যা জনসংখ্যার প্রণবতা বুঝতে সাহায্য করে।

2.1 জনতত্ত্ব সম্পর্কিত কিছু তত্ত্ব এবং ধারণা

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ম্যালথুসিয়ান তত্ত্ব

জনতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রচলিত তত্ত্বগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ইংরেজি রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ্ থমাস রবার্ট ম্যালথুস (1766-1834) এর নাম। ম্যালথুস এর জনসংখ্যা বৃদ্ধির তত্ত্ব একদিকে হতাশাপূর্ণ, যা তাঁর *Essay on Population* (1798) বইটিতে রয়েছে। তাঁর যুক্তিতে, মানুষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, মানুষের জীবিকার হারের (বিশেষ করে খাদ্য, বস্ত্র এবং অন্যান্য কৃষিজাত বস্তু) তুলনায় দ্রুত গতিতে হয়। তাই মানব জাতিকে সর্বদাই দরিদ্রতায় বসবাস করতে হবে কেন না কৃষি উৎপাদনের হার চিরকালই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় কম। একদিকে জনসংখ্যার বৃদ্ধি যেমন জ্যামিতিক গতিতে ঘটে (যথা 2, 4, 8, 16, 32 ইত্যাদি), অন্যদিকে কৃষি উৎপাদন শুধুমাত্র গাণিতিক অগ্রগতিতেই ঘটে (যেমন 2, 4, 6, 8, 10 ইত্যাদি)। যেহেতু জনসংখ্যা বৃদ্ধি সর্বদা জীবিকা বা জীবনধারণের উৎপাদনের সম্পদগুলিকে পিছনে ফেলে দেয়, তাই মানব জীবনে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করার একমাত্র উপায় হল জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করা। দুর্ভাগ্যবশত জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে স্বেচ্ছায় রোধ করার জন্য মানব জাতির কাছে সীমিত সক্ষমতা বা দক্ষতা রয়েছে (যেমন বিবাহ বিলম্ব করা বা যৌন সম্পর্ক পরিহার বা কৌমার্য পালন ইত্যাদির মতো কিছু প্রতিরক্ষামূলক কার্য দ্বারা)। ম্যালথুস কিছু ধনাত্মক '**positive checks**' কার্যের কথা বলেছেন — যেমন দুর্ভিক্ষ ও বিভিন্ন প্রকারের রোগ — যার দ্বারা প্রকৃতি তার নিজের মতো করে খাদ্য সরবরাহ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির অসাম্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে।

দীর্ঘকাল ধরে ম্যালথুস-এর এই তত্ত্ব মানবজাতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু পরবর্তী সময় কিছু তাত্ত্বিকরা দাবি করেন যে, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে ছাপিয়ে যেতে সক্ষম।

বাক্স 2.1

"জনসংখ্যার শক্তি পৃথিবীর দ্বারা মানুষকে ভরণ-পোষণের জন্য উৎপাদন করার শক্তি থেকে এত বেশি হয় যে মানব-প্রজাতিকে কোনো না কোনোভাবে অকাল মৃত্যুর সম্মুখীন হতেই হবে। মানব জাতির দুষ্কর্মই জনসংখ্যার হ্রাসের সক্রিয় এবং সক্ষম কারক। তারা ধ্বংসের বিশাল সেনাবাহিনীর অগ্রণী হিসেবে কাজ করে এবং প্রায়ই এই ভয়ঙ্কর কাজ নিজেরাই সম্পন্ন করে থাকে। কিন্তু তারা যদি এই ধ্বংসকার্যে অসফল হয়, তবে অসুস্থতা, মহামারী, মড়ক এবং প্লেগ ইত্যাদি ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দেয়, এবং হাজার হাজার, লাখ-লাখ লোকের মৃত্যু ঘটে। তারপরও যদি এই ধ্বংসলীলায় পুরো সফলতা না পাওয়া যায়, তখন অনিবার্যভাবে বিশাল দুর্ভিক্ষ ডাল-পালা ছড়িয়ে তার সহায়তায় উপস্থিত হয় এবং একটি শক্তিশালী ঝড়ের দাপটে জনসংখ্যার মাত্রাকে বিশ্বের খাদ্যের সমতুল্য করে আনে।"

— *থমাস রবার্ট ম্যালথুস, An essay on the principle of population, 1798.*

থমাস রবার্ট ম্যালথুস (1766-1834)

ম্যালথুস কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষ করে খ্রিস্টান যাজক হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি লন্ডনের হেলিবুরিতে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মহাবিদ্যালয়ে, ইতিহাস এবং রাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। সেই মহাবিদ্যালয়ে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।

তা সত্ত্বেও ম্যালথুস-এর তত্ত্বের বাস্তবিক খণ্ডন বা অপ্রমাণ ইউরোপীয় দেশগুলির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশের শেষ দিকে, এই পরিবর্তনগুলি বেশ নাটকীয় হয়ে ওঠে। জন্মের হারে হ্রাস এবং বিভিন্ন মহামারী রোগ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ম্যালথুসের তাত্ত্বিক অনুমান ভুল প্রমাণিত হয়। কারণ, জনসংখ্যার তীব্র বৃদ্ধি সত্ত্বেও খাদ্য উৎপাদন এবং জীবনযাত্রার মান লাগাতার উন্নতি লাভ করে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্রের কারণ ম্যালথুস-এর এই বিবৃতিটি উদারবাদী ও মার্ক্সবাদীদের দ্বারা সমালোচিত হয়। সমালোচকদের মতে, দারিদ্র ও অনাহারের কারণ অর্থনৈতিক সম্পদের অসমান বণ্টন। সম্পদের অসমান বণ্টনের ফলে একটি অন্যায্য সামাজিক ব্যবস্থা শুধুমাত্র কিছু ধনী ও সুবিধাপ্রাপ্ত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে অনুমোদন দেয় কিন্তু অন্যদিকে অধিকাংশ মানুষকে তীব্র দরিদ্রতার মধ্যে জীবনধারণ করতে হয়।

জনসংখ্যার বিবর্তন তত্ত্ব ঃ

জনতত্ত্বের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল জনতাত্ত্বিক পরিবৃত্তির তত্ত্ব। এই তত্ত্ব বিশ্বাস করে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ওতপ্রোত ও সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিটি সমাজ একটি আদর্শস্বরূপ অনুসরণ করে। সাধারণত জনসংখ্যা বৃদ্ধির তিনটি মূল পর্যায়ক্রম রয়েছে। প্রথম পর্যায় হল, অনুন্নত এবং প্রযুক্তিগতভাবে পিছিয়ে- পড়া সমাজে জনসংখ্যার নিম্নবৃদ্ধি। জন্ম এবং মৃত্যুর হারও নিম্ন। তাই এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য (বা মোট বৃদ্ধির হার) ও নিম্ন। তৃতীয় (এবং অন্তিম) পর্যায়ের উদাহরণ হল একটি উন্নত সমাজেও নিম্ন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কেন না সেখানে মৃত্যুর হার এবং জন্মের হার হ্রাস পায়, যার দরুন তাদের মধ্যে পার্থক্য অনেকটাই কম। এই দুটি পর্যায়ের মাঝে রয়েছে, এক পরিবর্তনশীল স্তর বা পর্যায় যেখানে সমাজ অনগ্রসর স্থিতি থেকে অগ্রসর স্থিতির দিকে এগিয়ে যায়। এই পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তীব্র হয়।

কাজ 2.1

পূর্বের পৃষ্ঠায় দেওয়া তথ্য এবং বাক্স 2.1 থেকে ম্যালথুস-এর উদ্ধৃতিটি (quotation) পড়ো। ম্যালথুসকে ভুল প্রমাণ করার একটি মুখ্য কারণ ছিল কৃষি উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। তোমরা কি খুঁজে বের করতে পারবে, কীভাবে এই উৎপাদনের বৃদ্ধি হয়? কী কারণগুলির জন্য কৃষি আরও উৎপাদনশীল হয়ে ওঠে? অন্যান্য কী কারণে ম্যালথুসকে ভুল প্রমাণিত করা হয়? তোমার সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে, তোমার শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

রোগ নিয়ন্ত্রণকারী উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি, উন্নত জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টির মাধ্যমে মৃত্যুর হারের হ্রাসই হল এই "জনসংখ্যা বিস্ফোরণ"-এর মূল কারণসমূহ। তথাপি এই পরিবর্তনগুলোর সাথে সমন্বয় সাধন এবং প্রজননজনিত আচরণ পরিবর্তন করতে একটি সমাজের অনেক সময় লাগতে পারে। এটা এজন্য করা হয় যাতে সমাজ অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ এবং দীর্ঘ জীবনকালের নতুন পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই ধরনের পরিবর্তন পশ্চিমী ইউরোপকে প্রভাবিত করে। কম উন্নত দেশগুলি, যারা কমে যাওয়া মৃত্যুর হার এবং জন্মের হারকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করছিল তারাও কম বেশি একই ধরনের স্বরূপ অনুসরণ করছে। ভারতবর্ষে, এখনও জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন সম্পূর্ণ হয়নি, কেন না মৃত্যুর হার কমছে অথচ জন্মের হার কম করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

সাধারণ ধারণা এবং সূচক ঃ

অধিকাংশ জনতাত্ত্বিক ধারণাগুলি, হার বা সমানুপাতের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয় — তাতে দুটো সংখ্যা যুক্ত থাকে। এই দুটো সংখ্যার মধ্যে একটি সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক — প্রশাসনিক এলাকার জন্য বিশেষ পরিসংখ্যান দ্বারা গণনা করা হয়, অপরদিকে অন্য সংখ্যাটি তুলনাত্মক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি বিশেষ এলাকায় (যেমন, একটি দেশ, রাজ্য, জেলা বা অন্যান্য আঞ্চলিক এলাকা) জন্মের হার ধরা হয় একটি নির্দিষ্টকালে/সময়ে, (যা সাধারণত এক বছর হয়), জন্ম ও জীবিত শিশুদের মোট সংখ্যা গণনা করে। একটি বিশেষ এলাকায় নির্দিষ্ট সময়কালে জন্মগ্রহণ করা জীবিত শিশুদের সংখ্যাকে ঐ এলাকার মোট জনসংখ্যা (প্রতি এক হাজারে) দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফলটা পাই সেটাকেই জন্ম হার বলা হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে প্রতি হাজার জীবিত শিশুর মোট সংখ্যাকে জন্মের হার বলে। মৃত্যুর হারও একই ধরনের পরিসংখ্যান। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি এলাকায় প্রতি হাজারের মধ্যে মোট মৃত্যুর সংখ্যাকে মৃত্যু হার বলে। এই পরিসংখ্যানটি পরিবারের সদস্যদের দ্বারা জন্ম ও মৃত্যুর খবরের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ নথিভুক্ত করার উপর। বাস্তবে ভারতের মতো অধিকাংশ দেশে আইনগতভাবে জন্ম ও মৃত্যুর ঘটনা যথাযথ কর্তৃপক্ষের (যেমন স্থানীয় থানা বা গ্রামীণ এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও নগরীয় এলাকায় পুরপরিষদ) কাছে নথিভুক্ত করাতে হয়।

জনসংখ্যার *প্রাকৃতিক বৃদ্ধির হার* বলতে জন্মের হার এবং মৃত্যুর হারের পার্থক্যকে বোঝায়। যখন এই পার্থক্যটি শূন্য (বস্তুত খুব কম) হয়। তখন জনসংখ্যার 'স্থিতিশীল' (stabilised) বা 'প্রতিস্থাপন স্তর' (Replacement Level) বলা হয়। তার কারণ এটি সেই প্রয়োজনীয় বৃদ্ধির হার (Rate of Growth) যার মাধ্যমে নবীন প্রজন্ম মৃত্যুর মুখোমুখি থাকা প্রবীণ প্রজন্মকে প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হয়। আবার, সমাজে যখন প্রজনন ক্ষমতার স্তর প্রতিস্থাপনের হারের তুলনায় কম হয়, তখন সেই সমাজ ঋণাত্মক বৃদ্ধির হার অনুভব করে। বিশ্বের অনেক দেশ ও প্রদেশ যেমন- জাপান, রাশিয়া, ইতালি এবং পূর্ব ইউরোপ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কথাটি সত্য। অন্যদিকে কিছু সমাজ তীব্র বৃদ্ধির হার অনুভব করে, বিশেষ করে সেই পরিস্থিতিতে যখন তারা পূর্বে আলোচিত জনতাত্ত্বিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়।

প্রজননের হার বলতে সন্তান ধারণে সক্ষম প্রতি 1000 জন মহিলা যাদের বয়স সীমা সাধারণ 15-49 বছর তাদের জন্ম দেওয়া জীবিত শিশুর সংখ্যাকে বোঝায়। কিন্তু পূর্বের পৃষ্ঠায় আলোচিত অন্যান্য হার যেমন জন্ম এবং মৃত্যুর হারের মতো এটাও 'অশোধিত হার'। তার কারণ হল এটা সমগ্র জনসংখ্যার আনুমানিক গড় এবং এতে বিভিন্ন বয়স সীমার মধ্যে পাওয়া পার্থক্যগুলিকে ধরা হয় না। বিভিন্ন বয়স সীমার মধ্যেকার পার্থক্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ কেন না কখনও কখনও তারা নির্দেশক বা সংকেতগুলির (Indicators) অর্থকে প্রভাবিত করে। তাই জনসংখ্যাবিদ্‌রা নির্দিষ্ট বয়সভিত্তিক হারও হিসাব করে। মোট প্রজনন হার বলতে বোঝায় জীবিত অবস্থায় জন্মানো শিশুর মোটসংখ্যা। একজন কাল্পনিক মহিলা প্রজননের বয়স সীমা অবধি জীবিত থাকাকালীন অবস্থায় যতগুলি জীবিত সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম হন এবং ওই এলাকার বয়সভিত্তিক প্রজনন হার অনুসারে এই বয়সসীমার প্রতিটি বিভাগে গড় সংখ্যক শিশুদের জন্ম দিয়ে থাকেন, তাহলে জীবিত অবস্থায় জন্মানো শিশুর মোট সংখ্যাকে মোট প্রজনন হার বলা হবে।

কাজ 2.2

এটা জানার চেষ্টা কর কেন জন্মের হার মৃত্যুর হারের তুলনায় কম? এই ধরনের কিছু কারণ কী হতে পারে যা একটি পরিবার বা দম্পতির এই নির্ণয়কে প্রভাবিত করতে পারে যে তারা কতগুলো সন্তান জন্ম দেবে? তোমার পরিবারেরর বয়োজ্যেষ্ঠদের অথবা তোমার প্রতিবেশীদের কাছ থেকে এটার সম্ভাব্য কারণ জিজ্ঞেস কর কেন বিগত দিনের লোক বেশি সন্তানের আশা করত।

শিশুমৃত্যুর হার বলতে প্রতি 1000 জন্ম নেওয়া জীবিত শিশুর মধ্যে, এক বছর পূর্ণ করার পূর্বেই মৃত শিশুর সংখ্যাটিকে বোঝায়। একইভাবে, মাতৃ নশ্বরতা/মৃত্যুহার বলতে প্রতি 1000 জন্ম নেওয়া জীবিত শিশুর জন্মের সময়ে মৃত এমন মহিলাদের সংখ্যাকে বোঝায়। শিশুমৃত্যু এবং মাতৃমৃত্যু বৃদ্ধির হার স্পষ্টত অনুন্নতি এবং দারিদ্রের লক্ষণ। যখন সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তখন এই মৃত্যুহার হ্রাস পায়, কেন না চিকিৎসা ব্যবস্থা, শিক্ষা, সচেতনতা এবং সমৃদ্ধিরও বৃদ্ধি ঘটে। অন্য একটি জটিল ধারণা হল সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল যা সাধারণত গড় ব্যক্তির আনুমানিক জীবিত থাকার বছরগুলিকে বোঝায়। কোনো নির্দিষ্ট সময়কালে একটি এলাকায় হওয়া বয়সভিত্তিক মৃত্যু হারের উপাত্ত অনুযায়ী সম্ভাব্য আয়ুষ্কালের গণনা করা হয়।

লিঙ্গ অনুপাত বলতে নির্দিষ্ট সময়কালে একটি এলাকার প্রতি 1000 পুরুষে মহিলাদের সংখ্যাটিকে বোঝায়। ঐতিহাসিক স্তরে, দেখা গেছে সারা বিশ্বের, বেশিরভাগ দেশেই মহিলাদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় সামান্য মাত্রায় বেশি। কিন্তু তথ্য অনুসারে কন্যা শিশুদের তুলনায় ছেলে শিশুদের জন্ম বেশি হয়। প্রাকৃতিকভাবে প্রতি 1000 ছেলে শিশুর তুলনায় 943-952 কন্যা শিশু জন্ম নেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি লিঙ্গ অনুপাত মহিলাদের আনুকূল্যে থাকে, তার মূলত দুটি কারণ রয়েছে, প্রথমত, ছেলে শিশুদের তুলনায় শৈশবে কন্যা শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি থাকে। দ্বিতীয়ত, জীবনচক্রের শেষভাগে, পুরুষদের তুলনায় মহিলারা দীর্ঘদিন জীবিত থাকে, যার ফলে বেশিরভাগ সমাজেই বৃদ্ধদের চেয়ে বৃদ্ধার সংখ্যা বেশি হয়। মূলত, এই দুইটি কারণ একত্রিত হওয়ার ফলেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমন একটি লিঙ্গ অনুপাত তৈরি হয়, যেখানে প্রতি 1000 পুরুষে মহিলার সংখ্যা 1050। তা সত্ত্বেও চিন, দক্ষিণ কোরিয়া এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষে লিঙ্গ অনুপাত হ্রাস পাচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, লিঙ্গ অনুপাত হ্রাসের বিষয়টি এমন সব সামাজিক রীতিনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত যেখানে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের মূল্য অনেক বেশি। ফলস্বরূপ, সমাজে কন্যাসন্তানের তুলনায় ছেলে সন্তানের বেশি চাহিদা থাকে।

জনসংখ্যার বয়স নির্ণায়ক কাঠামো বলতে মোট জনসংখ্যার বিভিন্ন বয়সি গোষ্ঠীর আপেক্ষিক অনুপাতকে বোঝায়। উন্নয়ন এবং গড় সম্ভাব্য আয়ুষ্কালের স্তরগুলি পরিবর্তনের ফলে বয়স নির্ণায়ক কাঠামোর পরিবর্তন হয়। প্রাথমিকভাবে নিম্নমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা, রোগের প্রকোপ এবং অন্যান্য কারণে মানুষের আয়ু কম হত। তাছাড়া শিশু এবং মায়ের মৃত্যুর উচ্চহারও বয়স নির্ণায়ক কাঠামোকে প্রভাবিত করত। অন্যদিকে তথাকথিত উন্নয়ন জীবনের মান এবং সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এর ফলে বয়স নির্ণায়ক কাঠামোর পরিবর্তন হয় ঃ জনসংখ্যায় তুলনামূলকভাবে কম বয়সি গোষ্ঠীর অনুপাত কম এবং অধিক বয়সি গোষ্ঠীর অনুপাত বেশি পাওয়া যায়। সাধারণত এটাকে জনসংখ্যার 'বার্ধক্যগ্রস্ত' (ageing of the population) অবস্থা বলা হয়ে থাকে।

জনসংখ্যার কত ভাগ নির্ভরশীলদের দ্বারা গ্রথিত হয়েছে (যেমন- বয়স্ক ব্যক্তিরা এবং ছোটো শিশুরা যারা কাজ করতে অক্ষম এবং কতভাগ কর্মশীল বয়সি গোষ্ঠী দ্বারা গ্রথিত (15 - 65 years) সাধারণত এই দুটোর তুলনামূলক গণনাকে *নির্ভরতা অনুপাত* বলা হয়। জনসংখ্যার 15 বছরের অনূর্ধ্ব এবং 64 বছর বয়সের উপরের মোট সংখ্যাকে যখন 15- 64 বছর বয়সি গোষ্ঠীর মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয়, সেই ভাগফলটি নির্ভরতা অনুপাতের সমান হয়। এটি সাধারণত শতাংশ রূপে লেখা হয়। যেসব দেশে বার্ধক্যগ্রস্ত জনসংখ্যার পরিমাণ বেশি সেখানে নির্ভরতা অনুপাতের বৃদ্ধি একটি বড়ো চিন্তার বিষয়। তার কারণ, তুলনামূলকভাবে ছোটো কর্মশীল বয়সি গোষ্ঠীর পক্ষে বড়ো নির্ভরশীল গোষ্ঠীর দায়িত্ব নেওয়া কষ্টকর। অন্যদিকে নির্ভরতা অনুপাতের হ্রাসকে অর্থনৈতিক বিকাশ এবং সমৃদ্ধির উৎস হিসাবে ধরা হয় কেন না, সে ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃতভাবে বেশিরভাগ জনসংখ্যা কাজ করতে সক্ষম। এটাকে কখনো কখনো জনসংখ্যার লভ্যাংশ বা পরিবর্তনশীল বয়স নির্ণায়ক কাঠামো থেকে প্রাপ্ত 'লাভ'ও বলা হয়। কিন্তু, এই লাভটিও সাময়িক, কারণ অবশেষে কর্মশীল বয়সি ব্যক্তিরাও নির্ভরশীল বৃদ্ধে পরিণত হবে।

2.2 ভারতের জনসংখ্যার আকার এবং বৃদ্ধি

চিনের পরে, ভারতবর্ষ হল দ্বিতীয় জনবহুল দেশ, যার মোট জনসংখ্যা 121 কোটি (2011 সালের জনগণনা অনুযায়ী)। সারণি 1 থেকে তোমরা দেখতে পারবে, ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবসময় উচ্চ ছিল না। 1901- 1951 -এর মাঝে, গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার 1.33% অতিক্রম করেনি। বস্তুত 1911 থেকে 1921 -এর মাঝে — 0.03% ঋণাত্মক বৃদ্ধির হার পরিলক্ষিত করা যায়। তার কারণ হল 1918-19 সালের মাঝে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ মহামারী আকারে ছড়ায়। ফলে মোট জনসংখ্যার 5% লোকের বা 12.5 মিলিয়ন লোকের মৃত্যু হয় (Visaria and Visaria 2003: 191)। স্বাধীনতার পর 1961-1981 সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যার হার প্রায় 2.2% বৃদ্ধি পায় যা মোট উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে এক অন্যতম বৃদ্ধির হার মনে করা হয়। তবে তারপর থেকেই ভারতের বার্ষিক তালিকায় অশোধিত জন্ম এবং মৃত্যুর হারের তুলনামূলক হ্রাস বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। লেখচিত্রটিতে জনসংখ্যার বিবর্তনের প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়, যেখানে 1921 - 1931 দশকের পর অশোধিত জন্ম এবং মৃত্যুর হার একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যায়।

1931 সালের পূর্বে, মৃত্যুর হার ও জন্মের হার দুটোই উচ্চ ছিল, কিন্তু এই পরিবর্তনসূচক মুহূর্তের পর, মৃত্যুর হারে তীব্র হ্রাস লক্ষ করা যায় অথচ জন্মের হারে শুধু খানিকটা হ্রাস ঘটে।

টেবিল ঃ বিংশ শতাব্দীতে ভারতের জনসংখ্যা এবং তার বৃদ্ধি

বর্ষ	মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার (%)	দশকে বৃদ্ধির হার (%)
1901	238	–	-
1911	252	0.56	5.8
1921	251	-0.03	-0.3
1931	279	1.04	11.0
1941	319	1.33	14.2
1951	361	1.25	13.3
1961	439	1.96	21.6
1971	548	2.22	24.8
1981	683	2.20	24.7
1991	846	2.14	23.9
2001	1028	1.93	21.5
2011	1210	1.64	17.6

Source: Census of India 2011 (Provisional).
website: http//censusindia.gov.in

তালিকা 1 ঃ ভারতে জন্ম এবং মৃত্যুর হার (1901-2001)

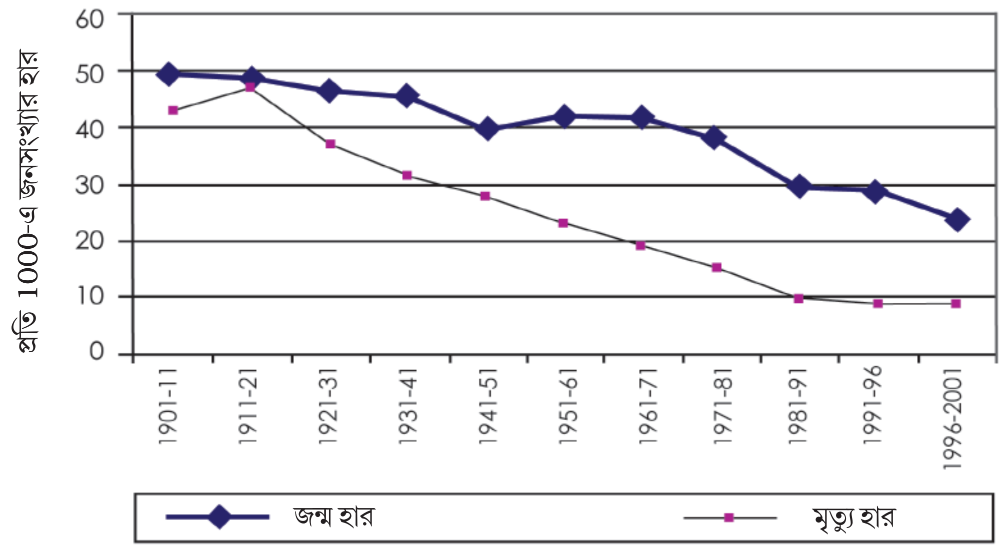

Total birth rate was reported to be 20.8 and death rate as 6.5 in India in 2015.
Source: *SRS Bulletin, Registrar General of India, 2016*

Source: *National Commission on Population, Government of India.*
website: http://populationcommission.nic.in/facts1.htm#

1921 সালের পর দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী ধরনের রোগগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, ফলে মৃত্যুর হার হ্রাস পায়। এরমধ্যে **মহামারী** রোগগুলির নিয়ন্ত্রণ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। পূর্বে মুখ্য মহামারী জাতীয় রোগগুলির মধ্যে বিভিন্ন রকমের জ্বর, প্লেগ, বসন্ত এবং কলেরা ইত্যাদির নাম অন্যতম। কিন্তু ভারতে সব থেকে বড়ো মহামারী ছিল 1918-19 সালের ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ যা 125 লক্ষ মানুষ বা সেই সময়ের মোট জনসংখ্যার 5 শতাংশের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (এই মহামারীতে মৃত্যুর বিভিন্ন পরিসংখ্যান রয়েছে, যেমন অনেক উপাত্ত মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশি বলে দাবি করে। স্প্যানিশ ফ্লু নামে খ্যাত এই ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগটি 'pandemic' মহামারী'র আকার ধারণ করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে — নীচের বাক্সে দেখো। বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে যখন কোনো মহামারী ছড়িয়ে পড়ে, তাকে pandemic মহামারী বলে — শব্দাবলি দেখো)।

1918-19 সালের বিশ্বব্যাপী Pandemic (মহামারী) ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ

বাক্স 2.2

ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি বিশেষ ভাইরাস ঘটিত রোগ, যা প্রধানত মানবদেহের শ্বাসনালির উপরের অংশ যেমন নাক, গলা, শ্বাসনালি এবং কখনো কখনো ফুসফুসকে আক্রান্ত করে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের জিনগত গঠন এই প্রকার যে, সে নিজেই ছোটোবড়ো জিনগত পরিবর্তন করতে পারে যার ফলে মানবদেহে বিদ্যমান টিকা থেকে এটি নিজেকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়। গত শতাব্দীতে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে মোট তিনবার বড়ো ধরনের জিনগত পরিবর্তন ঘটে। যার ফলস্বরূপ বিশ্বব্যাপী মহামারী ছড়িয়ে পড়ে এবং বড়ো সংখ্যায় মানুষের মৃত্যু হয়। 1918-19 সালে, সবচেয়ে অখ্যাত মহামারীর (Pandemic) নাম ছিল 'স্প্যানিশ ফ্লু', যা বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যাকে আক্রান্ত করে ও আনুমানিক 40 মিলিয়ন লোকের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সাম্প্রতিককালে আরও দুটো বড়ো ইনফ্লুয়েঞ্জা (Pandemic) মহামারীর ঘটনা ঘটে, যার কারণে বিশ্বজুড়ে রোগ এবং মৃত্যু হয়। এগুলো হল 1957 সালে 'এশিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা' এবং 1968 সালে 'হংকং ইনফ্লুয়েঞ্জা' নামক মহামারী।

1918-19 সালে সারা বিশ্বে 'স্প্যানিশ ফ্লু' এর কারণে হওয়া মৃত্যুর সঠিক হার বলা সম্ভব নয়, কিন্তু অনুমান করা হয় যে বিশ্বব্যাপী এটা জনসংখ্যার 20% কে আক্রান্ত করে এবং 2.5 – 5% জনসংখ্যার মৃত্যু হয়। তুলনামূলকভাবে দেখা গেছে ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণে প্রথম 25 সপ্তাহে প্রায় 25 মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয়। অতএব, বিশ্বজুড়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে ছয় মাসে, 25 মিলিয়ন এর বেশি মৃত্যু হয়। অন্যান্য অনুমান অনুসারে মৃত্যুর সংখ্যা দ্বিগুণ থেকেও বেশি, প্রায় 100 মিলিয়নের এর মতো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, জনসংখ্যার প্রায় 28 শতাংশ আক্রান্ত হয় এবং 500,000-675,000 সংখ্যক লোকের মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে ব্রিটেনে 200,000 সংখ্যক এবং ফ্রান্সে 400,000 সংখ্যক লোকের মৃত্যু হয়। আলাস্কা এবং দক্ষিণ আমেরিকার অনেক গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়াতে আনুমানিক 10,000 সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয় এবং ফিজি দ্বীপপুঞ্জে, প্রথম দুই সপ্তাহে জনসংখ্যার প্রায় 14% এর মৃত্যু ঘটে। ভারতে আনুমানিক 17 মিলিয়ন এর মৃত্যু হয়, যা সেই সময়কালের জনসংখ্যার প্রায় 5 শতাংশ। ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় সেনাবাহিনীতেও, প্রায় 22 শতাংশ সৈন্যের এই মহামারীর কারণে মৃত্যু হয়।

যদিও এই ফ্লু এর কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল না, কিন্তু সৈন্যদের একই সাথে থাকা এবং স্থানান্তর, এই রোগের গতিকে বৃদ্ধি করে। এটা অনুমান করা হয় যে, যুদ্ধের প্রবল চাপ ও বিভিন্ন রাসায়নিক আক্রমণের কারণে সৈন্যদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। এরফলে তাদের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

Source: Compiled from Wikipedia, and World Health Organisation;
Webpages: http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_flu
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/

উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা, গণ টিকাকরণ কর্মসূচি এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে মহামারী নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তা সত্ত্বেও আজও ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, ডাইরিয়া, আমাশয়ের মতো রোগগুলি মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদিও আগের তুলনায় মহামারীতে মৃত্যুর সংখ্যা এখন অনেকটাই কম। 1994 সালের সেপ্টেম্বর মাসে, প্লেগ রোগ সুরাটে একটি ছোটো মহামারীর আকার ধারণ করে। অন্যদিকে 2006 সালে দেশের বিভিন্ন অংশে ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়া জ্বরের মতো মহামারীর প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যায়।

দুর্ভিক্ষও বর্ধিত মৃত্যু সংখ্যার এক মুখ্য এবং আবৃত্ত কারণ। স্থায়ী দারিদ্র্য এবং অপুষ্টিকর পরিবেশের কারণেও দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। যেসব এলাকা কৃষিকাজের জন্য প্রাথমিকভাবে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল থাকত, সেখানে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। তাই যে বছর খুব কম বৃষ্টিপাত হত, দুর্ভিক্ষ হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকত। পর্যাপ্ত পরিবহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, তদুপরি এই অভাব দূর করতে সরকারি প্রচেষ্টার অপ্রতুলতা ইত্যাদিও দুর্ভিক্ষের বিশেষ কিছু কারণ। কিন্তু অর্মত্য সেন এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণদের মতে, শুধুমাত্র খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাসের ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় না। এর অন্য কারণও আছে; দুর্ভিক্ষ তখনও হয়, যখন মানুষ খাদ্যশস্য কিনতে বা প্রাপ্ত করতে অক্ষম। ভারতীয় কৃষিজাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নয়ন (বিশেষ করে জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে) উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রদ্বারা সক্রিয় ত্রাণকার্য ও প্রতিরোধক ব্যবস্থাপনা— এইসব কারণে দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তা সত্ত্বেও দেশের অনগ্রসর অঞ্চলে আজও অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। সরকার গ্রামীণ এলাকায় জাতীয় গ্রামীণ রোজগার যোজনা আইনের মাধ্যমে অনাহারের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করছে।

তবে মৃত্যুর হারের মতো, জন্মের হার লক্ষণীয়ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি, তার মূল কারণ, জন্মের হার এক সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া যা অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে পরিবর্তন হয়। সমৃদ্ধির বর্ধিত স্তর, জন্মহারকে নিম্নগামী করে দেয়। যখন শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এবং সার্বিকভাবে মানুষ শিক্ষিত ও সচেতন হয়, তখন পরিবারের আকারও ছোটো হতে শুরু করে। চার্ট নং ২ (২০ নং পৃষ্ঠায়)-এ তোমরা লক্ষ করবে যে ভারতে রাজ্যভিত্তিক স্তরে প্রজনন হারের ব্যাপক ভিন্নতা দেখা যায়। কেরালা এবং তামিলনাড়ুর মতো কিছু রাজ্যে মোট প্রজনন হার হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে 1.7 (2009) পর্যন্ত চলে এসেছে। অর্থাৎ কেরালা এবং তামিলনাড়ুতে একজন সাধারণ মহিলা, শুধুমাত্র 1.7 শিশুর জন্ম দেয়; যা 'প্রতিস্থাপন স্তর' থেকে নীচে। কেরালার মোট প্রজনন হারও প্রতিস্থাপন স্তরের নীচে রয়েছে, ফলে ভবিষ্যতে সেখানে জনসংখ্যার হ্রাস হতে পারে। হিমাচলপ্রদেশ, পশ্চিমবাংলা, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যেও মোট প্রজনন হার অনেক কম। কিন্তু বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশের মতো কিছু রাজ্যে উচ্চ প্রজনন হার লক্ষ করা যায়। 2009 সালে এইসব রাজ্যের মোট প্রজনন হার যথাক্রমে 3.9, 3.3, 3.3 এবং 3.7 হয়। 2015 সালে, SRS Bulletin অনুসারে, ভারতের মোট জন্মহার 22.4% ছিল। তার মধ্যে গ্রামীণ অঞ্চলে 22.4% এবং নগরীয় অঞ্চলে 17.3%। ভারতে সবচেয়ে উচ্চ জন্মহার যে দুটি রাজ্যে পরিলক্ষিত হয়, তা হল উত্তরপ্রদেশ (26.7%) এবং বিহার (26.3%)। সম্ভবত এই দুটি রাজ্য মিলে 2026 সাল পর্যন্ত ভারতের জনসংখ্যার 50% বৃদ্ধি করতে পারে। অনুমান করা হয় উত্তরপ্রদেশ একাই জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ (22%) বৃদ্ধি করতে পারে। 3 নং চার্টে তোমরা দেখবে যে, ভারতের রাজ্যগুলিকে কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলসমূহে ভাগ করা হয়েছে। তোমরা এটাও দেখবে যে সেইসব অঞ্চলসমূহ ভিত্তিক জনসংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে কীভাবে সহায়তা করছে।

তালিকা ঃ 2 ভারতে রাজ্যভিত্তিক জন্মের হার, 2016

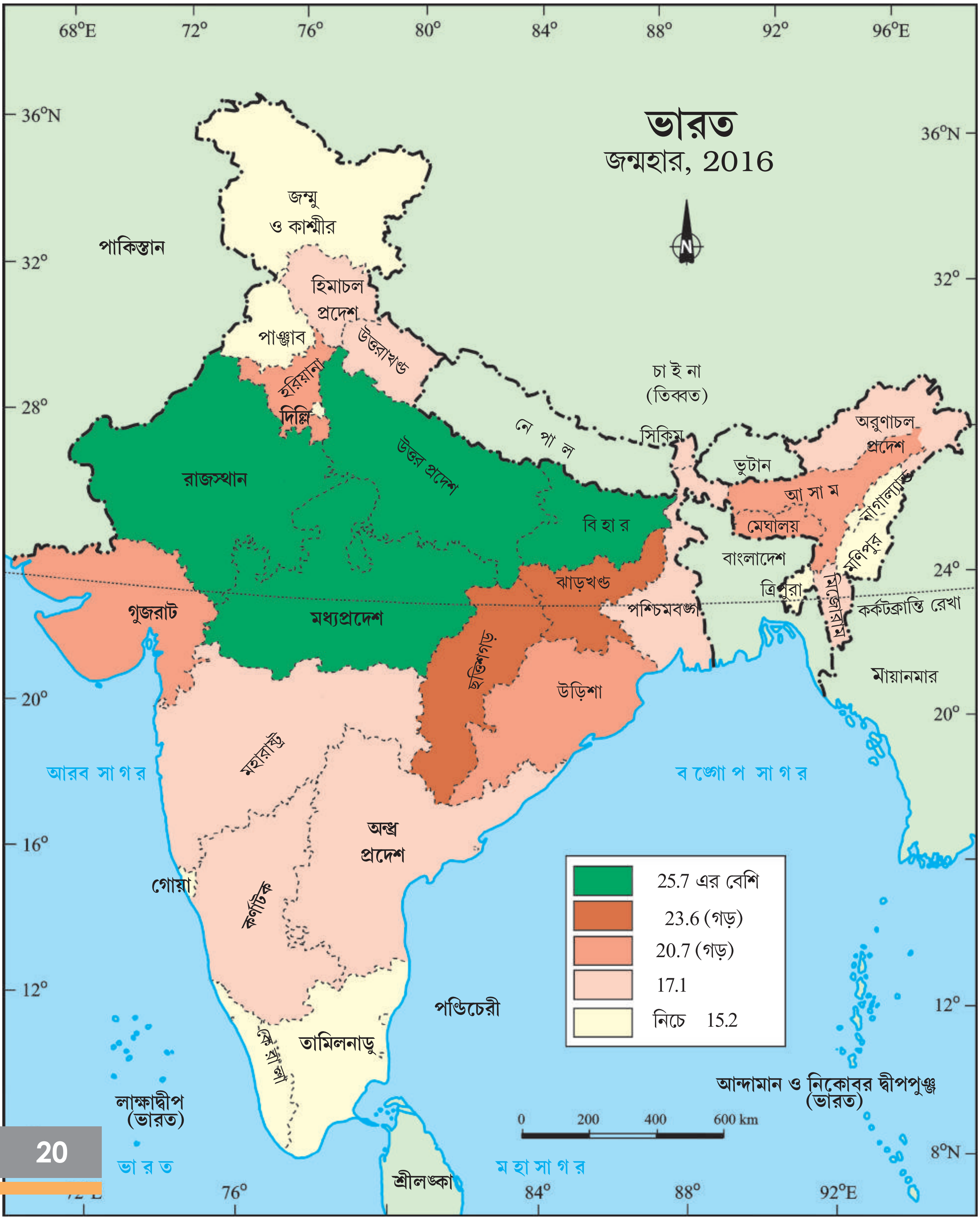

Source: Sample Registration System Bulletin, Government of India, July 2016

তালিকা ঃ 3 প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার আঞ্চলিক হিসাব 2026 পর্যন্ত বৃদ্ধির

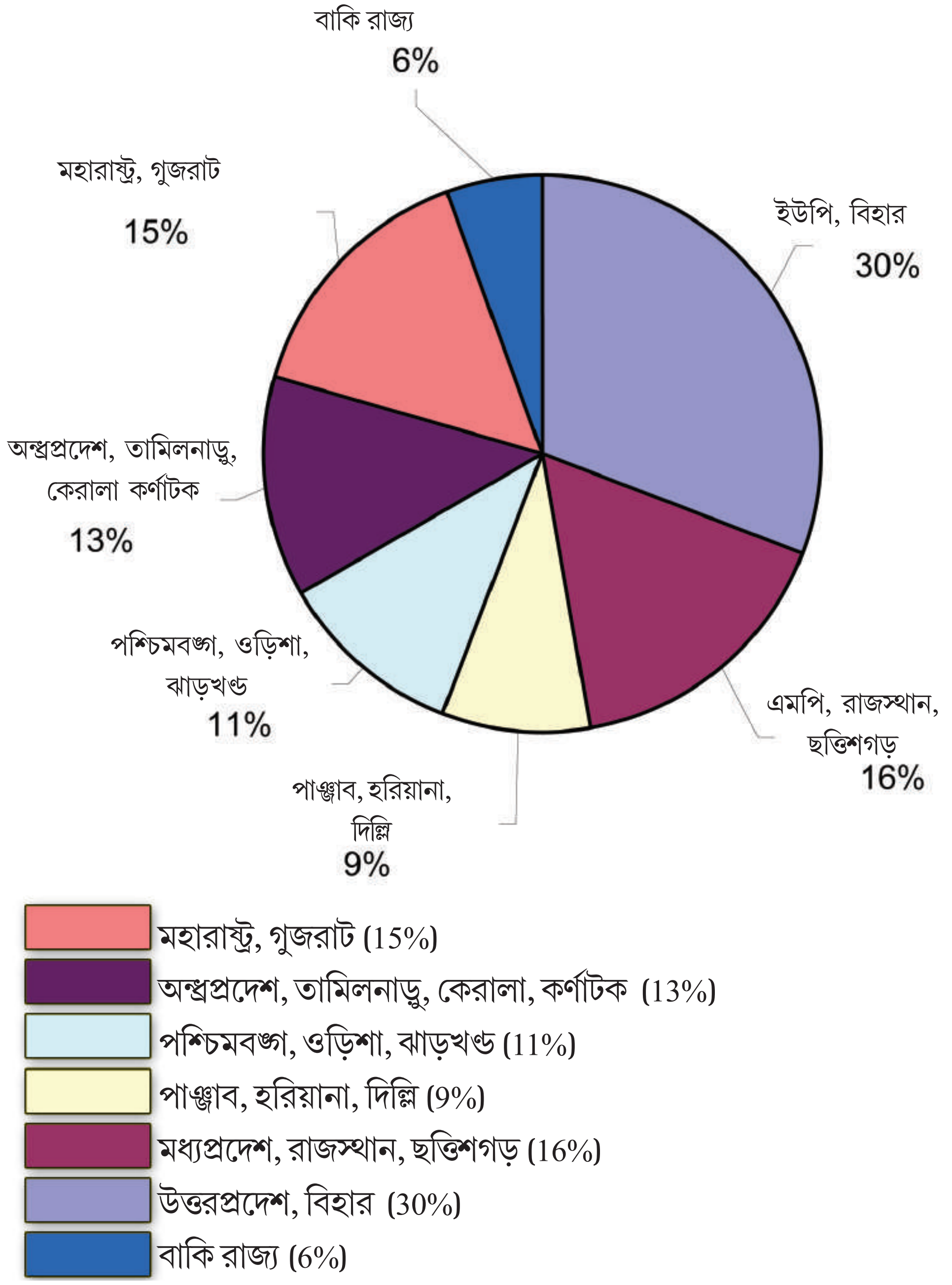

Source: Computed from 2001 Census figures and the Report of the Technical Group on Population Projections of the National Commission on Population, 2006.

2.3 ভারতের জনসংখ্যার বয়স নির্ণায়ক কাঠামো

ভারতের জনসংখ্যাকে 'তরুণদের জনসংখ্যা' বলা যায়। অর্থাৎ ভারতের জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশ তরুণদের নিয়ে গঠিত। এ দেশের জনসংখ্যার গড় বয়স অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। টেবিল-2 এ আমরা দেখতে পাই, ভারতের মোট জনসংখ্যায় 15 বছরের থেকে কম বয়সি গোষ্ঠীর হার হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। যেখানে 1971 সালে এই হার সবচেয়ে উচ্চ মাত্রায় অর্থাৎ 42% ছিল, সেখানে 2001 সালে এর হ্রাস ঘটে 35% হয়। তাই 15-60 বছর বয়সি গোষ্ঠীর হারে 53% থেকে 59% বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়; অন্যদিকে একই সময়কালে ষাটোর্ধ্ব (60 বছরের উপরে যারা) বয়সিদের গোষ্ঠীর হারেও বৃদ্ধি লক্ষ করা যায় (5% থেকে 7%)। কিন্তু আগামী দুই দশকে ভারতীয় জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। বয়সের প্রান্তসীমার দুই প্রান্তে এই পরিবর্তন বেশি লক্ষণীয় হবে — যেমন 2 নং টেবিল-এ 0-14 বয়সি গোষ্ঠীতে আনুমানিক 11% হ্রাস হবে (2004 সালে যা ছিল 34% 2026 সালে তা হবে 23%)। অন্যদিকে 60 বছর বয়সি গোষ্ঠীর হার বৃদ্ধি হবে 5% (2007 সালে যা ছিল 7% তা 2026 সালে হবে 12%)। 4 নং চার্টে, 1961 সাল থেকে 2016 সাল-এর 'জনসংখ্যার পিরামিড' রূপে এই লেখচিত্র দেওয়া হয়েছে।

টেবিল-2 ঃ বয়সের গঠন হিসাবে ভারতের জনসংখ্যা, 1961-2026

বর্ষ	বয়সের তালিকা			মোট
	0–14 বছর	*15–59* বছর	*60+* বছর	
1961	41	53	6	100
1971	42	53	5	100
1981	40	54	6	100
1991	38	56	7	100
2001	34	59	7	100
2011	29	63	8	100
2026	23	64	12	100

বয়সের গঠন হিসাবে স্তম্ভে শতকরা হিসাব দেওয়া আছে; পূর্ণসংখ্যায় লেখার ফলে সারিগুলোর মোট যোগফল 100 নাও হতে পারে।

Source: Based on data from the Technical Group on Population Projections (1996 and 2006) of the National Commission on Population. Webpage for 1996 Report: http://populationcommission.nic.in/facts1.htm

তালিকা ঃ 4 বয়স অনুসারে পিরামিড 1961, 1981, 2001 এবং 2026

ভারত 1961

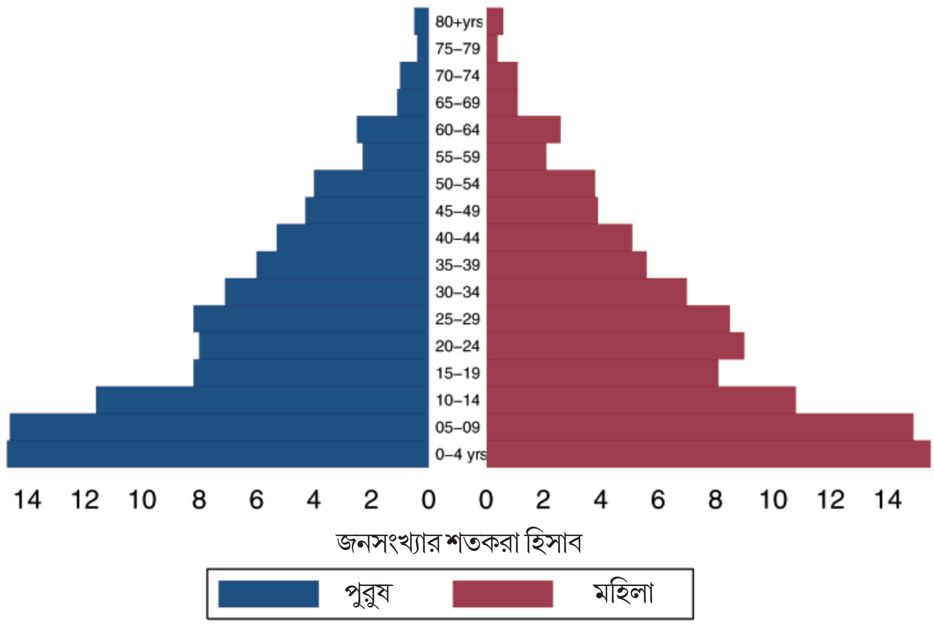

ভারত 1981

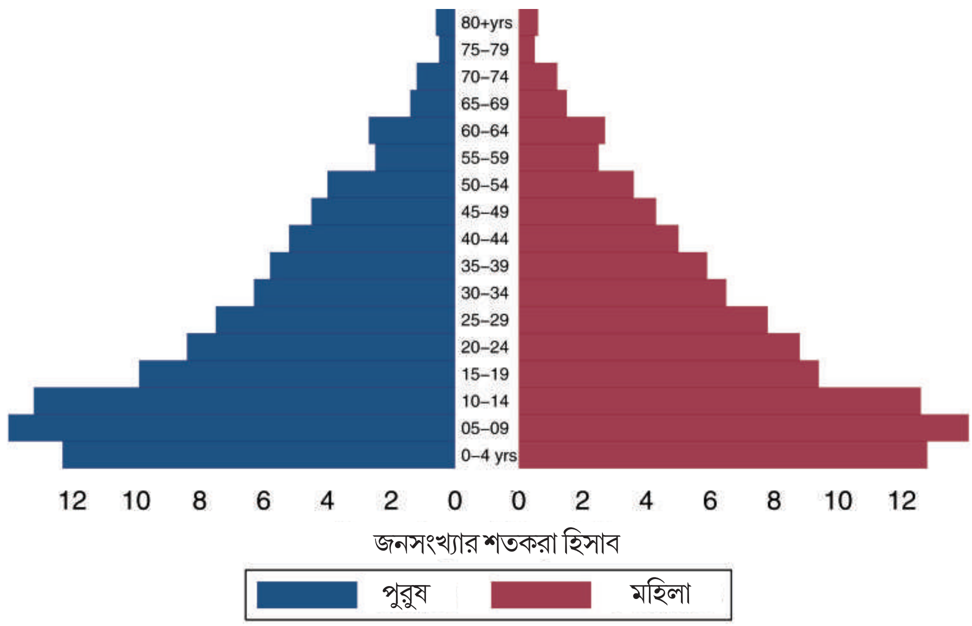

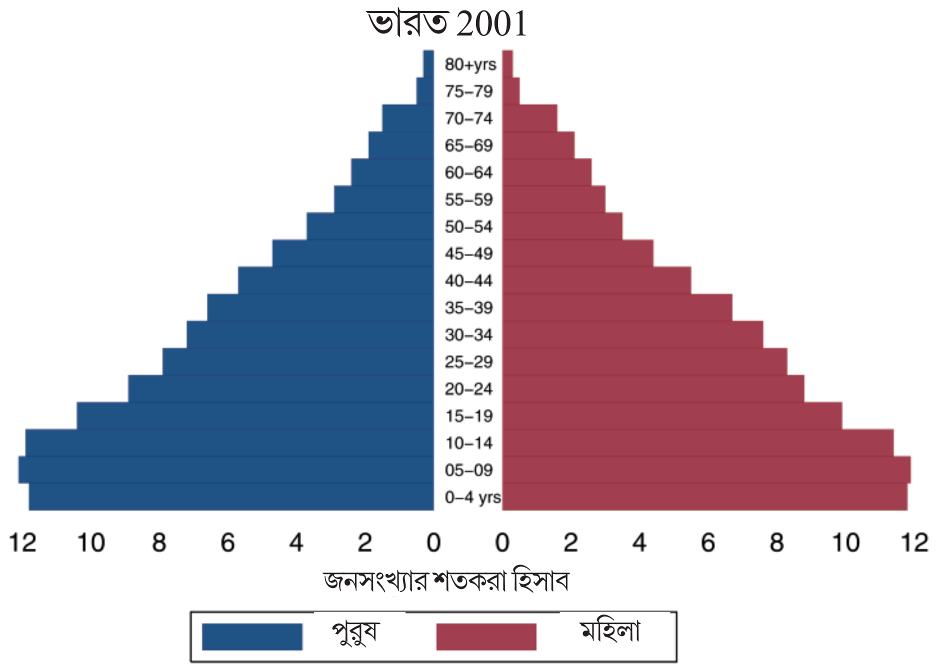

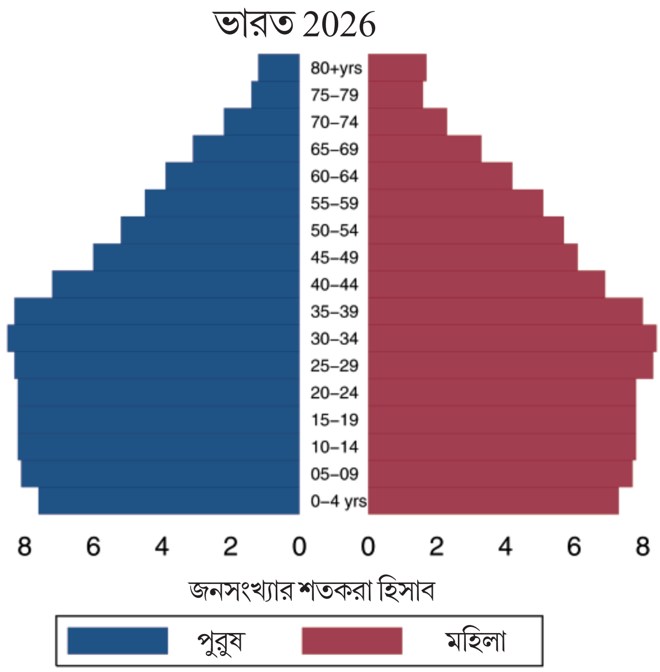

Source: Based on data from relevant volumes of the Census of India (1961, 1981 & 2001) and the Report of the Technical Group on Population Projections (2006) of the National Commission on Population.

4 নং চার্টের অনুশীলনী

অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অংশে, সারণি 2 এ প্রস্তুত বয়স ভিত্তিক উপাত্তের বিস্তারিত বর্ণনা আমরা 4 নং চার্টে দেওয়া বয়স অনুসারে তৈরি 'পিরামিডে' দেখতে পাই। এই পিরামিডে পুরুষদের (বাঁদিকে) এবং মহিলাদের (ডানদিকে) উপাত্ত পৃথকভাবে দেওয়া হয়েছে এবং তার মাঝে পাঁচ বছরের ব্যবধানে বয়সশ্রেণি দেওয়া হয়েছে। তাই অনুভূমিক স্তম্ভগুলিকে (horizontal bar) দেখলে, জনসংখ্যার বয়স অনুসারে বয়স নির্ণায়ক কাঠামো বোঝা যায়। এই বয়স শ্রেণিটি পিরামিডের অনুভূমিক তল (অর্থাৎ পিরামিডের নিচের অংশ) থেকে 0-4 বয়সসীমা দিয়ে শুরু হয় এবং 80 বছর বয়স বা তার উপরের বয়সসীমা দিয়ে শেষ হয়েছে। এখানে এক দশকের জনগণনা অনুসারে চারটি পৃথক দশকের পিরামিড তৈরি করা হয়েছে (1961, 1981, 2001সাল এবং আনুমানিকভাবে 2026 সাল)। প্রত্যেক বয়স গোষ্ঠীর বৃদ্ধির অতীত হার অনুযায়ী প্রাপ্ত উপাত্ত নিয়ে 2026 সালের ভবিষ্যতের একটি পিরামিড তৈরি করা হয়েছে। যেখানে সেইসব বয়স গোষ্ঠীর আনুমানিক বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। এই ধরনের অনুমানকে 'প্রক্ষেপিত চিত্র' বলা হয়।

এই পিরামিডগুলোতে আমরা জন্মহার ক্রমাগত হ্রাস এবং প্রত্যাশিত আয়ু বৃদ্ধির প্রভাব দেখতে পাই। মানুষ বৃদ্ধ বয়সে যতদিন জীবিত থাকে, পিরামিডের উপরের অংশ ততবেশি প্রশস্ত হয়ে ওঠে। আবার অপেক্ষাকৃতভাবে যত কম শিশুর জন্ম হয়, পিরামিডের নিম্ন অংশ ততটাই সংকীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু জন্মহার অনেক ধীর গতিতে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তাই 1961 -1981 সাল পর্যন্ত পিরামিডের নিম্ন অংশে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। পিরামিডের মধ্য ভাগ প্রশস্ত হতে থাকে, কেননা মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে। এর ফলে মধ্য বয়সি গোষ্ঠীগুলিতে স্ফিত (bulge) পরিলক্ষিত হয়, যা 2026 সালের পিরামিডে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এটাকেই 'জনসংখ্যার লভ্যাংশ' বলা হয়, যা এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হবে।

এই চার্টটি মনোযোগ সহকারে পড়ো। এবারে তোমার শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে এটা বের করতে চেষ্টা করো যে 1961 সালের (0-4 বয়সি গোষ্ঠী) নতুন প্রজন্ম যখন ক্রমাগতভাবে পিরামিডের উপরের দিকে উঠতে থাকে, তাহলে তাদের অবস্থানে কী পরিবর্তন হবে?

- 1961 সালের 0-4 বয়সি গোষ্ঠী, পরবর্তী বছরগুলিতে পিরামিডে কোথায় অবস্থিত থাকবে?
- যখন তোমরা 1961 থেকে 2026 সালের দিকে এগোবে, তখন পিরামিডের কোন্ অংশটি সবচেয়ে প্রশস্ত হবে?
- তোমাদের কী মনে হয় 2051 এবং 3001 সালে পিরামিডের আকার কেমন হবে?

আঞ্চলিক স্তরে প্রজনন হারে যেভাবে ভিন্নতা দেখা যায়, সেইভাবেই বয়স অনুসারে সামাজিক কাঠামোর ক্ষেত্রেও ব্যাপক ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। একদিকে কেরালা রাজ্য উন্নত দেশগুলির মতো, বয়স অনুসারে সামাজিক কাঠামো অর্জন করেছে, অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশে এক ভিন্ন চিত্র লক্ষ করা যায়। সেখানে কম বয়সি গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে উচ্চ অনুপাত এবং বৃদ্ধ বয়সি গোষ্ঠীর নিম্ন অনুপাত পরিলক্ষিত হয়। এইসব কারণেই ভারতবর্ষের অবস্থান একটা 'মাঝামাঝি' জায়গায়, কেন না ভারতে উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্য এবং কেরালার মতো আরও রাজ্যেরও অস্তিত্ব রয়েছে। চার্ট 5 -এ 2026 সালে উত্তরপ্রদেশ এবং কেরালার আনুমানিক জনসংখ্যার পিরামিড দেখানো হয়েছে। তোমরা কেরালা এবং উত্তরপ্রদেশের পিরামিডের মধ্যে বিস্তৃত অংশে পার্থক্যগুলি লক্ষ করো।

তালিকা ঃ 5 বয়সের গঠন অনুসারে পিরামিড
কেরালা ও উত্তরপ্রদেশ, 2026

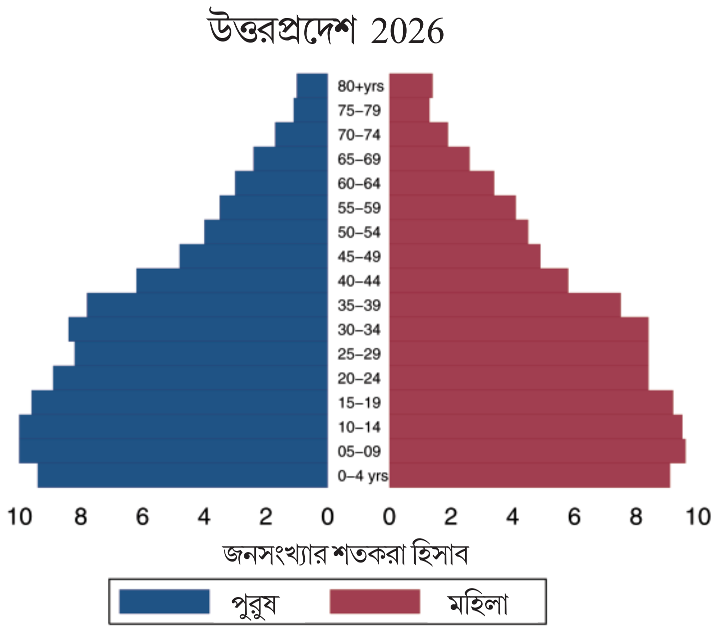

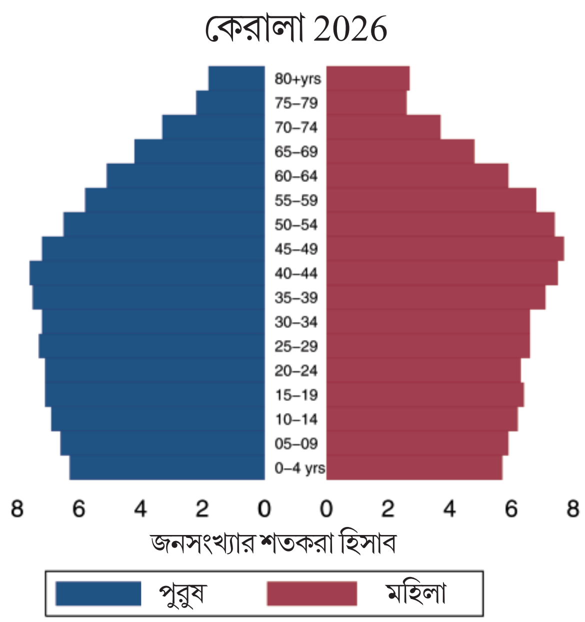

Source: Report of the Technical Group on Population Projections (2006) of the National Commission on Population.

ভারতের জনসংখ্যায় কম বয়সি গোষ্ঠীর অনুপাত বেশি থাকার ঘটনাকে এক লাভজনক স্থিতি বলে মানা হয়। অতীত দশকের পূর্ব এশীয় অর্থ ব্যবস্থা এবং বর্তমানের আয়ারল্যান্ডের মতো, অনুমান করা হয় যে জনসংখ্যার লভ্যাংশ থেকে ভারতও উপকৃত হচ্ছে। বর্তমান ভারতে নির্ভরশীল প্রবীণদের সংখ্যা কম এবং তুলনামূলকভাবে কর্মশীল প্রজন্মের সংখ্যা অনেকটাই বেশি, যা এই 'লভ্যাংশ' গড়ে তুলতে সহায়ক হয়। কিন্তু এই লাভ স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ এই লভ্যাংশ প্রাপ্ত করতে হলে প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত নীতিসমূহকে সচেতনভাবে কাজে লাগাতে হবে। নিম্নে বাক্স 2.3 তে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

বাক্স 2.3

পরিবর্তনশীল বয়স কাঠামো কি ভারতে 'জনসংখ্যার লভ্যাংশ' প্রদান করে?

ভারতবর্ষ হল (এবং আরও কিছু সময় পর্যন্ত থাকবে) পৃথিবীর একটি নবীনতম দেশ। তাই জনসংখ্যার বয়স অনুসারে কাঠামোতে গড়ে উঠে 'জনসংখ্যার লভ্যাংশ'। 2000 সালে ভারতে জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ছিল 15 বছরের নীচে। 2020 সালে, গড়ে একজন ভারতীয়ের বয়স হবে 29 বছর, গড়ে একজন চিনার এবং আমেরিকানের বয়স হবে 37 বছর এবং গড়ে একজন জাপানির বয়স হবে 48 বছর। এর অর্থ হল, বিকাশ এবং সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই বৃহৎ এবং ক্রমবর্ধমান শ্রম শক্তি অপ্রত্যাশিত লাভ প্রদান করতে পারে।

যখন জনসংখ্যায় অকর্মশীল গোষ্ঠীর তুলনায় কর্মশীল গোষ্ঠীর অনুপাতে বৃদ্ধি হয়, তখন 'জনসংখ্যার লভ্যাংশ' গড়ে ওঠে। বয়সের ক্ষেত্রে, আনুমানিক 15 থেকে 64 বছরকে 'কর্মশীল জনসংখ্যা' ধরা হয়। এই কর্মশীল বয়স গোষ্ঠী, নিজেকে এবং অন্যান্য বয়স গোষ্ঠীকে (যেমন, শিশু এবং বয়স্ক লোক যারা সাধারণত কর্ম করতে অক্ষম ও তাই পরনির্ভরশীল) সহায়তা করতে সক্ষম হতে হবে। জনতাত্ত্বিক বিবর্তনের ফলে বয়স ভিত্তিক কাঠামোতে পরিবর্তন হয়, যা 'নির্ভরতা অনুপাত' বা 'অকর্মশীল বয়সি গোষ্ঠী এবং কর্মশীল বয়সি গোষ্ঠী'র মধ্যের অনুপাতকে কম করে; এর ফলস্বরূপ সম্ভাব্য বিকাশ এবং উন্নয়নের স্থিতি তৈরি হয়।

কিন্তু এই সম্ভাব্য বিকাশকে প্রকৃত বিকাশে বাস্তবায়িত করা তখনই সম্ভব হবে, যদি কর্মশীল বয়সি গোষ্ঠীকে শিক্ষা এবং রোজগারের বিভিন্ন স্তরে পারদর্শী করে তোলা যায়। আমাদের দেশের নব্য শ্রমশক্তি যদি শিক্ষিত না হয়, তবে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা ও কম হবে। আবার তারা যদি বেকার বসে থাকে, তাহলেও পরনির্ভরশীল হয়ে উঠবে। তাই পরিবর্তনশীল বয়স অনুসারে কাঠামো, স্বয়ং কোনো লাভ প্রদান করে না, এরজন্য আবশ্যক হল উন্নয়নের সঠিক পরিকল্পনা। 'নির্ভরতা অনুপাত' নির্ধারণ করতে অকর্মশীল ও কর্মশীল বয়সি জনসংখ্যার অনুপাতকে ধরা হয় কিন্তু রোজগারের স্থিতিকে গণ্য করা হয় না। এটা একটি বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, কেন না কর্মশীল বয়সি ব্যক্তিও বেকারে পরিণত হতে পারে। কর্মশীল বয়সি গোষ্ঠী এবং বেকার এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য, বেকারত্ব এবং আংশিক বেকারত্বের স্থিতির উপর নির্ভর করে। তার কারণ আংশিক বেকারত্বের ফলে শ্রম শক্তির একটা অংশ উৎপাদনে অক্ষম থাকে। এই পার্থক্য থেকে স্পষ্ট হয় কীভাবে কিছু দেশ 'জনসংখ্যার লভ্যাংশ'কে কাজে লাগাতে পারে এবং অন্যান্য দেশ তা করতে পারে না।

তবে ভারতের মতো দেশে এই লভ্যাংশ প্রাপ্ত করার সুযোগ রয়েছে। বয়স সীমার ক্ষেত্রে, জনসংখ্যা প্রবণতার প্রভাব নির্ভরতা অনুপাতে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত। ভারতের মোট নির্ভরতা অনুপাত, যা 1970 সালে '79' ছিল, তা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে 2005 সালে '64' হয়। কিন্তু এই শতাব্দীতেও এই প্রক্রিয়াটি অব্যাহত থাকতে পারে এবং আনুপাতিক 2025 সালে, বয়স অনুসারে নির্ভরতা অনুপাত হ্রাস হয়ে 48 হতে পারে। এর কারণ শিশুদের সংখ্যার অনুপাতে নিয়মিত হ্রাস। আবার বয়স্কদের অনুপাতে বৃদ্ধির ফলে 2050 সালে নির্ভরতা অনুপাত 50 হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কাজ 2.3

তোমার মতে প্রজন্মগত সম্পর্কগুলোর উপর বয়স কাঠামোর কী প্রভাব পড়ে? উদাহরণস্বরূপ, উচ্চ নির্ভরতা অনুপাত কি নবীন এবং প্রবীণ প্রজন্মের মধ্যে দুশ্চিন্তার স্থিতি সৃষ্টি করতে পারে? না কি এটা প্রবীণ এবং নবীনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলে? তোমাদের শ্রেণিকক্ষে এ বিষয়ে আলোচনা করো এবং সম্ভাব্য ফলাফল ও কারণগুলির একটি তালিকা তৈরি করো।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় রোজগারের (employment)। 1999-2000 সালে ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে এবং 2001 সালে ভারতীয় জনগণনার উপাত্ত থেকে নগরীয় এবং গ্রামীণ এলাকায় নতুন রোজগারের সুযোগের (employment generation) ক্ষেত্রে হ্রাস লক্ষ করা যায়। এই পরিস্থিতিটি যুবকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 1987 এবং 1994 সালের মাঝে গ্রামীণ এবং নগরীয় পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রতি বছর প্রায় 2.5% রোজগারের বৃদ্ধি ঘটত। কিন্তু 1994-2004 সালের মাঝে গ্রামীণ পুরুষদের জন্য তা হ্রাস হয় 0.7% এবং নগরীয় পুরুষদের ক্ষেত্রে 0.3% হ্রাস লক্ষ করা যায়। এই স্থিতি স্পষ্ট করে যে যুব শ্রম শক্তিকে কাজে লাগানো হয় নি।

আজ ভারতের কাছে জনতাত্ত্বিক সুযোগকে কাজে লাগানোর অনেক কৌশলও রয়েছে। তবে ভারতের সাম্প্রতিক অনুভব থেকে বোঝা যায় যে বাজার শক্তি স্বয়ং এইসব কৌশলের বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করে না। তাই দ্রুত উপায় না বের করলে, আমরা দেশের পরিবর্তনশীল বয়সি কাঠামোর থেকে সম্ভাব্য লাভগুলো হারিয়ে ফেলব।

[Source: Adapted from an article by C.P. Chandrashekhar in Frontline *Volume 23 - Issue 01, January 14-27, 2006]*

2.4 ভারতের লিঙ্গ অনুপাতের হ্রাস

লিঙ্গ অনুপাত হল, জনসংখ্যায় লিঙ্গ ভারসাম্যের এক গুরুত্বপূর্ণ সূচক। পূর্বে উল্লেখিত ধারণাগুলিতে যেমন বলা হয়েছে, ঐতিহাসিকভাবে লিঙ্গ অনুপাত কিছুটা মহিলাদের পক্ষে রয়েছে, অর্থাৎ প্রতি 1000 পুরুষে সাধারণত মহিলাদের সংখ্যা 1000 থেকেও বেশি। তা সত্ত্বেও, ভারতের লিঙ্গ অনুপাতের হ্রাস ঘটেছে, যা তোমরা টেবিল নং 3 এ স্পষ্ট দেখতে পারবে। বিংশ শতাব্দীতে প্রতি 1000 পুরুষে, মহিলাদের সংখ্যা 972 ছিল, যা হ্রাস পেয়ে একবিংশ শতাব্দীতে 933 হয়। বিগত চার দশকে এই হ্রাসের প্রবণতা চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। 1961 সালে লিঙ্গ অনুপাত ছিল 941 যা হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে 1991 সালে সর্বনিম্ন 927-এ পরিণত হয়। তবে 2001 সালে এই অনুপাতে আবার পরিমিত বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। 2011 সালের ভারতীয় জনগণনা অনুসারে লিঙ্গ অনুপাত বৃদ্ধি পায় এবং প্রতি 1000 পুরুষে, মহিলাদের সংখ্যা 940 হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু যে বিষয়টি জনতত্ত্ববিদ, নীতি নির্ধারকগণ, সমাজকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন করেছে, তা হল শিশু লিঙ্গা অনুপাতে তীব্র হ্রাস। 1961 সাল থেকে বয়স ভিত্তিক লিঙ্গ অনুপাত গণনার কাজ শুরু হয়। যেমন টেবিল নং 3-এ দেখানো হয়েছে, 0-6 বছর বয়সি গোষ্ঠীর (যাকে শিশু লিঙ্গা অনুপাতও বলা হয়) লিঙ্গা অনুপাত অন্যান্য গোষ্ঠীর অনুপাতের থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু এই অনুপাতের তীব্র হ্রাস পরিলক্ষিত করা যায়। 1991-2001 দশকে এক ব্যতিক্রমী দৃশ্য লক্ষ করা যায়, মোট লিঙ্গা অনুপাতে সর্বাধিক 6 পয়েন্ট বৃদ্ধি হয় (927 থেকে 933), কিন্তু শিশু লিঙ্গা অনুপাতে 18 পয়েন্ট হ্রাস হয় (945 থেকে 927)। বস্তুত, প্রথমবারের মতো শিশু লিঙ্গা অনুপাত মোট লিঙ্গা অনুপাতের চেয়ে বেশি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। 2011 সালের জনগণনা অনুসারে, শিশু লিঙ্গা অনুপাতে পুনরায় 13 পয়েন্ট হ্রাস হয়ে, এখন সংখ্যা 914-তে দাঁড়িয়েছে।

টেবিল-3 ঃ ভারতে লিঙ্গা অনুপাত হ্রাস, 1901-2011

বর্ষ	লিঙ্গা অনুপাত (সব বয়সের)	পূর্ববর্তী দশকে পরিবর্তন	শিশু লিঙ্গা অনুপাত (0–6 বছর)	পূর্ব দশকে পরিবর্তন
1901	972	–	–	–
1911	964	– 8	–	–
1921	955	– 9	–	–
1931	950	– 5	–	–
1941	945	– 5	–	–
1951	946	+ 1	–	–
1961	941	– 5	976	–
1971	930	– 11	964	– 12
1981	934	+ 4	962	– 2
1991	927	– 7	945	– 17
2001	933	+ 6	927	– 18
2011*	940	+ 7	914	– 13
2017	945	–	919	–

বিঃ দ্রঃ লিঙ্গা অনুপাত বলতে প্রতি 1000 পুরুষ পিছু কত মহিলা আছে সেটা বুঝায়। 1961-র পূর্বের বয়স ভিত্তিক লিঙ্গা অনুপাতের হিসাব উপলব্ধ নয়।

Source: **Census of India 2011 (Provisional) Government of India*

রাজ্যস্তরে শিশু লিঙ্গা অনুপাত এখন বিশেষ চিন্তার বিষয়। তার কারণ ভারতের ছয়টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শিশু লিঙ্গা অনুপাত প্রতি 1000 পুরুষে 900 মহিলার চেয়েও কম। পাঞ্জাবে সর্বনিম্ন শিশু লিঙ্গা অনুপাত লক্ষ করা গেছে। যার সংখ্যা 793 (এটি একমাত্র রাজ্য যেখানে এই অনুপাত 800-এর নীচে)। পাঞ্জাবের পরে হরিয়ানা, চন্ডীগড়, দিল্লি, গুজরাট এবং হিমাচলপ্রদেশ-এর নাম রয়েছে। যেমন চার্ট 6 এ লক্ষ করা যায়, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র এইসব রাজ্যের অনুপাত 925 এর নীচে, অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশ, গোয়া, জম্মু ও কাশ্মীর, বিহার, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, উড়িষ্যায় এই অনুপাত 927 থেকে বেশি, কিন্তু 950 স্তর থেকে কম। কেরালার মতো রাজ্যে যেখানে সাধারণত সর্বশ্রেষ্ঠ লিঙ্গা অনুপাত থাকে, কিন্তু শিশু লিঙ্গা অনুপাতের ক্ষেত্রে তার সংখ্যা 963, অন্যদিকে সর্বোচ্চ শিশু লিঙ্গা অনুপাত (986) পাওয়া যায় সিকিমে।

জনতত্ত্ববিদ্ এবং সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা, ভারতে লিঙ্গা অনুপাত হ্রাসের জন্য বিভিন্ন কারণসমূহকে দায়ী করেছেন। তাদের মতে গর্ভধারণ হল স্বাস্থ্য সম্পর্কিত মুখ্য কারণ, যা পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অধিক প্রভাবিত করে। তাই এই প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক যে, লিঙ্গা অনুপাত হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ার পেছনে কি গর্ভধারণ আংশিকভাবে দায়ী? কেন না গর্ভধারণের মধ্য দিয়ে মহিলাদের মৃত্যুর সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তবে এটাও ঠিক যে, পুষ্টির স্তর সাধারণ শিক্ষা ও সচেতনতা এবং পাশাপাশি চিকিৎসা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির উন্নতির ফলে প্রসবকালে গর্ভবতী মায়ের মৃত্যুর ঘটনা অনেকটাই কমেছে। ভারতবর্ষেও প্রসবকালে মাতৃ মৃত্যুর হার ক্রমশ কমছে, যদিও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী, এই হার এখনও উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। তাই মাতৃ মৃত্যুকে লিঙ্গা অনুপাত হ্রাসের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা কঠিন। এটা সত্য যে, শিশু লিঙ্গা অনুপাত হ্রাস সর্বমোট সংখ্যার তুলনায় অনেক উচ্চ, তাই সমাজ বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, কন্যা সন্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার ও আচরণে এই হ্রাসের কারণ সন্নিহিত থাকতে পারে।

তালিকা ঃ 6 রাজ্যভিত্তিক শিশুর লিঙ্গ অনুপাত হিসাবের মানচিত্র, 2011

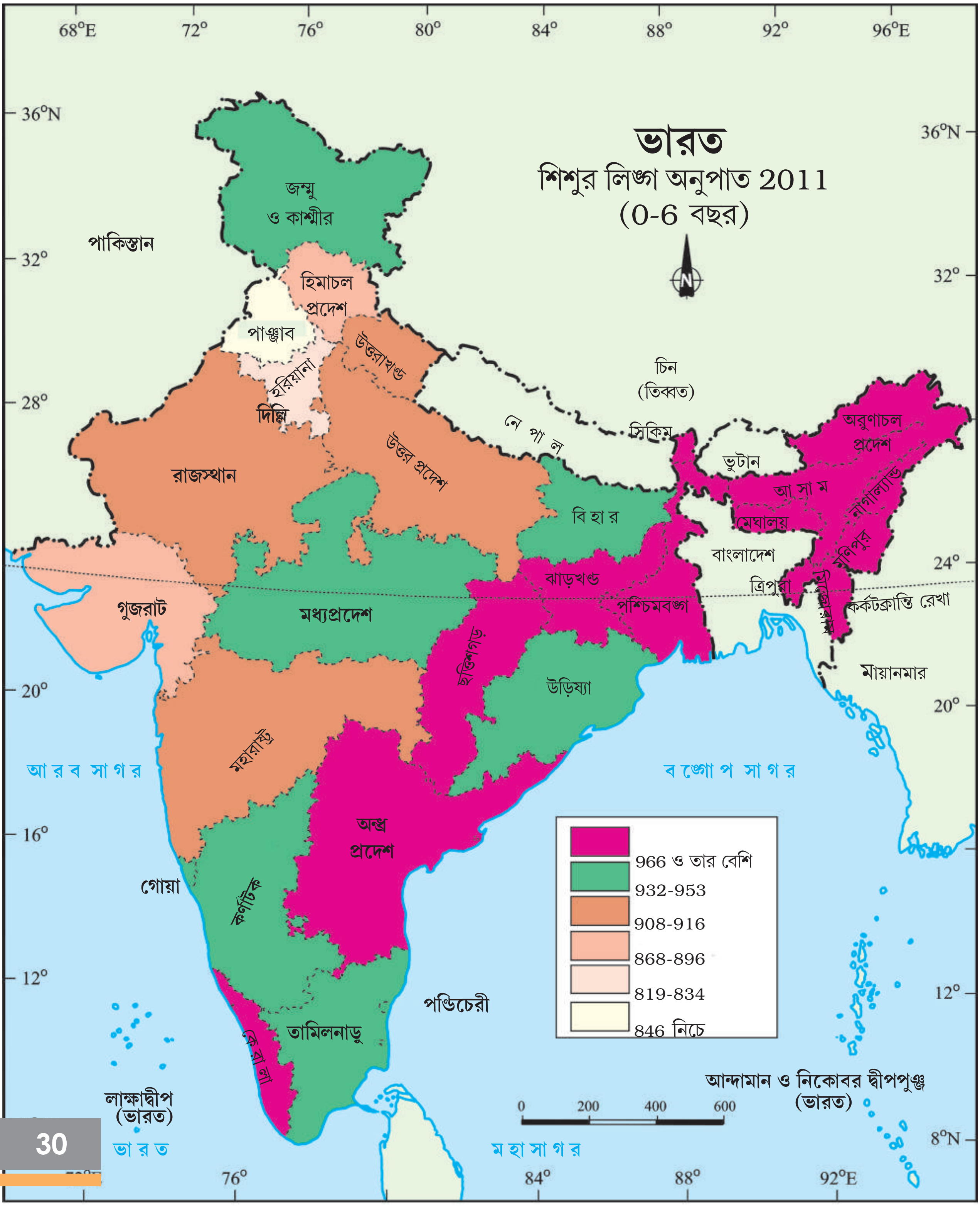

Source: Census Report of 2011

শিশু লিঙ্গা অনুপাত হ্রাসের জন্য বিভিন্ন কারণসমূহ দায়ী, যেমন শৈশবাবস্থায় কন্যা শিশুর অবহেলা, যার ফলে অনেক বেশি সংখ্যায় শিশুকন্যার মৃত্যু ঘটে; ভ্রুণ নির্ধারক গর্ভপাতের কারণে অনেক শিশুকন্যার মায়ের গর্ভেই মৃত্যু হয় এবং ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের কারণে কন্যা শিশু হত্যা (Female infanticide)। উপরোক্ত প্রতিটি কারণই গুরুতর সামাজিক সমস্যার সংকেত দেয় এবং এটা প্রমাণিত যে ভারতে এই সবগুলো কারণ বিদ্যমান। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শিশুকন্যা হত্যার প্রচলন রয়েছে। অন্যদিকে, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে গর্ভাবস্থার প্রাথমিক স্তরে ভ্রুণের লিঙ্গা নির্ধারণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ সোনোগ্রাম (আল্ট্রাসাউন্ড) যন্ত্রটির ব্যবহার মূলত ভ্রুণের জিনগত বা অন্য কোনো ব্যাধির সম্পর্কে জানার জন্য করা হয়, কিন্তু সম্ভবত এখন এটি ভ্রুণের লিঙ্গা নির্ধারণ এবং অনেকক্ষেত্রে কন্যা শিশুর গর্ভপাতেও ব্যবহৃত হয়।

ভারতের কিছু অঞ্চলের নিম্ন শিশু লিঙ্গা অনুপাতের নমুনা এই যুক্তিকে কিছুটা সমর্থন করে। এটা খুবই লক্ষণীয় যে ভারতের সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোতে সর্বনিম্ন শিশু লিঙ্গাপাত দেখা যায়। 2011 সালের জনগণনা অনুসারে, মহারাষ্ট্র মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছে। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, চন্ডীগড়, হরিয়ানা এবং দিল্লিতে উচ্চ মাথাপিছু আয় রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও, এই সকল রাজ্যে নিম্ন শিশু লিঙ্গা অনুপাত লক্ষ করা যায়। তাই এইসব অঞ্চলে যে ধরনের গর্ভপাত সংগঠিত হয় তার কারণ দারিদ্র বা অজ্ঞতা বা সম্পদের অভাব নয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি পণ প্রথার মানে এই হয় যে, কন্যা বিবাহের জন্য পিতামাতাকে মোটা অঙ্কের লেনদেন করতে হবে, তাহলে সমৃদ্ধ পিতামাতাই এই পণ প্রদানে সবচেয়ে সক্ষম। তা সত্ত্বেও সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলগুলিতে নিম্ন শিশু লিঙ্গা অনুপাত পরিলক্ষিত হয়।

নারী বিক্ষোভ

এটাও সম্ভবপর (যদিও এই বিষয়ে গবেষণা চলছে) যে, আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ পরিবারগুলি কম সংখ্যক সন্তান, অর্থাৎ দুই বা একজন সন্তান, পছন্দ করে। তাই তারা তাদের পছন্দমতো লিঙ্গের শিশুর জন্ম দিতে চায়। আল্ট্রাসাউন্ড পদ্ধতির মাধ্যমে এই লিঙ্গা নির্ধারণ সম্ভব হয়ে ওঠে, যদিও এটা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ যেখানে শিশুর লিঙ্গা নির্ধারণকারীর আর্থিক জরিমানা ও জেল হতে পারে। 1996 সাল থেকে প্রিন্টেল ডায়গনস্টিক টেকনিক (রেগুলেশন এবং প্রিভেনশন অফ মিসইউজ) নামে এই আইন রয়েছে এবং 2003 সালে এই আইনকে আরও কঠোর করা হয়। যাই হোক, শিশুকন্যার প্রতি বিরোধভাবাপন্ন মনোভাবের মতো সমস্যার সমাধান নির্ভর করে কীভাবে সামাজিক আচরণের পরিবর্তন হবে। পাশাপাশি এই কাজে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন আইন ও নিয়মনীতি রয়েছে। সম্প্রতিকালে, ভারত সরকার 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' নামক যোজনা শুরু করেছে। শিশু লিঙ্গা অনুপাতের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটা এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

2.5 সাক্ষরতা

'সাক্ষরতা' শিক্ষিত হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক এবং ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ সাধন। জনসংখ্যা যত বেশি সাক্ষর হবে, ততবেশি সে তার জীবিকার বিকল্পগুলি সম্পর্কে সচেতন এবং জ্ঞান সম্পর্কিত অর্থ ব্যবস্থায় যোগদান করতে সক্ষম। তাছাড়া, সাক্ষরতা জনগণকে স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে ও সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক এবং আর্থিক উন্নতির লক্ষ্যে তাদের কল্যাণমূলক কাজে যোগদান করতে সাহায্য করে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে, সাক্ষরতার স্তরে ব্যাপক উন্নতি হয় এবং বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ সাক্ষর হিসাবে ধরা হয়। ভারত জনসংখ্যাবহুল দেশ হওয়ার কারণে, সাক্ষরতার উন্নত হার বজায় রাখতে আমাদের অনেক লড়াই করতে হয়। তাই নতুন প্রজন্মকে সাক্ষর করতে অত্যধিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। (অধ্যায়ে পূর্ব আলোচিত বয়সভিত্তিক কাঠামো এবং জনসংখ্যা পিরামিডকে মনে করে দেখো)

লিঙ্গ, অঞ্চল এবং সামাজিক গোষ্ঠীর ভিত্তিতে সাক্ষরতার হার ভিন্ন হয় । যেমন টেবিল নং 4-এ দেখানো হয়েছে, 2011 সালের জনগণনা অনুসারে, ভারতে মহিলাদের সাক্ষরতার হার পুরুষের তুলনায় 16.7% কম। তা সত্ত্বেও পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের সাক্ষরতার হার দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর আংশিক কারণ হল মহিলাদের সাক্ষরতার হার অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তর থেকে বাড়ে। 2001 থেকে 2011 সালের মধ্যে মহিলা সাক্ষরতার হার প্রায় 11.2% বৃদ্ধি পায় ও পুরুষ সাক্ষরতার হারে মাত্র 6.2% বৃদ্ধি হয়। তাই মোট সাক্ষরতার হারের বৃদ্ধি আনুমানিক 9% । পুরুষের সাক্ষরতার হার 6% বৃদ্ধি হয়, অন্যদিকে, মহিলা সাক্ষরতার হার প্রায় 10% বৃদ্ধি পায়। আবার, পুরুষদের তুলনায় বেশি সংখ্যক মহিলারা সাক্ষর হচ্ছে। সামাজিক গোষ্ঠী অনুসারেও সাক্ষরতার হার ভিন্ন হয় — যেমন ঐতিহাসিক স্তরে দেখা গেছে তপশিলি জাতি এবং উপজাতিদের মতো পিছিয়ে-পড়া সম্প্রদায়গুলিতে নিম্ন সাক্ষরতা হার রয়েছে এবং এই সকল গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ করে মহিলাদের সাক্ষরতার হার আরও কম। আঞ্চলিক স্তরেও এই হারে ব্যাপক ভিন্নতা লক্ষণীয়। যেমন, ভারতে কেরালার মতো সর্বজন সাক্ষর রাজ্য রয়েছে, অন্যদিকে বিহারের মত পিছিয়ে- পড়া রাজ্যও বিরাজমান। সাক্ষরতার হারে এই অসাম্য বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই অসাম্য শুধুমাত্র একটা প্রজন্মকে প্রভাবিত করে না, বরং বিভিন্ন প্রজন্ম জুড়ে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নিরক্ষর পিতামাতা প্রায়ই এটা সুনিশ্চিত করতে পারে না যে তাদের শিশুরা ভালোভাবে শিক্ষিত হবে, তাই সাক্ষরতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান অসাম্য স্থায়ীভাবে রয়ে যায়।

টেবিল-4 ঃ ভারতে সাক্ষরতার হার

7 বছর ও তার উর্ধ্ব বয়সের জনসংখ্যার শতকরা হিসাব				
বর্ষ	লোকসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	সাক্ষরতা হারে পুরুষ-মহিলা পার্থক্য
1951	18.3	27.2	8.9	18.3
1961	28.3	40.4	15.4	25.1
1971	34.5	46.0	22.0	24.0
1981	43.6	56.4	29.8	26.6
1991	52.2	64.1	39.3	24.8
2001	65.4	75.9	54.2	21.7
2011*	74.0	82.1	65.4	16.7

*Source: Bose (2001:22) * Census of India 2011 (Provisional).*

2.6 গ্রামীণ-নগরীয় পার্থক্য

ভারতের অধিকাংশ জনসংখ্যা গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করত এবং এই স্থিতি আজও বিদ্যমান। 2011 সালের ভারতীয় জনগণনা অনুসারে বেশিরভাগ জনগণ আজও গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে, কিন্তু নগরীয় এলাকায়ও জনসংখ্যার বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। এখন জনসংখ্যার 68.8% গ্রামীণ এলাকায় এবং 31.2% নগরীয় এলাকায় বসবাস করছে। যেমন টেবিল নং 5 এ দেখানো হয়েছে, নগরীয় জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে নগরীয় জনসংখ্যা 11% ছিল, আজ একবিংশ শতাব্দীতে তা প্রায় 28% হয়েছে অর্থাৎ প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এটা শুধু সংখ্যাগত বৃদ্ধির প্রশ্ন নয়। আসলে আধুনিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া সুনিশ্চিত করে যে, কীভাবে জনগণ শিল্পোন্নত নগরীয় জীবনশৈলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, যার ফলে কৃষিগত গ্রামীণ জীবনশৈলীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়াটি বিস্তৃতভাবে সারা বিশ্বে এবং ভারতের ক্ষেত্রেও সত্য।

টেবিল-5 ঃ গ্রামীণ এবং নগরীয় জনসংখ্যা

বর্ষ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)		পূর্ণ জনসংখ্যার শতকরা হিসাব	
	গ্রামীণ	নগরীয়	গ্রামীণ	নগরীয়
1901	213	26	89.2	10.8
1911	226	26	89.7	10.3
1921	223	28	88.8	11.2
1931	246	33	88.0	12.0
1941	275	44	86.1	13.9
1951	299	62	82.7	17.3
1961	360	79	82.0	18.0
1971	439	109	80.1	19.9
1981	524	159	76.7	23.3
1991	629	218	74.3	25.7
2001	743	286	72.2	27.8
2011*	833	377	68.8	31.2

Source: India 2006, A Reference Annual **Census of India 2011 (Provisional)*

একসময় দেশের মোট আর্থিক উৎপাদনে কৃষির অবদান সবচেয়ে অধিক ছিল, কিন্তু বর্তমানে ভারতের মোট দেশীয় উৎপাদনে কৃষির অবদান মাত্র এক চতুর্থাংশ। যদিও অধিকাংশ জনগণ গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে এবং কৃষি ভিত্তিক জীবিকার উপর নির্ভরশীল, তা সত্ত্বেও কৃষিজ উৎপাদনের আর্থিক মূল্যের আপেক্ষিক হ্রাস ঘটেছে। তাছাড়া বেশিরভাগ মানুষ হয়তো বা গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে, কিন্তু তারা কৃষিকার্যে যুক্ত নয়, এমনকি গ্রামে বসববাসও করতে চায় না।

বর্তমানে গ্রামীণ জনগণ কৃষি থেকে ভিন্ন গ্রামীণ পেশা যেমন পরিবহণ, সেবা, ব্যবসা বা কারুশিল্প ইত্যাদিতে যুক্ত হচ্ছে। যারা নগরীয় এলাকার কাছাকাছি বসবাস করে, তারা প্রতিদিন কার্যসূত্রে নগরে যাতায়াত করে এবং গ্রামেই বসবাস করে থাকে।

জীবনশৈলী ও উপভোগ্য পণ্যের ব্যবহারের বিভিন্ন চিত্র গণমাধ্যম এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার বিভিন্ন মাধ্যম দ্বারা এখন গ্রামীণ এলাকাতেও পৌঁছে গেছে। ফলস্বরূপ, প্রত্যন্ত গ্রামেও নগরীয় নিয়মনীতি ও জীবনযাত্রার মান এখন সুপরিচিত হয়ে উঠেছে, যা সেইসব গ্রামীণ অঞ্চলে নতুন আশঙ্কা এবং প্রত্যাশার সৃষ্টি করেছে। গণ যোগাযোগ এবং পরিবহণ ব্যবস্থা এখন নগর এবং গ্রামীণ এলাকার ব্যবধান অনেকটাই কম করতে সক্ষম হয়েছে। তবে অতীতেও এইসব গ্রামীণ এলাকা কোনোদিনই বাজার শক্তির (Market forces) নাগালের বাইরে ছিল না। বর্তমানে এই গ্রামগুলো ভোক্তা বাজারের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয়ে উঠেছে (চতুর্থ অধ্যায়ে বাজারের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে)।

কাজ 2.4

তোমার বিদ্যালয়ের সহপাঠীদের পরিবার কতদিন ধরে এই শহরে বসবাস করছে (অর্থাৎ কত প্রজন্ম ধরে তারা এই শহরের বাসিন্দা), এই মর্মে তোমার বিদ্যালয়ে একটি সমীক্ষা করে দেখো। সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের একটি তালিকা প্রস্তুত করো। গ্রামীণ-নগরীয় প্রচরন সম্পর্কে তোমার সমীক্ষা কি বলে?

নগরীয় দৃষ্টিকোণ অনুসারে, নগরায়ন প্রক্রিয়ার দ্রুত বিকাশ প্রমাণ করে যে শহর বা নগর গ্রামীণ জনসংখ্যাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। গ্রামীণ এলাকায় যারা রোজগারের ব্যবস্থা খুঁজে পায় না, তারা রোজগারের জন্য শহরে গমন করে। গ্রামের সর্বজনীন সম্পদ যেমন পুকুর, বনভূমি এবং চারণভূমি ইত্যাদির ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার ফলে, গ্রাম থেকে নগরে প্রচরণের গতিতে বৃদ্ধি আসে। যে সকল সর্বজনীন সম্পদগুলি গ্রামের দরিদ্র মানুষদের জীবিকা সুনিশ্চিত করত, কেন না তারা খুব স্বল্প জমির অধিকারী হত অথবা তাদের নিজস্ব কোনো জমিই ছিল না। বর্তমানে এই সম্পদগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে উঠেছে বা ব্যাপকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, (যেমন পুকুর শুকিয়ে গেছে বা পর্যাপ্ত মৎস্যচাষ হয় না; অরণ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে) তাই সাধারণ মানুষের কষ্টের বৃদ্ধি হয়, যখন সেই সকল সম্পদগুলির উপর তার অধিকার আর বজায় থাকে না এবং বাজার থেকে প্রচুর জিনিস ক্রয় করতে হয় যা পূর্বে বিনামূল্যে ব্যবহার করা যেত (যেমন জ্বালানি, গবাদি পশুর জাবনা বা অনুপূরক খাদ্যদ্রব্য)। এই পরিস্থিতি আরও কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় কারণ গ্রামে নগদ আয়ের সুযোগ সীমিত।

কখনও কখনও, বিভিন্ন সামাজিক কারণেও শহরকে পছন্দ করা হয়। যেমন শহরে অপেক্ষাকৃত অনামী জীবনযাপন করা সম্ভব। এটা সত্য যে নগরীয় জীবনে অপরিচিতদের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া সম্ভবপর হয়, যা বিভিন্ন কারণ বশত লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতিদের মতো সামাজিকভাবে নির্যাতিত গোষ্ঠীকে শহর আংশিক সুরক্ষা প্রদান করে। তার কারণ, এই গোষ্ঠীগুলি প্রতিদিন গ্রামে নির্যাতন এবং হেনস্তার শিকার হয়ে থাকে। শহরের অনামী জীবন, গ্রামের সামাজিক প্রভাবশালী গোষ্ঠীর দরিদ্র শ্রেণিকে শহরে নিম্নমানের কাজে যুক্ত হতে সুযোগ দেয়। এই সকল কারণে, গ্রামবাসীদের জন্য শহর এক আকর্ষণীয় গন্তব্যস্থল। তার ফলস্বরূপ নগরীয় জনসংখ্যার দৈনন্দিন বৃদ্ধি ঘটছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নগরায়ণের দ্রুত বৃদ্ধি এরই প্রমাণ।

নগরায়ণের দ্রুত গতিতে বৃদ্ধির সাথে সেখানে মহানগরগুলির বিকাশ সবচেয়ে বেশি হচ্ছে। এই মহানগরগুলি

গ্রামীণ এলাকা এবং ছোটো শহরের প্রচরণকারীদের আকর্ষণ করে। ভারতে এখন প্রায় 5,161 শহর ও শহরতলি রয়েছে, যেখানে 286 মিলিয়ন মানুষ বসবাস করছে। সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় হল যে নগরীয় জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষ 27 টি বড়ো শহরে বসবাস করে, যেখানে জনসংখ্যা এক মিলিয়নেরও বেশি। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, ভারতে যে দ্রুত হারে শহরগুলির বৃদ্ধি হচ্ছে, সে অনুযায়ী নগরীয় পরিকাঠামোর বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া, এই শহরগুলো গণমাধ্যমের প্রাথমিক কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। এর ফলে বর্তমান ভারতের ‘সর্বজনীন চেহারা’ গ্রামের তুলনায় বেশি নগরীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রে আজও গ্রামীণ এলাকাগুলো নির্ণায়ক শক্তি রূপে কাজ করে।

2.7 ভারতের জনসংখ্যানীতি

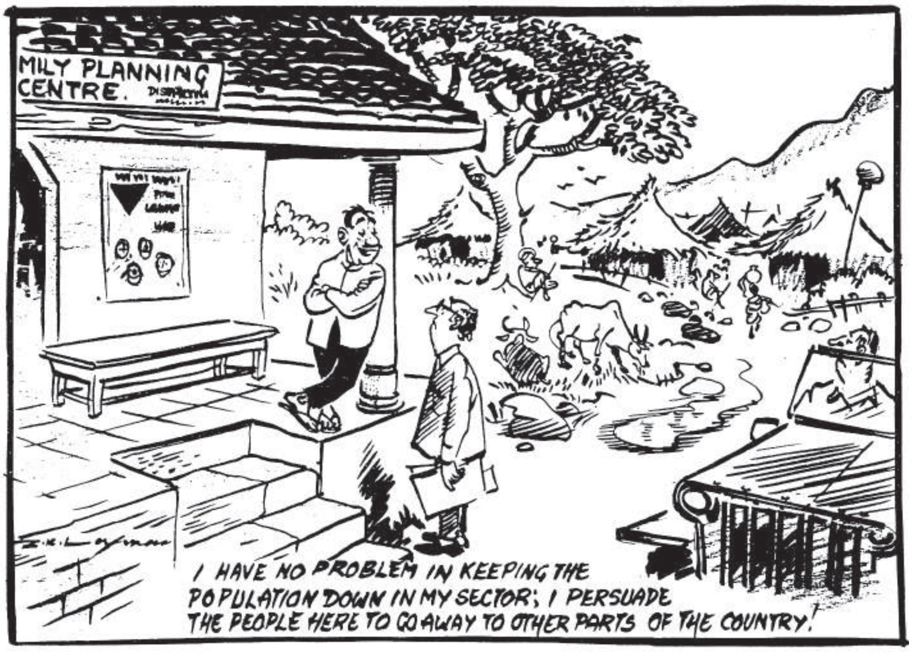

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা দেশের সম্ভাব্য উন্নয়ন, জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন শৈলীকে প্রভাবিত করে। যেসব উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রায়শই বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়, তাদের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রমাণিত। তাই এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে ভারতে বিগত অর্ধশত বছর ধরে সরকারি জনসংখ্যা নীতি বিদ্যমান রয়েছে। বাস্তবে, ভারতই সম্ভবত প্রথম দেশ যেখানে 1952 সালে জনসংখ্যানীতি ঘোষণা করা হয়।

বস্তুত জনসংখ্যানীতি ‘জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম’- এর চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। এই কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্যেগুলি মূলত একই রয়েছে — জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ও আকারকে সামাজিকভাবে কাম্য করে তোলার প্রচেষ্টা। প্রারম্ভিক দিনগুলোতে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন জন্ম নিরোধকের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের গতি রোধ করা, জনস্বাস্থ্যের মান উন্নতি এবং জনগণকে জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলির বিষয়ে সচেতন করা। বিগত 50 বছর ধরে, জনসংখ্যা সম্পর্কিত ক্ষেত্রে ভারত অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি অর্জন করেছে, যা সংক্ষেপে বাক্স 2.4 -এ দেওয়া হয়েছে।

1975-76 সালে ভারতে রাষ্ট্রীয় আপাতকালীন স্থিতিতে (National Emergency) পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের অনেক বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। সেই সময় সাধারণ সংসদীয় এবং আইনি কার্যপ্রণালী স্থগিত থাকে এবং শুধু বিশেষ আইন এবং অধ্যাদেশ যা সরকার দ্বারা সরাসরি জারি হত (অর্থাৎ সংসদ দ্বারা না পাশ হওয়া) সেগুলোই কার্যকর ছিল। সেই রাষ্ট্রীয় আপাতকালীন স্মৃতিতে ‘গণ নির্বীজনের’ মতো বাধ্যতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারকে নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার গুরুতরভাবে প্রচেষ্টা করে।

বাক্স 2.4

ভারতের জনসংখ্যাগত বিবর্তন

ভারতীয় জনগণনা উপাত্ত অনুসারে 1991 সাল থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে হ্রাস লক্ষ করা যাচ্ছে, 1990 সালে, একজন মহিলা গড়ে 3.8 শিশুর জন্ম দিত এবং তা হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে একজন মহিলা গড়ে 2.7 শিশুর জন্ম দেয় (Bloom, 2011)। যদিও প্রজনন ক্ষমতা এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছে, তা সত্ত্বেও অনুমান করা হচ্ছে যে, ভারতের জনসংখ্যা বর্তমান 1.2 বিলিয়ন থেকে 2050 সালে 1.6 বিলিয়ন হতে পারে। এর কারণ হল জনসংখ্যার গতি (Population Momemtum)। 'জনসংখ্যার গতি' বলতে এমন এক পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন মহিলার দল, পরবর্তী প্রজন্মে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটাবে, যদিও পূর্ব প্রজন্মের তুলনায় তারা কম সংখ্যক সন্তান জন্ম দিতে পারে। তাছাড়া, অশোধিত মৃত্যুর হার (Crude Death Rate)-এবং অশোধিত জন্মহার (Crude Birth Rate)-এ বিগত চার দশক ধরে হ্রাস এটা সংকেত দেয় যে, ভারত 'সংক্রমণকালীন' স্তর পেরিয়ে উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। 1950 থেকে 1990 সাল পর্যন্ত অশোধিত মৃত্যুহারের তুলনায়, অশোধিত জন্মহার কম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু 1990 সালে অশোধিত জন্মহারের হ্রাস অশোধিত মৃত্যুহারের তুলনায় তীব্র ছিল। এর ফলে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে -এ চলে এসেছে।

বাক্স 2.5

2010 সালের জাতীয় সামাজিক জনসংখ্যাগত লক্ষ্য

- প্রজননগত এবং শিশু স্বাস্থ্য পরিসেবা সংক্রান্ত যোগান এবং পরিকাঠামো সংক্রান্ত অসাধিত/অপূরিত/ মৌলিক বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করা।
- বিদ্যালয় স্তরে 14 বছর বয়স পর্যন্ত বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান ও প্রাথমিক এবং মাধ্যমিকস্তরে ছাত্র ছাত্রীদের 'ড্রপ আউট' (স্কুল ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা)-এর সংখ্যা 20 শতাংশের নীচে নিয়ে আসা।
- নবজাতক শিশুর মৃত্যুর হারে হ্রাস অর্থাৎ প্রতি 1000 জীবিত শিশুর মধ্যে 30 -এরও কম সংখ্যক শিশুর মৃত্যু।
- প্রসূতি মায়ের মৃত্যু অনুপাতে হ্রাস অর্থাৎ প্রতি 100000 জীবিত শিশুর জন্মের সময় 100-এর কম সংখ্যক মায়ের মৃত্যু।
- সকল প্রতিরোধযোগ্য রোগ থেকে বাঁচার লক্ষ্যে সব শিশুদের সময় মতো টিকা দান।
- বালিকাদের বিবাহের বয়সে বিলম্ব অর্থাৎ 18 বছর বয়সের ছোটো-মেয়ের বিবাহ না দেওয়া, যথাসম্ভব পাত্রীর বয়স 20 বছরের উপরে হওয়া।
- 80 শতাংশ প্রসব কার্য প্রতিষ্ঠানিক প্রসূতিকেন্দ্র বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সম্পন্ন করা। 100 শতাংশ প্রসবকার্যে শুধুমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রসব কর্মীদের সাহায্য নেওয়া।
- প্রজনন ও গর্ভনিরোধ সংক্রান্ত পরিষেবার ক্ষেত্রে ব্যাপক মাত্রায় তথ্য ও কাউন্সিলিং উপলব্ধ করানো।
- জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এবং প্রসবের ক্ষেত্রে 100 শতাংশ নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রেশন করা।
- AIDS রোগের প্রসারের উপর নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রজননগত সংক্রমণ ও যৌন সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে জাতীয় AIDS নিয়ন্ত্রণ সংগঠন (National AIDS Control Organisation)-এর সাথে সমন্বয় সাধন করা।
- সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।
- প্রজননগত ও শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিষেবায় উন্নতি সাধন এবং সমস্ত নাগরিকদের সাহায্য করার লক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতি যেমন আয়ুর্বেদ, যোগবিদ্যা, স্নায়ুবিদ্যা ইত্যাদির সমন্বয় সাধন।
- মোট প্রজনন হারের প্রতিস্থাপন স্তরগুলো উপলব্ধি করার জন্য ' ছোটো পরিবারের' ধাঁচকে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরা।
- সামাজিক স্তরে এইসব বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এক কেন্দ্রাভিমুখতা (Convergence), যাতে এগুলো পরিবার কল্যাণ মানবকেন্দ্রিক কর্মসূচিতে পরিণত হয়।

Aren't you proud? We are the world's biggest democracy and soon we will be a still bigger democracy!

এখানে নির্বীজকরণ বলতে এমন চিকিৎসা পদ্ধতিকে বোঝানো হয়েছে যার দ্বারা গর্ভধারণ এবং শিশু জন্মকে হ্রাস করা সম্ভব। যেমন — পুরুষদের ক্ষেত্রে নির্বীজকরণকে ভাসেকটমি এবং মহিলাদের বন্ধ্যাত্বকরণকে টিউবেক্টমি বলা হয়। প্রচুর সংখ্যক, বিশেষ করে দরিদ্র এবং ক্ষমতাহীন মানুষদের বলপূর্বক নির্বীজন করা হয়। তাছাড়া, নিম্ন স্তরীয় সরকারি আধিকারিকদের (যেমন বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা অফিসের কর্মচারীদের) উপর চাপ সৃষ্টি করা হয় যাতে তারা সাধারণ মানুষদের যেভাবেই হোক নির্বীজকরণ শিবিরে নিয়ে আসে। এই কাজের জন্য প্রচুর নির্বীজন শিবির ও সংগঠন করা হয়েছিল। কিন্তু এই কার্যক্রমের ব্যাপক বিরোধিতা করা হয় এবং আপতকালীন স্থিতির পর নতুন নির্বাচিত সরকার এই কার্যক্রম বাতিল করে দেয়।

আপতকালীন স্থিতির পরবর্তী সময়ে জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে ‘জাতীয় পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম’ হিসাবে পুনরায় নামকরণ করা হয় এবং এই কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত করে তোলার দমনমূলক পদ্ধতিগুলোকে পরিত্যাগ করা হয়। এখন এই কার্যক্রমের বৃহৎ সামাজিক জনতাত্ত্বিক উদ্দেশ্য রয়েছে। জাতীয় জনসংখ্যা নীতি, 2000 -এর অন্তর্গত কিছু নতুন নির্দেশিকা তৈরি হয়। এই নির্দেশিকাগুলো 2010 সালের ‘নীতিগত লক্ষ্য’ বাক্স 2.5 এ সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে।

ভারতের জাতীয় পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমের ইতিহাস আমাদের শেখায় যে, জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অনেক উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু তা সত্ত্বেও অধিকাংশ জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে (বিশেষ করে মানব প্রজনন সম্পর্কিত) অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্নাবলী

1. জনসংখ্যার বিবর্তনতত্ত্বের মূল যুক্তিটি বর্ণনা করো। কেন 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণকে' বর্তমান কালের সঙ্গে যুক্ত করা হয়?

2. ম্যালথুস কেন বিশ্বাস করতেন যে খরা এবং মহামারীর মতো বিনাশকারী ঘটনা যা বড়ো সংখ্যক মৃত্যুর কারণ হয়, তা আসলে অনিবার্য?

3. 'জন্ম হার' এবং 'মৃত্যু হার' বলতে কী বোঝ? বর্ণনা করো কেন জন্মহার আপেক্ষিকভাবে ধীর গতিতে হ্রাস হয় যখন মৃত্যুহারে দ্রুত হ্রাস লক্ষ করা যায়।

4. ভারতের কোন্ রাজ্যগুলি জনসংখ্যা বৃদ্ধির 'প্রতিস্থাপন স্তর'-এর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে? কোন্ রাজ্যগুলিতে এখনও জনসংখ্যা বৃদ্ধির তীব্র হার লক্ষ করা যায়? তোমার মতে, এই সকল আঞ্চলিক ভিন্নতাগুলির কারণ কী?

5. জনসংখ্যার 'বয়স অনুসারে কাঠামো' বলতে কী বোঝ? অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা বিকাশের ক্ষেত্রে এটা কেন প্রাসঙ্গিক?

6. 'লিঙ্গ অনুপাত' বলতে কী বোঝ? লিঙ্গ অনুপাত হ্রাসের প্রভাব কী হতে পারে? তোমার মতে পিতামাতারা কি এখনও কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্র সন্তান কামনা করে? তোমার মতে অধিকাংশ পিতামাতার কাছে কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্র সন্তান কেন কাম্য?

REFERENCE

Bloom, David. 2011. '7 Billion and Counting', *Science,* Vol. 333, No.562. doi:10.1126/science.1209290 (accessed on 8 December, 2017)

Bose, Ashish. 2001. *Population of India, 2001 Census Results and Methodology*. B.R. Publishing Corporation. Delhi.

Davis, Kingsley. 1951. *The Population of India and Pakistan.* Russel and Russel. New York.

India, 2006. *A Reference Annual.* Publications Division, Government of India. New Delhi.

Kirk, Dudley. 1968. 'The Field of Demography', in Sills, David. ed. *International Encyclopedia of the Social Sciences.* The Free Press and Macmillan. New York.

Visaria, Pravin and Visaria, Leela. 2003. 'India's Population: Its Growth and Key Characteristics', in Das, V. ed. *The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology.* Oxford University Press. Delhi.

Websites

http://populationcommission.nic.in/facts1.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/spanish_flu

http://www.who.int/mediacenter/factsheets/fs211/en/

http://censusindia.gov.in

Notes

তৃতীয় অধ্যায়

সামাজিক প্রতিষ্ঠান : ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্তন

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভারতের জনসংখ্যার গঠন এবং গতিবিদ্যা সম্পর্কে জানার পর এখন আমরা সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অধ্যয়ন করব। জনসংখ্যা শুধুমাত্র একটি পৃথক, সম্পর্কহীন ব্যক্তিবর্গের সংগ্রহকে বোঝায় না, এটি স্বতন্ত্রভাবে গঠিত কিন্তু বিভিন্ন ধরনের শ্রেণি এবং সম্প্রদায়ের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একটি সমাজ। এই সম্প্রদায়গুলিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক সম্পর্কদ্বারা টিকিয়ে রাখা হয় এবং নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই অধ্যায়ে আমরা ভারতীয় সমাজের তিনটি মুখ্য প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করব যেমন জাতি, উপজাতি এবং পরিবার।

3.1 জাতি এবং জাতিপ্রথা

যে-কোনো ভারতীয়ের মতো, তোমরা নিশ্চয়ই জান যে 'জাতি' একটি প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নাম যা হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় ইতিহাস এবং সংস্কৃতির অংশ হিসেবে চলে আসছে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে বসবাসকারী কোনো ভারতীয়ের মতো, তোমরা এটাও জান যে 'জাতি' বলে কোনো কিছু আজও ভারতীয় সমাজের সুনিশ্চিত একটি অংশ। কতদূর পর্যন্ত এই দুই 'জাতি'— একটি যা ভারতের অতীতের অংশ হিসাবে মানা হয় এবং অন্যটি যা বর্তমানের অংশ — সমান ব্যাপার বা বিষয়? এই অংশে আমরা এই প্রশ্নটিরই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।

অতীতে জাতি

জাতি একটি প্রতিষ্ঠান যা অনন্যভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে জড়িত। যদিও বিশ্বের অন্যান্য অংশে অনুরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী সামাজিক ব্যবস্থা বিদ্যমান, তা সত্ত্বেও জাতির সঠিক রূপ অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। যদিও এটি হিন্দু সমাজের একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান, তথাপি জাতি ভারতীয় উপমহাদেশের মুখ্য অ-হিন্দুদের মধ্যেও বিস্তৃত। এটি বিশেষ করে মুসলমান, খ্রিস্টান ও শিখদের জন্য সত্য।

বিশেষ পরিচিত, ইংরেজি 'Caste' শব্দটি পর্তুগিজ শব্দ 'Casta' থেকে নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে খাটি জাত। এই শব্দটির দ্বারা বুঝানো হয় একটি বিস্তৃত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যা ভারতীয় ভাষায় (প্রাচীন সংস্কৃত দ্বারা শুরু হয়েছিল) দুটি স্বতন্ত্র শব্দ 'বর্ণ' এবং 'জাতি' দিয়ে বোঝানো হয়েছে। 'বর্ণ' আক্ষরিক অর্থে 'রং', নামটি সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চর্তুঃবিভাজন বোঝাতে দেওয়া হয়েছে, যদিও এতে জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে বাদ দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে 'জাতি-বহির্ভূত', বিদেশি, ক্রীতদাস, বিজেতা এবং অন্যান্যরা, যাদের কখনও কখনও পঞ্চমাস (panchamas) বা পঞ্চম ভাগ হিসেবে দেখানো হয়। 'জাতি' একটি জাতিবাচক (generic) শব্দ যার সাহায্যে জড় পদার্থ থেকে শুরু করে উদ্ভিদ, প্রাণী এবং মানুষ পর্যন্ত প্রজাতি অথবা কোনো ধরনের জিনিসকে বোঝানো হয়। ভারতীয় ভাষায় জাতি শব্দটি সর্বাধিক ব্যবহার করা হয় জাতির প্রতিষ্ঠানকে বোঝাতে, যদিও মজার ঘটনা হল যে, ভারতীয় ভাষায় কথা বলা ব্যক্তিরা ক্রমবর্ধমানভাবে, ইংরেজি শব্দ 'caste' ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

বর্ণ এবং জাতির মধ্যে সুনির্দিষ্ট সম্পর্কটি পণ্ডিতদের কাছে অনেক জল্পনা এবং বিতর্কের বিষয় হয়ে গেছে। অতি প্রচলিত ব্যাখ্যা হচ্ছে বর্ণকে সারা ভারতের সামগ্রিক শ্রেণি বিভাজন হিসেবে ব্যবহার করা, যেখানে জাতি হচ্ছে আঞ্চলিক বা স্থানীয় উপ-শ্রেণি বিভাজন, যার সঙ্গে জড়িত শতাধিক এমনকি হাজারো জাতি এবং উপজাতির একটি অতি জটিল পদ্ধতি।

এটার অর্থ হচ্ছে যেখানে চতুঃবর্ণ শ্রেণি বিভাজন সারা ভারতে প্রচলিত, জাতি পর্যায়ক্রমে অনেক স্থানীয় শ্রেণি বিভাজন আছে যা অঞ্চল থেকে অঞ্চলে আলাদা।

জাতিপ্রথার সুনির্দিষ্ট বয়সসীমা নিয়েও ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে। সাধারণভাবে যদিও এটা মেনে নেওয়া হয় যে চতুঃবর্ণ শ্রেণি বিভাজন প্রায় তিনশো বছর পুরানো। যেহেতু 'জাতি প্রথা' বলতে বিভিন্ন সময়কালে বিভিন্ন জিনিসকে বোঝানো হয়েছে, তাই তিনশো বছর ধরে একই পদ্ধতি অব্যাহত থাকা বা সমানভাবে চলতে থাকার ধারণা একটি বিভ্রান্তিকর চিন্তা। প্রাথমিক ধাপে, বৈদিক যুগের শেষভাগে, আনুমানিক 900-500 B.C.-র মধ্যবর্তী সময়ে জাতিপ্রথা প্রকৃতই বর্ণপ্রথা ছিল এবং শুধুমাত্র চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল। এই বিভাজনগুলি খুব বেশি বিস্তৃত বা খুব কঠোর ছিল না এবং সেটা জন্মসূত্রে নির্ধারিত ছিল না। এই বিভাগগুলির মধ্যে চলাচল শুধুমাত্র সম্ভবপরই ছিল না; সেটা খুবই প্রচলিত ছিল। শুধুমাত্র বৈদিকযুগের পরেই জাতি একটি কঠোর প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল যা আমরা জানতে পারি তার সুপরিচিত সংজ্ঞাগুলো থেকে।

জাতির কয়েকটি অতি সাধারণভাবে নির্ধারিত বৈশিষ্ট নীচে দেওয়া হল ঃ

1. জাতি জন্মসূত্রে নির্ধারিত ঃ একটি শিশু তার মাতাপিতার জাতিতেই 'জন্মগ্রহণ' করে। জাতি কখনও পছন্দের ব্যাপার না। কেউ তার নিজের জাতি পরিবর্তন করতে পারে না, ছাড়তে পারে না অথবা জাতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারেও পছন্দ করতে পারে না, যদিও এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে একজন ব্যক্তি তার জাতি থেকে বহিষ্কৃত হতে পারে।
2. একটি জাতির সদস্যপদের সঙ্গো বিবাহের সম্পর্ক কঠোরভাবে জড়িত। জাতি একটি 'অন্তর্বিবাহ' গোষ্ঠী, অর্থাৎ গোষ্ঠীর সদস্যের মধ্যেই বিবাহ সীমাবদ্ধ।
3. জাতির সদস্যপদের সঙ্গো খাদ্য এবং খাদ্য-ভাগাভাগির নীতিও জড়িত। কে কী ধরনের খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে বা পারবে না সেটা নির্দিষ্ট করা আছে এবং কে কার সঙ্গো খাদ্য ভাগাভাগি করতে পারবে সেটাও নির্দিষ্ট।
4. জাতি একটি পদ্ধতির সঙ্গো যুক্ত যেখানে অনেকগুলি জাতি পদ এবং মর্যাদার ক্রম অনুসারে পর্যায়ক্রমে সজ্জিত। ধারণাগতভাবে, প্রত্যেক ব্যক্তির একটি জাতি আছে এবং প্রত্যেকটি জাতির একটি নির্দিষ্ট জায়গা আছে সকল জাতির মিলিত পর্যায়ক্রমের মধ্যে। যদিও অনেক জাতির পর্যায়ক্রমিক অবস্থান, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ভিন্ন হতে পারে, বিশেষ করে মধ্যবর্তী পদে অবস্থানরত জাতিসমূহের, তা সত্ত্বেও ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ বা পর্যায়ক্রম সব জায়গায় দেখা যায়।
5. জাতির সঙ্গো আবার উপ-বিভাজনও জড়িয়ে আছে অর্থাৎ জাতির ভিতর প্রায় সবসময় উপ-জাতি হয়ে থাকে এবং কখনও কখনও উপ-জাতির মধ্যেও আবার উপ-উপ-জাতি হয়ে থাকে। এটাকে খণ্ডাত্মক সংগঠন (Segmental organisation) হিসাবে উল্লেখ করা হয়।
6. পারম্পরিকভাবে জাতি পেশার সঙ্গো যুক্ত ছিল। একজন ব্যক্তি যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করত, সে শুধুমাত্র সেই জাতির সঙ্গো যুক্ত পেশাকেই গ্রহণ করতে পারত। তাই পেশা ছিল বংশানুক্রমিক অর্থাৎ এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরিত হত। অন্যদিকে, একটি

আয়ানকালি

(1863 - 1914)

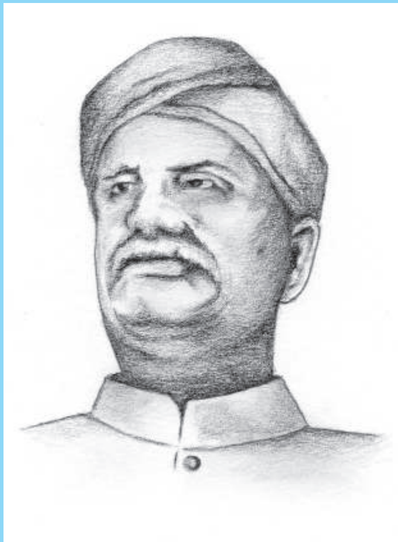

আয়ানকালির জন্ম কেরলে হয়েছিল, উনি নিচু জাতি এবং দলিতদের নেতা ছিলেন। উনার প্রচেষ্টাতে, দলিতরা সর্বজনীন রাস্তায় হাঁটার এবং দলিত শিশুরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার অনুমতি পেয়েছিল।

যতিরাও গোবিন্দরাও ফুলে (1827-1890)

যতিরাও গোবিন্দরাও ফুলে জাতি ব্যবস্থার অন্যায়ের সমালোচনা করেছিলেন এবং পবিত্রতা ও অপবিত্রতার (purity and pollution) ঘোরতর নিন্দা করেছিলেন। 1873 সালে উনি সত্য শোধক সমাজের প্রবর্তন করেন, যা নিচু জাতির লোকের মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায় প্রাপ্তির জন্য সমর্পিত ছিল।

নির্দিষ্ট পেশা একটি নির্দিষ্ট জাতির সঙ্গো যুক্ত হওয়ার ফলে শুধুমাত্র ওই জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরাই গ্রহণ করতে পারত — অন্যান্য জাতির সদস্যরা এই পেশায় যুক্ত হতে পারত না। এই বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারিত নিয়ম হিসাবে প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়। যেহেতু এই নির্ধারিত নিয়ম সবসময় ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ হত না, তাই আমরা এটা বলতে পারি না যে এই নিয়ম কতদূর পর্যন্ত জাতির অভিজ্ঞতাসুলভ বাস্তবতা নির্ধারণ করত — বাস্তবিক অর্থে সেই সময়ে বসবাসকারী লোকদের জন্য। তোমরা যেমন দেখতে পাও, অধিকাংশ নির্ধারিত নিয়মগুলি বিভিন্ন ধরনের নিষেধ এবং সীমাবদ্ধতার সঙ্গো যুক্ত। ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে এটাও স্পষ্ট করে বোঝা যায় যে জাতি একটি অত্যন্ত অসম প্রতিষ্ঠান ছিল — কিছু জাতি এই পদ্ধতিতে লাভবান হয়েছিল আবার কিছু জাতিকে অধীনতা এবং কখনও শেষ না হওয়া শ্রমিক জীবনের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, জন্মসূত্রে কঠোরভাবে একবার জাতির নির্ধারণ হয়ে গেলে, একজন ব্যক্তির পক্ষে তার জীবনের পরিস্থিতি পরিবর্তন করা নীতিগতভাবে অসম্ভব ছিল। উঁচু জাতির লোকেরা সবসময়ই উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন হয়ে থাকে, যদিও তারা সেটার যোগ্য হতে পারে বা নাও হতে পারে, অন্যদিকে নীচু জাতির লোকেরা সবসময়ই নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে থাকে।

তাত্ত্বিকভাবে, জাতিপ্রথাকে বুঝতে পারা যায় দুটি নীতির মিশ্রণ হিসাবে, একটি ভিন্নতা এবং পৃথকীকরণের উপর নির্ধারিত এবং অন্যটি সম্পূর্ণতা এবং পর্যায়ক্রমের উপর। আনুমানিকভাবে প্রতিটি জাতি অন্য একটি জাতি থেকে আলাদা এবং তাই প্রতিটি জাতিই অন্য আরেকটি জাতি থেকে কঠোরভাবে বিচ্ছিন্ন। এজন্য জাতির অধিকাংশ শাস্ত্রীয় নিয়ম বা বিধি সাজানো হয়েছে জাতিগুলোকে সংমিশ্রণ থেকে প্রতিরোধ করতে। এই নিয়মগুলোর মধ্যে বিবাহ, খাদ্য ভাগাভাগি, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া থেকে শুরু করে পেশা পর্যন্ত যুক্ত। অন্যদিকে, এই ধরনের ভিন্ন ভিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন জাতিগুলির কোনো ব্যক্তিগত অস্তিত্ব নেই — তারা শুধুমাত্র একটি বড়ো সম্পূর্ণতার সঙ্গো জড়িত থেকেই তাদের নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে, সকল জাতির অন্তর্ভুক্তিতেই সমাজের সম্পূর্ণতা। এছাড়াও, এই সামাজিক সম্পূর্ণতা বা ব্যবস্থা কোনো সমমাত্রিক ব্যবস্থা নয়, এটি একটি পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা। প্রতিটি স্বতন্ত্র জাতির সমাজে শুধু একটি পৃথক জায়গাই থাকে না, সেই সঙ্গো একটি নির্দিষ্ট পদ — একটি নির্দিষ্ট অবস্থানও থাকে সিঁড়ির মতো বিন্যাসে যা সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্নে নেমে যায়।

জাতির ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাস ব্যবস্থা ‘পবিত্রতা’ (purity) এবং অপবিত্রতা (pollution)র পার্থক্যের উপর নির্ভর করে হয়ে থাকে। এটি এমনকিছুর মধ্যে বিভাজন যেটাকে শুদ্ধতার কাছাকাছি হিসাবে বিশ্বাস করা হয় (তাই ধর্মীয় পবিত্রতার অর্থ বোঝায়) এবং কোনোকিছু যা শুদ্ধতা থেকে দূরে বা শুদ্ধতার বিপরীত হিসাবে বিশ্বাস করা হয়, তাই সেটাকে ধর্মীয় অপবিত্রতা মানা হয়। যে জাতিকে ধর্মীয়ভাবে পবিত্র মানা হয় তার মর্যাদা উচ্চ, আবার যে জাতিকে কম পবিত্র বা অপবিত্র মানা হয়, তার মর্যাদাও কম। সকল সমাজেই যেমন পার্থিব ক্ষমতা (অর্থাৎ অর্থনৈতিক অথবা সামরিক ক্ষমতা) সামাজিক মর্যাদার সঙ্গো ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তাই যারা ক্ষমতা সম্পন্ন তাদের মর্যাদাও উচ্চ হয়ে থাকে এবং যাদের ক্ষমতা কম তাদের মর্যাদাও কম। ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করেন যে যারা যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছিল তাদের প্রায়ই নীচু জাতির মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল।

পরিশেষে, এটা বলা যায় যে জাতিগুলি ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র অসমান নয়, তারা সম্ভবত একে অপরের পরিপূরক এবং অপ্রতিযোগী গোষ্ঠী।

অন্যদিকে,সামাজিক ব্যবস্থায় প্রতিটি জাতির একটি নিজস্ব স্থান আছে যা অন্য একটি জাতি দখল করতে পারে না। যেহেতু জাতি পেশার সঙ্গেও যুক্ত, তাই এই ব্যবস্থা সামাজিক শ্রম বিভাজন হিসাবে কাজ করে, সেটা ছাড়া নীতিগতভাবে জাতি আর কোনো ধরনের সচলতার (mobility) অনুমতি দেয় না।

এটা আশ্চর্যজনক নয় যে, অতীত সম্পর্কে বিশেষ করে প্রাচীনকাল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের উৎস অপর্যাপ্ত। এটা স্থির করা খুব কঠিন যে সেই সময়ের পরিস্থিতি কী ছিল অথবা কেন প্রতিষ্ঠান এবং আচার-ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার কারণগুলি। কিন্তু, তাছাড়াও যদি আমরা এই সবকিছু জানতে পারতাম, তাও এটা বলা যেত না যে আজকে আমাদের কী করা উচিত। শুধুমাত্র এই জন্যে যে অতীতে যা হয়েছিল সেটা বা অতীতের পরম্পরা বা ঐতিহ্য নিশ্চিতভাবে চিরতরে ভুল অথবা শুদ্ধ হতে পারে না। প্রত্যেক যুগেই এই ধরনের প্রশ্ন নতুনরূপে চিন্তা করতে হবে এবং এটার নিজস্ব সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সর্বজনীন নির্ণয় নিতে হবে।

সাবিত্রী বাঈ ফুলে
(1831-1897)

সাবিত্রী বাঈ ফুলে পুনেতে স্থাপিত দেশের প্রথম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। উনি উনার সম্পূর্ণ জীবন শূদ্র এবং অতি-শূদ্রদের শিক্ষাদানে অর্পণ করেছিলেন। উনি কৃষক এবং শ্রমিকদের জন্য একটি নৈশবিদ্যালয় শুরু করেছিলেন। প্লেগপীড়িত রোগীদের সেবা করার সময় উনার মৃত্যু হয়।

উপনিবেশবাদ এবং জাতি

প্রাচীনকালের তুলনায় বর্তমানের ইতিহাসে আমরা জাতি সম্পর্কে অনেক বেশি জানি। যদি এটা মানা হয় যে আধুনিক ইতিহাস উনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল, তাহলে 1947- এ ভারতের স্বাধীনতাকে উপনিবেশিক কাল (আনুমানিক 1800 থেকে 1947, প্রায় 150 বছর) এবং স্বাধীনোত্তর অথবা উপনিবেশিক কালের পরবর্তী সময় (1947 থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ছয় দশক)-এর স্বাভাবিক বিভাজন রেখা মানা যেতে পারে। একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতির বর্তমান রূপ উপনিবেশিক কালে এবং স্বতন্ত্র ভারতে দ্রুত গতিতে হওয়া পরিবর্তন উভয়ের দ্বারাই খুব দৃঢ়ভাবে আকার পেয়েছে।

পণ্ডিতরা এই ব্যাপারে একমত যে উপনিবেশিক কালে সকল মুখ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির এবং বিশেষ করে জাতির মতো একটি প্রতিষ্ঠানের সবিশেষ পরিবর্তন হয়েছিল। বস্তুত, কিছু পণ্ডিতগণ মনে করেন যে বর্তমানে আমরা জাতির যে রূপকে জানি সেটা প্রাচীন পরম্পরা থেকে বেশি উপনিবেশবাদের সৃষ্ট। এই সকল পরিবর্তন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা ইচ্ছাকৃত নয়। প্রাথমিকভাবে, ইংরেজ প্রশাসকরা দক্ষতার সঙ্গে দেশকে শাসন করার জন্য জাতির জটিলতা বোঝার চেষ্টা শুরু করেছিলেন। তাদের এই ধরনের কিছু চেষ্টার অন্তর্গত সারা দেশের বিভিন্ন উপজাতি এবং জাতির 'প্রথা এবং আচরণ'-এর খুব সুশৃঙ্খল এবং গভীর নিরীক্ষণ করে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছিল। অনেক ইংরেজ প্রশাসক-আধিকারিক আবার অপেশাদার জাতিতত্ত্ববিদ ছিলেন এবং এই ধরনের নিরীক্ষণ (সমীক্ষা) ও অধ্যয়নে তাদের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল।

কিন্তু এখন পর্যন্ত জাতির উপর তথ্য সংগ্রহ করার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রচেষ্টা হল জনগণনা। 1860 সালে প্রথম জনগণনা শুরু হয়েছিল যা 1881 সাল থেকে নিয়মিতভাবে ভারতীয় ইংরেজ সরকারের দ্বারা প্রতি দশ বছর অন্তর অন্তর করানো শুরু হয়েছিল। 1901 সালে হারবার্ট রিস্‌লের পরিচালনায় হওয়া জনগণনা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ এই জনগণনায় জাতির সামাজিক ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাস একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে কোনো জাতিকে অন্যান্য জাতিগুলির তুলনায় অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং সেটার উপর নির্ভর করে ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাস ব্যবস্থায়

প্রত্যেকটি জাতির একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল। জাতির সামাজিক উপলব্ধি বা বোধ-এর উপর এই প্রচেষ্টার একটি বিশাল প্রভাব পড়েছিল এবং বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিদের দ্বারা জনগণনা অধ্যক্ষের কাছে শত শত আবেদন পাঠানো হয়েছিল যেখানে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে তাদের জাতিকে উচ্চ স্থান দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছিল এবং তাদের দাবির সমর্থনে তারা ঐতিহাসিক এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণও দাখিল করেছিল। সামগ্রিকভাবে, পণ্ডিতগণ অনুভব করেন যে জাতি গণনার এই ধরনের সোজাসুজি এবং সরকারিভাবে জাতির মর্যাদা নির্ধারণের প্রয়াস জাতি প্রতিষ্ঠানকেই আমূল বদলে দিয়েছে। এই ধরনের হস্তক্ষেপের পূর্বে, জাতির পরিচয় অপেক্ষাকৃত বেশি অস্থির এবং কম কঠোর ছিল; একবার যখন সেটা গণনা এবং নথিভুক্ত হতে শুরু হয়েছিল, তখন থেকেই জাতির একটি নতুন জীবন শুরু হয়ে গেছিল।

পেরিয়ার (ই.ভি.রামাস্বামী নায়কর)
(1879-1973)

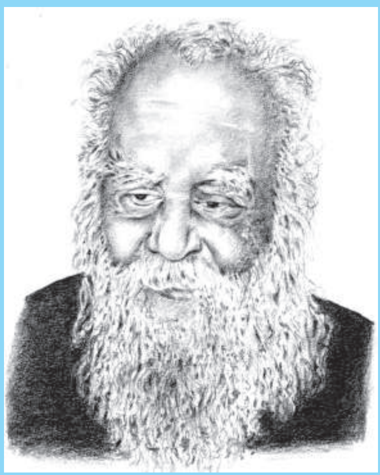

পেরিয়ার (ই.ভি. রামাস্বামী নায়কর) একজন যুক্তিবাদী এবং দক্ষিণ ভারতে নিম্নজাতি আন্দোলনের নেতা হিসেবে পরিচিত। তিনি জনগণকে এটা উপলব্ধি করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যে সকল মানুষ সমান এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মগত অধিকার হল স্বাধীনতা ও সাম্য উপভোগ করা।

উপনিবেশিক রাষ্ট্রের অন্যান্য হস্তক্ষেপের ফলেও এই প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাব ফেলেছিল। জমির রাজস্ব বন্দোবস্ত এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা এবং আইনগুলি উঁচু জাতির লোকদের প্রথাগত (জাতি ভিত্তিক) অধিকারের আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার কাজ করেছিল। এই জাতিগুলি এখন সামন্ত শ্রেণির পরিবর্তে আধুনিক অর্থে ভূ-স্বামী অর্থাৎ জমির মালিক হয়ে উঠেছিল এবং জমির উৎপাদনের উপর অথবা রাজস্ব অথবা অন্যান্য প্রকারের কর দাবি করার অধিকারী হয়ে উঠেছিল। পাঞ্জাবের মতো অন্যান্য অঞ্চলেও বড়ো মাপের জলসেচ যোজনা শুরু করা হয়েছিল এবং এর সাথে সাথে সেখানে জনবসতির চেষ্টা করা হয় এবং সেই সকল কাজেও নিজস্ব জাতির মাত্রা ছিল। এই স্কেলের অন্য প্রান্তে, উপনিবেশিক কালের শেষের দিকে প্রশাসন নিপীড়িত জাতি, যাদের তখনকার সময়ে 'অবদমিত শ্রেণি' বলা হত, তাদের কল্যাণেও মনোযোগী হয়। এই প্রচেষ্টার অন্তর্গত 1935 সালে ভারত সরকার অধিনিয়ম আইন গৃহীত হয় যেখানে রাষ্ট্রের দ্বারা বিশেষ আচরণ/ব্যবস্থার জন্য নির্ধারিত জাতি এবং উপজাতিগুলির তালিকা বা 'তপশিল'কে বৈধ মান্যতা প্রদান করা হয়। এইভাবেই 'তপশিলি উপজাতি' এবং 'তপশিলি জাতি' শব্দের উৎপত্তি হয়। ক্রমোচ্চ শ্রেণি বিন্যাসে যে জাতিগুলি সব থেকে নিচে অবস্থিত ছিল, যারা তীব্র বৈষম্যের শিকার ছিল এবং যাদের 'অস্পৃশ্য' জাতি বলা হত, তাদের তপশিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। (তোমরা পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিত অস্পৃশ্যতা এবং সেটার বিরুদ্ধে সংঘর্ষ সম্পর্কে আরও পড়বে)।

এইভাবে, উপনিবেশবাদ জাতির প্রতিষ্ঠানে অনেক মুখ্য পরিবর্তন নিয়ে আসে। সম্ভবত এটা বলা সঠিক হবে যে উপনিবেশিককালে জাতি প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়। পুঁজিবাদ এবং আধুনিকতার বিস্তারের জন্য শুধুমাত্র ভারতেই নয়, সমগ্র বিশ্বেই ওই সময়ে বিপুল পরিবর্তন হচ্ছিল।

জাতির বর্তমান রূপ

1947 সালে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি একটি অনেক বড়ো ঘটনা ছিল কিন্তু চরমভাবে সেটা ছিল উপনিবেশিক অতীত থেকে আংশিক মাত্র অব্যাহতি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ব্যাপক জনমত একত্রিত করার জন্যও জাতি একটি অনিবার্য বিবেচনার বিষয় হিসাবে ভূমিকা পালন করে। 'অবদমিত শ্রেণি' এবং বিশেষ করে অস্পৃশ্য জাতিগুলিকে

একত্রিত করার প্রচেষ্টা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রারম্ভেই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই উদ্যোগ জাতি স্পেক্ট্রাম (caste spectrum) এর উভয় প্রান্ত থেকেই শুরু হয়েছিল --- উঁচু জাতির প্রগতিশীল সংস্কারক দ্বারা এবং পাশাপাশি নীচু জাতির সদস্য দ্বারা যেমন পশ্চিম ভারতে মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে ও বাবা সাহেব আম্বেদকর এবং দক্ষিণ ভারতে আয়ানকালি, শ্রীনারায়ণ গুরু, ইয়োতিদাস ও পেরিয়ার (ই ভি রামাস্বামী নায়কর) এই দিশা দেখানো হয়। মহাত্মা গান্ধি এবং বাবাসাহেব আম্বেদকর উভয়ই 1920-এর দশক থেকেই অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করতে শুরু করেছিলেন। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কার্যক্রম কংগ্রেস-এর কর্মসুচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে যেখানে স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সকল পর্যায়ে একটি বড়ো চুক্তি হয়েছিল যাতে জাতি ভেদাভেদ নির্মূল করে দেওয়া হবে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ ছিল জাতিকে 'সামাজিক অপশক্তি' হিসাবে এবং পবিত্র ভারতীয়দের মাঝে একটি উপনিবেশিক চাল হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদী নেতাগণ, যাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধি মুখ্য ছিলেন, নিম্ন জাতির উন্নতির জন্য অস্পৃশ্যতা এবং অন্যান্য জাতি-সীমাবদ্ধতা দূর করার পক্ষে সমর্থন পাওয়ার জন্য যত্নবান ছিলেন এবং সেই সঙ্গে জাতির ভূ-স্বামীদেরও এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাদের স্বার্থের কথাও চিন্তা করা হবে।

শ্রী নারায়ণ গুরু
(1856-1928)

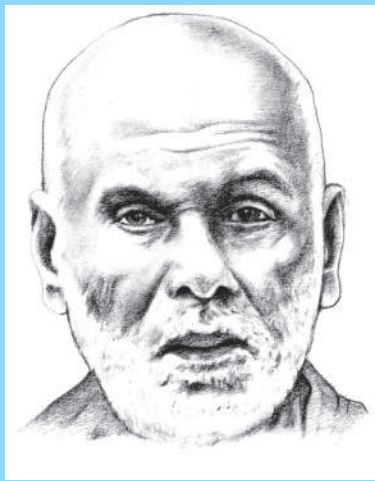

শ্রী নারায়ণ গুরু কেরালায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সকলকে ভ্রাতৃত্ববোধের উপদেশ দিয়েছিলেন এবং জাতির কু-প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তিনি একটি শান্তিপূর্ণ কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং এই নীতি বাক্যটি দিয়েছিলেন — 'সবার জন্য এক জাতি, এক ধর্ম, এক ঈশ্বর'।

স্বাধীনোত্তর ভারতীয় রাষ্ট্রে এই ধরনের অসঙ্গতি উত্তরাধিকারসূত্রে এসেছিল এবং প্রতিফলিত হয়েছিল। একদিকে রাষ্ট্র জাতিপ্রথা নির্মূল করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল এবং ভারতীয় সংবিধানেও সেটার স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছিল। অন্যদিকে, আবার রাষ্ট্র এই আমূল সংস্কারে অসমর্থ এবং অনিচ্ছুক ছিল যেখানে জাতি বৈষম্যের কারণে অর্থনৈতিক ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্য এক স্তরে, রাষ্ট্র এটা মনে করেছিল যে যদি সেটা জাতি প্রথার প্রতি চোখ বন্ধ করে কাজ করে, তাহলে সেটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাতি ভিত্তিক বিশেষাধিকারকে দুর্বল করে দেবে এবং এই প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে নির্মূল হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, সরকারি চাকরিতে নিযুক্তির ক্ষেত্রে জাতির কোনো ভূমিকা ছিল না এবং উচ্চশিক্ষিত উঁচু শ্রেণি এবং স্বল্প শিক্ষিত অথবা প্রায় অশিক্ষিত জাতিগুলিকে "সমান" শর্তে প্রতিযোগিতা করতে হত। এটার একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল, কিছু পদ তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত থাকত। অন্যভাবে বলতে গেলে, স্বাধীনতার পরবর্তী তাৎক্ষণিক কিছু দশক পর্যন্ত, রাষ্ট্র এই ব্যাপারে মোকাবেলা করার প্রয়াস/প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি যেখানে উঁচু জাতি এবং নিচু জাতি শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অসমান।

রাষ্ট্রের বিকাশ সম্বন্ধীয় কার্যকলাপ এবং ব্যক্তিগত শিল্পের বৃদ্ধি, আর্থিক পরিবর্তনে তীব্রতা এবং দ্রুত গতিশীলতার মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষভাবে জাতি প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে। আধুনিক শিল্প যেসব ধরনের নতুন নতুন রোজগারের সুবিধা প্রদান করেছিল সেখানে কোনো জাতি আধিপত্য ছিল না। নগনরায়ণ পদ্ধতি এবং শহরে যৌথভাবে বাঁচার পরিস্থিতি জাতি পৃথকীকৃত সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ধরনকে অধিক সময় পর্যন্ত চলতে দেয়নি। অন্যস্তরে, আধুনিক শিক্ষিত ভারতীয়রা

ব্যক্তিত্ববাদের উদার নীতি এবং গণতন্ত্রের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল, যার ফলে তারা অত্যধিক চূড়ান্ত জাতি প্রথাগুলিকে বর্জন করতে শুরু করেছিল। অন্যদিকে, এটাও উল্লেখযোগ্য ছিল যে জাতিপ্রথা কতখানি স্থিতিস্থাপক সেটা প্রমাণিত হয়েছিল। শিল্প জগতে চাকরির নিয়োগ, সেটা মুম্বাই-এর টেক্সাইটল মিলেই হোক (তখনকার বোম্বাই) অথবা কলকাতার জুটমিলেই হোক (তখনকার ক্যালকাটা), অথবা অন্য কোথাও, সেটা জাতি এবং আত্মীয়তার ভিত্তিতেই করা হত। যে দালাল কারখানা বা মিলের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করত, সে তার নিজের এলাকার এবং জাতির লোকদেরই নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিত, যার ফলে নির্দিষ্ট বিভাগ অথবা কারখানাতে প্রায়শই নির্দিষ্ট একটি জাতির লোকেরই প্রাধান্য দেখা যেত। অস্পৃশ্যদের বিপক্ষে পক্ষপাত খুব বেশি ছিল এবং শহরেও সেটার অভাব ছিল না, যদিও সেটা গ্রামের মতো এত উগ্র ছিল না।

এটা কোনো আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয় যে জাতি সাংস্কৃতিক এবং পরিবারিক পরিমণ্ডলেই সব থেকে বেশি শক্তিশালী প্রমাণিত হয়েছে। অন্তর্বিবাহ বা নিজের জাতির মধ্যে বিবাহের রীতি আধুনিকতা এবং পরিবর্তনের ফলেও মূলত অপ্রভাবিত রয়ে গেছে। আজকের দিনেও, অধিকাংশ বিবাহ নিজের জাতির মধ্যেই হয়ে থাকে, যদিও জাতিবহির্ভূত বিবাহও আগের তুলনায় অনেক বেশি হচ্ছে। কিছু গণ্ডি বা সীমা আজকাল নমনীয় হয়ে গেছে অথবা তার মধ্যে অনেক ফাঁক হয়ে গেছে, কিন্তু সমান আর্থ-সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন জাতিগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রাখার এখনও যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, উঁচু জাতি (যেমন ব্রাহ্মণ, বানিয়া, রাজপুত)দের মধ্যে জাতি বহির্ভূত বিবাহ সম্ভবতঃ আগের তুলনায় অনেক বেশি হচ্ছে; কিন্তু উঁচু জাতি এবং পিছিয়ে পড়া জাতি অথবা তপশিলি জাতির মধ্যে বিবাহ আজও অস্বাভাবিক বা বিরল। খাবার ভাগা-ভাগির নিয়মের ব্যাপারেও পরিস্থিতি মোটামুটি একইরকম আছে।

সম্ভবত, পরিবর্তনের সব থেকে ঘটনাবহুল এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল রাজনীতির ক্ষেত্র। স্বাধীন ভারতের সূচনা থেকেই, গণতান্ত্রিক রাজনীতি গভীরভাবে জাতি শর্তাধীন বা জাতির শর্তে আধারিত। যদিও এই ভিত্তিতে কাজ করা জটিল থেকে আরও জটিল হচ্ছে এবং সেটার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু বলা অনেক কঠিন, তবুও এটা অস্বীকার করা যায় না যে জাতি নির্বাচনি রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে। 1980 র দশক থেকে আমরা স্পষ্টভাবে জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ হতে দেখেছি। প্রাথমিক সাধারণ নির্বাচনে, এটা মনে হয়েছিল যে জাতি সংহতি নির্বাচন জয়ের নির্ণায়ক ছিল। কিন্তু সেটার কিছু পরেই পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে গেছে কেন না ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় স্তরে ভোট আদায় করার জন্য একই ধরনের জাতি-ভিত্তিক পদ্ধতির প্রয়োগ করে এবং নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় সামিল হয়।

পরিবর্তনের এই পদ্ধতিগুলিকে বোঝার জন্য এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য সমাজতত্ত্ববিদগণ এবং সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ্গণ অনেক নতুন নতুন ধারণার উদ্ভাবন করেন। সেগুলোর মধ্যে সব থেকে প্রচলিত সম্ভবত — 'সংস্কৃতায়ন' এবং 'প্রভাবশালী জাতি' ; এই উভয় ধারণাই এম. এন. শ্রীনিবাসের অবদান কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতগণ এগুলোর গভীর চর্চা ও সমালোচনা করেছিলেন।

'সংস্কৃতায়ন' এমন একটি পদ্ধতির নাম যেখানে একটি জাতির (সাধারণত মধ্য বা নিম্ন জাতির) সদস্যরা অন্য একটি উঁচু জাতির (বা জাতিগুলির) ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, পারিবারিক এবং সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণ করে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা উন্নত করার চেষ্টা করে। যদিও এই ঘটনা পুরোনো এবং স্বাধীনতার পূর্বে এমনকি উপনিবেশিক কালেরও আগে থেকে সেটা গ্রহণ করা হত, কিন্তু বর্তমান সময়েই এটার অনেক বেশি প্রচার হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে সাধারণত ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় জাতির রীতিনীতি এবং আচার অনুষ্ঠানগুলোকে অনুকরণ করা হয়, যেমন নিরামিষভোজী হয়ে যাওয়া, পৈতা ধারণ করা, কিছু নির্দিষ্ট ধরনের প্রার্থনা করা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা ইত্যাদি। সংস্কৃতায়ন পদ্ধতি সাধারণত সম্পর্কিত জাতির অর্থনৈতিক মর্যাদার উন্নতির পশ্চাতে বা তার সাথে সাথে হয়ে থাকে, যদিও সেটা স্বতন্ত্রভাবেও করা যেতে পারে। পরবর্তী গবেষণামতে এই পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং এই ধারণার সংশোধন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে এই যুক্তি রয়েছে যে সংস্কৃতায়ন পূর্বের

নিষিদ্ধ রীতিনীতি/সামাজিক অনুষ্ঠানের (যেমন নীচু জাতির লোকের পৈতা ধারণ করা চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধ) একটি প্রতিবাদী দাবি হতে পারে নাকি 'নীচু' জাতি দ্বারা 'উঁচু' জাতির চাটুকারিতাপূর্ণ অনুকরণ।

'প্রভাবশালী জাতি' শব্দটির ব্যবহার এইসব জাতিদের বোঝানোর জন্য করা হয় যাদের জনসংখ্যা অনেক বেশি এবং স্বাধীনতার পরে করা আংশিক ভূমি সংস্কারের দ্বারা ভূমির অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এই ভূমি সংস্কারের দ্বারা পূর্বের দাবিদারদের কাছ থেকে জমি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, যারা উঁচু জাতির সদস্য ছিল এবং এই অর্থে 'অনুপস্থিত ভূ-স্বামী' অর্থাৎ নিজেদের খাজনা আদায় করা ছাড়া কৃষি অর্থনীতিতে যাদের কোনো অবদান ছিল না। তারা বেশিরভাগ সময় গ্রামে বসবাসও করত না, কোনো শহর বা নগরে বসবাস করত। তাই এই ভূমি অধিকারের দাবিদার হিসাবে পরবর্তী স্তরের যারা কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত কিন্তু নিজেরা কৃষিকাজ করত না তাদের কায়েম করা হয়েছে। এই মধ্যবর্তী জাতিরা আবার কাজের জন্য নিচু জাতির লোক বিশেষ করে 'অস্পৃশ্য'দের উপর নির্ভর করত তাদের জমি চাষ এবং পরিচর্যা করার জন্য। তাসত্ত্বেও একবার ভূমির অধিকার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা যথেষ্ট আর্থিক ক্ষমতা অর্জন করে নেয়। তাছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার জন্য সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের উপর ভিত্তি করে নির্বাচনি গণতন্ত্রের যুগে তাদের রাজনৈতিক শক্তি প্রদান করা হয়। এইভাবে, এই মধ্যবর্তী জাতিগুলি গ্রামাঞ্চলে 'প্রভাবশালী' জাতি হয়ে ওঠে এবং আঞ্চলিক রাজনীতি ও কৃষি অর্থনীতিতে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। এই ধরনের প্রভাবশালী জাতির উদাহরণের মধ্যে রয়েছে বিহার এবং উত্তর প্রদেশের যাদব, কর্ণাটকের ওক্কালিগা, অন্ধ্রপ্রদেশের রেড্ডি এবং খাম্মা, মহারাষ্ট্রের মারাঠা, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের জাঠ এবং গুজরাটের পাতিদার।

এম. এন. শ্রীনিবাস
(1916-1999)

ময়শূর নরসিমাচার শ্রীনিবাস ভারতের একজন অগ্রণী সমাজতত্ত্ববিদ এবং সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ ছিলেন। জাতি ব্যবস্থার উপর করা কাজ এবং 'সংস্কৃতায়ন' এবং 'প্রভাবশালী জাতি'র মতো ধারণা প্রণয়নের জন্য উনি সুপরিচিত ছিলেন। উনার 'The Remembered Village' বইটি সামাজিক নৃতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচিত একটি গ্রাম অধ্যয়ন।

সমসাময়িক সময়ে জাতিপ্রথায় হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ আপাতবিরোধী পরিবর্তনের মধ্যে একটি পরিবর্তন হচ্ছে যে এখন জাতিপ্রথা উঁচু জাতি, শহরের উঁচু এবং মধ্যবর্তী শ্রেণির মধ্যে 'অদৃশ্য' হয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনোত্তরকালের বিকাশশীল নীতির দ্বারা সর্বাধিক লাভান্বিত হওয়া এই গোষ্ঠীগুলির কাছে জাতির গুরুত্ব সত্যিকার অর্থে কমে গেছে কারণ তারা তাদের কাছ থেকে ভালোভাবেই আদায় করে নিয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলির জাতি মর্যাদা এটা নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে এই গোষ্ঠীগুলির কাছে দ্রুত উন্নয়নের সুযোগগুলির পূর্ণ সুবিধা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত সম্পদ ছিল। নির্দিষ্টভাবে উঁচু জাতির অভিজাত ব্যক্তিরা ভতুর্কিপ্রাপ্ত সর্বজননীন শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পেরেছিল, বিশেষত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং পরিচালনা (management) এর মতো পেশাদারি শিক্ষায়। একইসঙ্গে তারা স্বাধীনতার পরের দশকগুলোতে রাষ্ট্রীয় শাখায় বৃদ্ধি পাওয়া চাকরির সুবিধা গ্রহণ করতেও সক্ষম ছিল। এই ভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে, সমাজের বাকি অংশের তুলনায় তাদের নেতৃত্ব (শিক্ষার দিক দিয়ে) নিশ্চিত করেছিল যে তাদের কোনো ধরনের গুরুতর প্রতিযোগিতার সামনা করতে হত না। যখন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্মে তাদের বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত মর্যাদা আরও সুদৃঢ় হয়েছে, তখন এই গোষ্ঠীগুলির এটা বিশ্বাস হতে শুরু হয়েছিল যে তাদের উন্নতির সঙ্গে জাতির কোনো

বিশেষ সম্পর্ক নেই। অবশ্যই এই গোষ্ঠীর তৃতীয় প্রজন্মের কাছে তাদের অর্থনৈতিক এবং শিক্ষার পুঁজি একাই এটা সুনিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট পর্যাপ্ত ছিল যে তারা জীবনে সর্বোত্তম সুযোগ পেতেই থাকবে। এই গোষ্ঠীর কাছে এখন, সর্বজনীন জীবনে জাতির কোনো ভূমিকা নেই বলেই মনে হয় এবং সেটা শুধুমাত্র ধর্মীয় রীতিনীতি বা বিবাহ এবং আত্মীয়তার মতো ব্যক্তিগত বৃত্তেই সীমাবদ্ধ। তা সত্ত্বেও, এটি একটি ভিন্নতর গোষ্ঠী— এই তথ্য আরও অধিকতর জটিলতার সৃষ্টি করে। যদিও বিশেষ সুযোগ সুবিধার সিংহভাগ অপ্রতিরোধ্যভাবে এই গোষ্ঠীর ব্যক্তিরাই উপভোগ করে, কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু গরিবও আছে যারা এই সুবিধা পায় না।

তথাকথিত তপশিলভুক্ত /অনুসূচিত জাতি ও উপজাতি এবং পিছিয়ে-পড়া জাতির ক্ষেত্রে — উপরিউক্ত ঘটনার বিপরীত ঘটেছে। তাদের জন্য জাতি আরও অধিক দৃশ্যমান হয়ে গেছে, প্রকৃতপক্ষে জাতি তাদের পরিচয়ের অন্যান্য মাত্রাগুলিকে গ্রাস করে নিয়েছে। উত্তরাধিকারসূত্রে তাদের কোনো শৈক্ষিক এবং সামাজিক পুঁজি বা মূলধন না থাকায় তাদেরকে ইতোমধ্যে সংস্থাপিত উঁচু জাতির সদস্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হচ্ছে এবং এটার জন্য তারা তাদের জাতির পরিচিতিও ছাড়তে পারে না যেহেতু এটাই তাদের অল্পকিছু যৌথ সম্পদের একটি। তাছাড়া, তারা এখনও অনেক ধরনের বৈষম্যের শিকার। রাজনৈতিক চাপের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের কিছু প্রতিরক্ষামূলক বৈষম্য এবং সংরক্ষণ নীতিগুলিই তাদের বেঁচে থাকার উপায়। কিন্তু বেঁচে থাকার এই উপায়গুলির ব্যবহারই এই জাতিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতি হিসাবে গঠন করতে থাকে এবং সাধারণত এটাই তাদের পরিচয়ের একমাত্র দৃষ্টিকোণ যেটাকে বিশ্বে মান্যতা দেওয়া হয়।

এই ধরনের জাতিবিহীন উঁচু জাতির গোষ্ঠী এবং প্রত্যক্ষভাবে জাতি সংজ্ঞায়িত নীচু জাতির গোষ্ঠী — উভয়ের পাশাপাশি অবস্থানই আজকের জাতি প্রতিষ্ঠানের একটি মুখ্য বিষয়।

3.2 উপজাতি সম্প্রদায়

'উপজাতি' একটি আধুনিক শব্দ যা এই ধরনের সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োগ করা হয় যারা অনেক প্রাচীন এবং উপ-মহাদেশের সব থেকে প্রাচীনতম অধিবাসীদের অন্যতম। ভারতে উপজাতিদের সাধারণত নেতিবাচক শব্দে অর্থাৎ তাদের কী ছিল না সেটার ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়। উপজাতিরা এমন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা কোনো লিখিত ধর্মগ্রন্থের মতানুসারে ধর্ম পালন করত না; তাদের কোনো সাধারণ রাষ্ট্র অথবা রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না; কোনো তীব্র শ্রেণি বিভাজন ছিল না এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, তাদের মধ্যে কোনো জাতি ব্যবস্থা ছিল না এবং তারা কেউই হিন্দুও ছিল না আবার কৃষকও ছিল না। 'উপজাতি' শব্দের সূচনা উপনিবেশিক কালে হয়েছিল। অনেকাংশে বিভাজিত দলের সম্প্রদায়গুলির জন্য একটি মাত্র শব্দ প্রয়োগ মূলত প্রশাসনিক সুবিধার জন্য করা হয়েছিল।

উপজাতি সমাজের শ্রেণিবিভাজন

ইতিবাচক বিশিষ্টতার পরিপ্রেক্ষিতে, উপজাতিদের শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে তাদের 'স্থায়ী' এবং 'অস্থায়ী' বৈশিষ্ট্য অনুসারে। স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত হল অঞ্চল, ভাষা, শারীরিক বিশিষ্টতা এবং পরিবেশগত বাসস্থান।

স্থায়ী বৈশিষ্ট্য

ভারতের উপজাতি জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে ছড়ানো ছিটানো, কিন্তু কোনো কোনো অঞ্চলে তাদের ঘনবসতি দেখা যায়। আনুমানিক 85% উপজাতীয় জনসংখ্যা 'মধ্যভারতে' বসবাস করে, যা পশ্চিমে গুজরাট এবং রাজস্থান থেকে

শুরু করে পূর্বে পশ্চিমবাংলা এবং উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় ছবং মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশ এই অঞ্চলের 'হৃদয়-স্থল'। উপজাতি সম্প্রদায়ের বাকি 15% এর মধ্যে 11%-র বেশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে এবং 3%-এর কিছু বেশি ভারতের বাকি অংশে বসবাস করে। যদি আমরা রাজ্যগুলির জনসংখ্যার উপজাতি অংশের উপর দৃষ্টিপাত করি তাহলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে তাদের সর্বোচ্চ ঘনবসতি দেখা যায়; সেখানে আসামকে বাদ দিয়ে অন্যান্য রাজ্যে তাদের ঘনত্ব 30 শতাংশের বেশি এবং অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, মিজোরাম ও নাগাল্যান্ডের মতো কিছু রাজ্যে উপজাতি জনসংখ্যা 60 শতাংশ থেকে 95 শতাংশ পর্যন্ত। দেশের বাকি অংশে (মধ্য উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ ছাড়া) উপজাতি জনসংখ্যা 12 শতাংশেরও কম। তাদের পরিবেশগত বাসস্থানের মধ্যে সাধারণত পাহাড়, বন-জঙ্গাল, গ্রামীণ সমতল অঞ্চল এবং শহরের শিল্প এলাকাগুলি অন্তর্ভুক্ত।

ভাষাগত দৃষ্টিতে, উপজাতিদের চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুটি, ভারতীয় - আর্য এবং দ্রাবিড় ভাষা যা অন্যান্য ভারতীয়দের মধ্যেও প্রচলিত এবং উপজাতিদের মধ্যে শুধুমাত্র এক শতাংশের কাছাকাছি লোক ভারতীয় আর্য এবং তিন শতাংশের মতো লোক দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলে। অন্য দুটি ভাষা- অস্ট্রিক এবং তিব্বতী বার্মিজ প্রাথমিকভাবে উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত, যার মধ্যে অস্ট্রিক ভাষা সমস্ত উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং তিববতী-বার্মিজ ভাষা মোটামুটি 80 শতাংশের বেশি উপজাতিদের মধ্যে বলা হয়ে থাকে। শারীরিক-জাতিগত দৃষ্টিতে, উপজাতিদের নিগ্রো, অস্ট্রালয়েড, মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড় এবং আর্য এই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। ভারতের অন্যান্য জাতিও দ্রাবিড় এবং আর্য শ্রেণির অন্তর্গত।

জনসংখ্যার আকারের ভিত্তিতে, উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বিভিন্নতা দেখা যায়, সব থেকে বড়ো উপজাতি জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা মোটামুটি সাত (7) মিলিয়ন যেখানে সব থেকে ছোটো উপজাতি জনগোষ্ঠী যেমন আন্দামান দ্বীপবাসীদের জনসংখ্যা 100 জন থেকেও কম। সব থেকে বড়ো উপজাতি সম্প্রদায় গন্ড, ভিল, সাঁওতাল, ওঁরাও, মিনা, বরো এবং মুন্ডা যাদের প্রত্যেকের জনসংখ্যা কমপক্ষেও এক মিলিয়ন। 2001 সালের জনগণনা অনুসারে ভারতের সম্পূর্ণ জনসংখ্যার মোটামুটি 8.2 শতাংশ বা 84 মিলিয়ন জনসংখ্যা উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। 2011 সালের জনগণনা অনুসারে ভারতীয় জনসংখ্যার 8.6 শতাংশ বা মোটামুচি 104 মিলিয়ন জনসংখ্যা উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

অর্জিত বৈশিষ্ট্য

অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে করা শ্রেণিবিভাজনের দুটি প্রধান মানদণ্ড সাধারণত — জীবনধারণের ধরন এবং হিন্দু সমাজে তাদের অন্তর্ভুক্তির সীমা — অথবা উভয়ের সমন্বয়।

জীবনধারণের ধরনের ভিত্তিতে, উপজাতিদের জেলে, খাদ্য সংগ্রহকারী এবং শিকারি, জুম-চাষি, কৃষক এবং বাগান ও শিল্পকর্মীর শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। শিক্ষামূলক সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি এবং সর্বজননীন বিষয়ে বিভক্তিকরণের প্রধান মাদণ্ড হল হিন্দু সমাজে তাদের আত্তীকরণের মাত্রা (degree of assimilation)। আত্তীকরণ প্রক্রিয়াকে উপজাতি দৃষ্টিকোণ থেকে অথবা (যেমন সবসময় হয়ে থাকে) মূল ধারার প্রভাবশালী হিন্দু দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। উপজাতি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আত্তীকরণের মাত্রা ছাড়াও, হিন্দু সমাজের প্রতি ধারণাও বিভাজনের একটি মাণদণ্ড, কেননা উপজাতিদের ধারণার মধ্যেও পার্থক্য আছে — কিছু উপজাতি হিন্দু ধর্মের প্রতি ইতিবাচকভাবে অনুরক্ত আবার কিছু উপজাতি সেটার প্রতিরোধ বা বিরোধিতা করে। মূল ধারার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, উপজাতিদের হিন্দু সমাজে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে সেটার ভিত্তিতেও দেখা যেতে পারে, যেখানে কিছু উপজাতিদের উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে আবার অধিকাংশকে সাধারণত নীচু মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে।

উপজাতি — একটি ধারণার জীবনী

1960-এর দশকে পণ্ডিতদের মধ্যে এই প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক উঠেছিল যে উপজাতিরা কি জাতিভিত্তিক (হিন্দু) কৃষক সমাজের একটি প্রান্তের বিস্তার নাকি তারা সম্পূর্ণভাবে এক ভিন্ন ধরনের সম্প্রদায়। যে পণ্ডিতগণ বিস্তারের স্বপক্ষে ছিলেন তারা দেখিয়েছিলেন যে উপজাতিরা মৌলিক দিক দিয়ে জাতিভিত্তিক কৃষক সমাজ থেকে ভিন্ন নয়, কিন্তু তারা খুব কম স্তরীকৃত (শ্রেণি বিভাজনের স্তর অনেক কম) এবং সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে তারা ব্যক্তিগত ধারণার উপর কম নির্ভরশীল ও বেশি সম্প্রদায় ভিত্তিক । যাইহোক, বিরোধীপক্ষের যুক্তি ছিল যে উপজাতিরা পুরোপুরি জাতি থেকে ভিন্ন কারণ তাদের মধ্যে পবিত্রতা এবং অপবিত্রতার কোনো ভাবনা নেই যা জাতি ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু।

একটি উপজাতিভিত্তিক গ্রাম্যমেলা

সংক্ষেপে, উপজাতি – জাতির পার্থক্যের যুক্তি পবিত্রতা ও অপবিত্রতা এবং ক্রমোচ্চ / পর্যায়ক্রমিক একাত্মতায় বিশ্বাসী হিন্দুজাতি এবং অপেক্ষাকৃত অধিক সমতাবাদী এবং আত্মীয়তা ভিত্তিক সামাজিক সংগঠনের রীতিযুক্ত 'জীববাদী' (animist) উপজাতিদের মধ্যে গৃহীত সাংস্কৃতিক পার্থক্যের উপর আধারিত।

1970 এর দশকে উপজাতির সকল প্রধান সংজ্ঞাগুলিকে ত্রুটিপূর্ণ দেখানো হয়েছিল। এটাতে দেখানো হয়েছিল যে উপজাতি-কৃষক পার্থক্য সাধারণভাবে উন্নত মানদণ্ড যেমন, আকার, বিচ্ছিন্নতা, ধর্ম এবং জীবনধারণের উপায়— এগুলোর মধ্যে কোনো মানদণ্ডেই করা যায় না। কিছু ভারতীয় 'উপজাতি' যেমন সাঁওতাল, গন্ড এবং ভিল আকারে অনেক বড়ো এবং অনেক বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে আছে। আবার কিছু উপজাতি যেমন মুন্ডা, হো এবং আরও অন্যান্যরা দীর্ঘদিন থেকে এক জায়গায় বসতি স্থাপন করে স্থায়ী কৃষিকাজ করতে শুরু করেছিল এবং এমনকি বিহারের বিরহর (Birhors) এর মতো শিকারি সংগ্রাহক উপজাতিরা পর্যন্ত একধরনের বিশেষ ঘর বানিয়ে নিয়েছিল যেখানে তারা ঝুড়ি বানানো, তেল বের করার মতো অন্যান্য কাজ করত। অন্য কিছু ক্ষেত্রে এটাও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে অন্য বিকল্পের অভাবে 'জাতি' (অথবা অ-উপজাতি)র লোকেরা শিকার এবং সংগ্রহ করার পেশা গ্রহণ করে নিয়েছিল।

জাতি এবং উপজাতির পার্থক্যের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রক্রিয়াগুলির বিষয়ে অনেক বড়ো একটি সাহিত্য তৈরি করা হয়েছিল যার মাধ্যমে বিভিন্ন যুগে উপজাতিদের হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল— এই প্রক্রিয়াগুলি ছিল সংস্কৃতায়ন, সবর্ণ হিন্দুদের দ্বারা বিজয়ের পরে বিজেতাদের শূদ্রবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করা, সাংস্কৃতিক অভিযোজন (acculturation) এবং আরও অন্যান্য। ভারতীয় ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিস্তারে এটা প্রায়শই দেখা যায় যে বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়কে হিন্দু সমাজের পর্যায়ক্রমের বিভিন্ন স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেহেতু তাদের জমিতে জনবসতি গড়ে তোলা হয়েছে এবং বন জঙ্গল কেটে ফেলা হয়েছে। এটাকে হয়তো বা স্বাভাবিক, সমান্তরাল প্রক্রিয়ারূপে দেখা হয়েছে যার দ্বারা সকল গোষ্ঠীকে উপদল (sect) হিসাবে হিন্দু ধর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; অথবা সেটাকে শোষণাত্মক প্রক্রিয়ারূপে দেখা হয়েছে। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রাথমিক মতবাদ অনুসারে মূলধারায় উপজাতিদের অন্তভুক্তিকে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে বেশি জোর দিয়েছিলেন, যেখানে পরবর্তী লেখকরা

অন্তর্ভুক্তিকরণের শোষণাত্মক এবং রাজনৈতিক প্রকৃতির উপর একাগ্র ছিলেন।

কিছু পণ্ডিতদের এটাও ধারণা যে উপজাতিদের "আদিম" (pristine) অর্থাৎ মূল অথবা বিশুদ্ধ সমাজ — যা সভ্যতার সঙ্গে অ-মিশ্রিত ছিল সেটা মনে করার কোনো মুখ্য ভিত্তি নেই। এটার পরিবর্তে তারা প্রস্তাব দিয়েছিল যাতে বাস্তবক্ষেত্রে উপজাতিদের 'গৌণ' ঘটনা হিসাবে মানা হয় যা আগে থেকে বিদ্যমান রাষ্ট্র এং রাষ্ট্রবিহীন উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে শোষণাত্মক এবং উপনিবেশিক সম্পর্কের পরিণামরূপে অস্তিত্বে এসেছিল। এই সংযোগ নিজেই 'উপজাতিবাদ' মূলক চিন্তাধারার জন্ম দেয় — উপজাতি গোষ্ঠী নিজেদেরকে অন্যান্য নতুন অন্তর্ভুক্ত হওয়া সদস্যদের থেকে আলাদা করার জন্য উপজাতি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করতে শুরু করে।

তা সত্ত্বেও এই সাধারণ ধারণা যে উপজাতিরা প্রস্তরযুগের শিকার ও সংগ্রাহক সমাজের যা এখনও সাময়িক পরিবর্তনের বাইরে রয়ে গেছে এবং এখনও বর্তমান, যদিও দীর্ঘ দিন থেকে এর কোনো সত্যতা নেই। শুরু থেকে দেখলে দেখা যায় যে আদিবাসীরা সবসময় নিপীড়িত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না যেমন আজকে আছে — মধ্য ভারতে অনেক গন্ড রাজ্য ছিল যেমন গড় মান্ডলা (Garha Mandla) বা ছান্দা (Chanda)। মধ্য এবং পশ্চিম ভারতের তথাকথিত অনেক রাজপুত রাজ্যগুলি বাস্তবে আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিজস্ব স্তরবিন্যাস পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভুত হয়েছিল। আধিবাসীরা স্থানীয় সৈন্য হওয়ার সুবাদে এবং তাদের আক্রমণ ক্ষমতা দ্বারা সমতল জনগণের উপর প্রায়ই তাদের আধিপত্য বা প্রাধান্য প্রয়োগ করত। সেই সঙ্গে তারা কিছু বিশেষ বিশেষ জিনিসের ব্যবসাও করত যেমন বনজ সম্পদ, লবণ এবং হাতি বিক্রির কাজ। তাছাড়াও, অনেকদিন আগে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা যখন বনজ সম্পদ এবং খনিজ পদার্থকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সস্তা শ্রম নিয়োগের অভিযান চালায়, তখনই সেটা উজাতি সমাজকে মূলধারার সমাজের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

উপজাতিদের প্রতি মূলধারার সম্প্রদায়ের আচরণ ঃ-

যদিও উপনিবেশিক যুগের প্রাথমিক নৃতাত্ত্বিক কার্যে উপজাতিদের বিছিন্ন অসংপৃক্ত সম্পদায় হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু উপনিবেশবাদ আগেই তাদের জগতে অপরিবর্তনীয় পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে, উপজাতি সমাজ ঋণদাতাদের বহিঃআক্রমণের শিকার ছিল। সেই সঙ্গে তারা অ-উপজাতি অভিবাসী (immigrant) যারা এখানে বসতি স্থাপন করেছিল তাদের কাছে নিজেদের জমি হারাচ্ছিল এবং সরকারের বন সংরক্ষণ নীতি এবং খনিজ সম্পদ নিষ্কাশন শুরু হওয়াতে বনজ সম্পদের উপর থেকেও তাদের অধিকার কমে যাচ্ছিল। যেসব এলাকায় জমির ভাড়া অতিরিক্ত আয়ের প্রাথমিক উৎস ছিল, সেইসব এলাকার তুলনায় এই পাহাড়ি এবং জংলি এলাকার বনজ এবং খনিজ পদার্থের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের বিনিয়োগই ছিল উপনিবেশিক সরকারের অধিকাংশ আয়ের মুখ্য উৎস। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপজাতীয় এলাকাগুলিতে অনেক বিদ্রোহের পর, উপনিবেশিক সরকার "বহির্ভূত" (excluded) এবং "আংশিক বহির্ভূত" (partially excluded) এলাকা নির্ধারণ করে দেয় যেখানে অ-উপজাতি জনগণের প্রবেশ পুরোপুরি নিষিদ্ধ অথবা নিয়ন্ত্রিত ছিল। ব্রিটিশ সরকার এইসব এলাকায় স্থানীয় রাজা বা সর্দার-এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসন করার পক্ষপাতী ছিল।

1940 এর দশকের বিচ্ছিন্নতা (isolation) বনাম একীকরণ (integration)-এর উপর বিখ্যাত বিতর্কটি উপজাতি সমাজে একটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী — আদর্শ প্রতিকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিচ্ছিন্নতাবাদী পক্ষের বক্তব্য ছিল যে উপজাতিদের ব্যবসায়ী, ঋণদাতা এবং হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকদের কাছ থেকে সুরক্ষার প্রয়োজন, যারা সকলেই উপজাতিদের আলাদা অস্তিত্ব মিটিয়ে তাদের ভূমিহীন শ্রমিক বানাতে চাইছিল। অপরদিকে, একীকরণবাদী পক্ষের বক্তব্য ছিল যে উপজাতিরা নিছক পিছিয়ে-পড়া হিন্দু এবং তাদের সমস্যার সমাধান একই কাঠামোর মধ্যে খোঁজা উচিত

যা অন্যান্য পিছিয়েপড়া গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত। এই বিরোধীপক্ষ গণপরিষদের বিতর্কে আধিপত্য দেখিয়েছিল, যেখানে অবশেষে সমঝোতার মাধ্যমে এটা স্থির হয়েছিল যে উপজাতিদের কল্যাণের জন্য এমন যোজনা বানানো হোক যাতে তাদের নিয়ন্ত্রিত একীকরণ সম্ভব হয়। উপজাতি উন্নয়নের পরবর্তী প্রকল্পগুলি — পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, উপজাতি উপ পরিকল্পনা, উপজাতি কল্যাণ বিভাগ, বিশেষ বহুমুখী এলাকা প্রকল্প সব কিছুই এই চিন্তাধারার উপর আধারিত ছিল। কিন্তু এখানে বুনিয়াদি/প্রাথমিক সমস্যা হল যে উপজাতি একীকরণে তাদের নিজেদের প্রয়োজনীয়তা বা ইচ্ছার উপেক্ষা করা হয়েছে; একীকরণ মূলধারার সমাজের শর্তাবলীর উপর ও তাদের সুবিধার জন্য করা হয়েছে। উপজাতি সমাজের কাছ থেকে তাদের জায়গা জমি এবং বন সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং উন্নয়নের নামে তাদের সম্প্রদায়কে বিছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন বনাম উপজাতীয় উন্নয়ন

'উন্নয়ন'-এর অপরিহার্যতা উপজাতিদের প্রতি রাষ্ট্রের শাসিত মনোভাবকে এবং রাষ্ট্রের নীতিগুলিকে সুগঠিত করেছিল। রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন, বিশেষ করে নেহেরু যুগে, বড়ো বড়ো বাঁধ বানানো হয়েছিল, কারখানা স্থাপন করা হয়েছিল এবং খনিতে খননকার্য শুরু হয়েছিল। যেহেতু উপজাতীয় এলাকাগুলি দেশের খনিজ সমৃদ্ধ এবং বন আচ্ছাদিত অংশে অবস্থিত ছিল, তাই দেশের অন্যান্য অংশের উন্নয়নের জন্য উপজাতিদের অনুপাতহীন মূল্য দিতে হয়েছিল। এই ধরনের উন্নয়নে উপজাতিদের পরিশ্রমের মূল্যে মূলধারার জনগণই লাভবান হয়েছে। একটি প্রয়োজনীয় উপজাত (by product) হিসাবে উপজাতিদের কাছ থেকে তাদের জমি ছিনিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল যখন খনিজ পদার্থের শোষণ এবং জল বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের জন্য উপযুক্ত জায়গার ব্যবহার শুরু হয়েছিল, যার বেশিরভাগই উপজাতীয় এলাকায় ছিল।

অধিকাংশ উপজাতি সম্প্রদায় বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিল, তাই বনজ সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়াতে তাদের একটি বড়ো আঘাত লাগে। বনজ সম্পদের সুব্যবস্থিত শোষণ ব্রিটিশের সময়কালেই শুরু হয়েছিল এবং এই ধারা স্বাধীনতার পরেও অব্যাহত ছিল। জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানাও উপজাতিদের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছিল কারণ তাদের সম্প্রদায় ভিত্তিক যৌথ মালিকানা এই নতুন পদ্ধতিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এই ধরনের একটি অতি সাম্প্রতিক উদাহরণ হল নর্মদাতে নির্মিত বাঁধ, যেখানে দেখা যায় যে বেশিরভাগ লাভ এবং ক্ষতির ধারা সামঞ্জস্যহীনভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং অঞ্চলে পৌঁছায়।

অনেক উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল এবং রাজ্য উন্নয়নের চাপের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারী সংখ্যার অ-উপজাতি জনগণের অভিবাসনের সমস্যারও সম্মুখীন হয়। এটা উপজাতি সম্প্রদায় এবং সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত এবং বিহ্বল করে, তাছাড়া উপজাতি সম্প্রদায়ের শোষণ প্রক্রিয়াকেও ত্বরান্বিত করে। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় যে ঝাড়খণ্ডের শিল্প এলাকায় উপজাতি জনসংখ্যা কমে গেছে। কিন্তু সব থেকে বেশি নাটকীয় ঘটনা সম্ভবত উত্তর পূর্বাঞ্চলে ঘটেছে। ত্রিপুরার মতো একটি রাজ্যে উপজাতি জনসংখ্যার অনুপাত এক দশকের মধ্যেই অর্ধেক হয়ে গেছে এবং তারা সংখ্যালঘু হয়ে গেছে। অরুণাচল প্রদেশেও এ ধরনের চাপ অনুভব করা হচ্ছে।

বর্তমান সময়ে উপজাতিদের পরিচয় ঃ-

মূলধারার সামাজিক প্রক্রিয়ায় উপজাতিদের জোরপূর্বক অন্তর্ভুক্তির প্রভাব শুধুমাত্র উপজাতি সংস্কৃতি এবং সমাজেই নয়, তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরও সমানভাবে পড়েছিল। বর্তমান সময়ে উপজাতিদের

পরিচয় এই মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা গড়ে ওঠে, উপজাতিদের নিজস্ব আদিম (মূল, প্রাচীন) বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা নয়। যেহেতু মূলধারার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া সাধারণত প্রতিকূলে, তাই বর্তমানে অনেক উপজাতীয় পরিচিতি অ-উপজাতি জগতের দুর্দমনীয় শক্তির প্রতিরোধ ও বিরোধিতার ধারণার উপর কেন্দ্রীভূত হয়।

উপজাতি মহিলাদের বিক্ষোভ

এক দীর্ঘ সংঘর্ষের পরে ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড় পৃথক পৃথক রাজ্যের স্বীকৃতি পেয়েছিল কিন্তু প্রথম থেকে চলতে থাকা সমস্যার কারণে সাফল্যের এই ইতিবাচক প্রভাব পরিমিত হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনেক রাজ্য কয়েক দশক থেকে এই ধরনের বিশেষ আইনের অধীনে চলছে যার ফলে সেখানকার অধিবাসীদের নাগরিক অধিকার সীমিত হয়ে গেছে। তাই, মণিপুর অথবা নাগাল্যান্ডের মতো রাজ্যের অধিবাসীদের ভারতের অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীদের সমান একই অধিকার নেই কারণ ওদের রাজ্যকে 'উপদ্রুত এলাকা' ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমে সশস্ত্র বিদ্রোহ দমনের জন্য রাজ্যের নেওয়া কঠোর পদক্ষেপ যা আবারও বিদ্রোহের জন্ম দেয় এবং বিদ্রোহের এই ভয়ানক চক্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং সমাজের গুরুতর ক্ষতি সাধন করে। দেশের অন্য অংশে, ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড় এখনও তাদের নব-অর্জিত রাজ্যের অধিকারের পূর্ণ ব্যবহার করতে পারেনি এবং সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত বৃহত্তম কাঠামোর স্বায়ত্তশাসিত নয় যেখানে উপজাতিরা শক্তিহীন।

অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন হল উপজাতি সমাজে এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ধীর গতিতে উত্থান। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে এই শ্রেণি সর্বাধিক মাত্রায় দেখা যায়, কিন্তু এখন এই শ্রেণি দেশের অন্যান্য অংশেও দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে বড়ো উপজাতি সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে। সংরক্ষণ নীতির সঙ্গে সংযোজিত হয়ে (যা সম্পর্কে তোমরা পঞ্চম অধ্যায়ে আরও জানতে পারবে) শিক্ষা একটি নগরীয় বৃত্তিমূলক শ্রেণির সৃষ্টি করছে। যেহেতু উপজাতি সমাজ আরও পৃথকীকৃত হচ্ছে অর্থাৎ তাদের নিজেদের মধ্যে শ্রেণি এবং অন্যান্য বিভাজনের ফলে উপজাতি পরিচিতির ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তির বিকাশ ঘটছে।

দুটি বড়ো ধরনের সমস্যা উপজাতি আন্দোলনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই সমস্যাগুলি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পদ যেমন জমি এবং বিশেষত বনজ সম্পদ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে জড়িত এবং নৃজাতি - সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিষয় সম্পর্কিত। এই দুই বিষয় প্রায়ই একসঙ্গে চলে, কিন্তু উপজাতি সমাজের ভিন্নতার কারণে সেটাও কখনও কখনও ভিন্ন হতে পারে। উপজাতি সমাজের মধ্যবিত্তরা তাদের নিজস্ব উপজাতি পরিচয়ের যে দাবি করে সেটার কারণ গরিব এবং অশিক্ষিত উপজাতিদের আন্দোলনে ভাগ নেওয়ার কারণ থেকে আলাদা হতে পারে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো, এই ধরনের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা এবং বাহ্যিক শক্তির সম্পর্কই তাদের ভবিষ্যতকে আকার দেবে।

বাক্স 3.1

উপজাতীয় পরিচয়কে সুরক্ষিত রাখার আগ্রহ দিন দিন বেড়ে চলছে। সেটার কারণ হতে পারে উপজাতি সমাজের মধ্যেই একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব। নির্দিষ্টভাবে এই শ্রেণির উদ্ভবের সঙ্গো সঙ্গো সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জীবনযাত্রা, এমনকি জমি এবং সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং সেই সঙ্গো আধুনিক প্রকল্পের লাভের অংশেও দাবি উপজাতিদের মধ্যে নিজেদের পরিচয়কে সুরক্ষিত রাখার আগ্রহের এক অভিন্ন অংশ হয়ে গেছে। তাই, এখন উপজাতি মধ্যবর্তী শ্রেণির কাছ থেকে এক নতুন চেতনার জাগরণ দেখা যাচ্ছে। এই মধ্যবর্তী শ্রেণি আবার নিজেরাই আধুনিক পেশার ফলস্বরূপ, যারা সরকারের সংরক্ষণ নীতির সহায়তা পেয়েছে ...

(Source: Virginius Xaxa, 'Culture, Politics and Identity: The Case of the Tribes in India', in John et al 2006)

3.3 পরিবার এবং আত্মীয়তা

আমরা সকলেই কোনো না কোনো পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে থাকি এবং আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকরাই অনেক বছর পর্যন্ত পরিবারে কাটাই। সাধারণত আমরা আমাদের পরিবারের প্রতি গভীর আবেগ অনুভব করি। কখনও কখনও আমরা আমাদের বাবা-মা, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, দাদু-দিদা, নিজের ভাই-বোন, কাকা-কাকিমা, মামা-মামি এবং তুতো-ভাইবোনদের প্রতি গভীর ভালোবাসা অনুভব করি, যেখানে অন্যদের সম্পর্কে আমরা সেটা অনুভব করি না। একদিকে, তাদের হস্তক্ষেপের জন্য আমরা অপ্রসন্নতা বা রাগ ব্যক্ত করি এবং তা সত্ত্বেও আমরা যখন তাদের কাছ থেকে দূরে থাকি তখন তাদের এই কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যবহারের অভাব বোধ করি। পরিবার একটি বৃহৎ আন্তরিকতা এবং তত্ত্বাবধানের জায়গা। অন্যদিকে, সেটা আবার তিক্ত দ্বন্দ্ব, অবিচার এবং হিংসার জায়গা। পরিবার এবং আত্মীয়তার একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে কন্যাশিশু হত্যা, সম্পত্তি নিয়ে ভাইদের মধ্যে হিংসাত্মক সংঘাত এবং জঘন্য আইনি বিরোধ, সেই সঙ্গো রয়েছে সমবেদনা, ত্যাগ এবং তত্ত্বাবধানের কাহিনি।

একটি একক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে অথবা সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গো তার সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিবারের গঠন অধ্যয়ন করা যেতে পারে। পরিবারকে একটি একক পরিবার বা সম্প্রসারিত পরিবার হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। পরিবার পুরুষ-নেতৃত্বাধীন অথবা মহিলা-নেতৃত্বাধীন হতে পারে। বংশানুক্রমিকতার দিক দিয়ে সেটা মাতৃকুলভিত্তিক অথবা পিতৃকুলভিত্তিক হতে পারে। পরিবারের এই অভ্যন্তরীণ গঠন সাধারণত সমাজের অন্যান্য গঠন যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদির সঙ্গো জড়িত। এইভাবে হিমালয় অঞ্চলের গ্রামগুলি থেকে পুরুষদের প্রচরণের ফলে অতিরিক্ত মাত্রায় মহিলা নেতৃত্বাধীন পরিবার বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথবা ভারতের সফট্‌ওয়ার শিল্পে কর্মরত তরুণ মাতা পিতার ব্যস্ত কাজের সময়সূচি সেখানে ঠাকুমা-ঠাকুরদা, দাদু-দিদার সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে যেহেতু মাতাপিতার সময়ের অভাবে তাদেরকেই সেখানে এসে বাচ্চার দেখাশোনা করতে হচ্ছে। এইভাবে, পরিবারের গঠন এবং আকৃতির পরিবর্তন হয় এবং এই পরিবর্তনগুলিকে সমাজের অন্যান্য পরিবর্তনের সম্পর্কের সঙ্গোই বোঝা যেতে পারে। পরিবার (ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে) অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এং শিক্ষা বিষয়ক (সর্বজনীন) ক্ষেত্রের সঙ্গো জড়িত।

পরিবার আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের কাছে এটার অস্তিত্ব স্ব-স্বীকৃত । আমরা এটাও মেনে চলি যে অন্যান্য লোকের পরিবারও আমাদের পরিবারের মতোই হবে। (পরিবারের এই মাত্রা এবং অন্যান্য মাত্রা সম্পর্কে একাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক 'সমাজতত্ত্ব পরিচয়' এর তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।) তা সত্ত্বেও আমরা পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন গঠন দেখতে পাই এবং সেটা পরিবর্তনশীল।

কখনও কখনও এই পরিবর্তন ঘটনাচক্রে হয়, যেমন যখন কোনও যুদ্ধ সংঘটিত হয় অথবা মানুষ যখন কাজের খোঁজে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। আবার কখনও কখনও কোনো বিশেষ প্রয়োজনে এই পরিবর্তন করা হয়ে থাকে, যেমন যখন তরুণ প্রজন্ম বয়োজ্যেষ্ঠদের দ্বারা তাদের জীবন-সাথী নির্বাচন করার পরিবর্তে নিজেই সেটার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় অথবা সমাজে যখন সমলিঙ্গের ভালোবাসার খোলাখুলিভাবে প্রকাশ ঘটে।

বাক্স 3.2

এই অধ্যয়ন ... মুলতানি লোহার নামক এক মুসলমান বিরাদরি (সম্প্রদায়) সম্পর্কিত ... কারখানেদার একটি স্থানীয় ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ যার প্রয়োগ একজন ব্যক্তিকে বোঝাতে করা হয় যে উৎপাদন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এবং সে নিজেই সেটার মালিক ... যে কারখানাগুলিকে অধ্যয়ন করা হয়েছে, সেগুলি সাংসারিক পরিস্থিতিতে পরিচালিত হয় এবং এই কারণে সেইসব কারখানেদারদের জীবনের উপর তাদের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে যারা এখানে কাজ করে ... নিম্নলিখিত ঘটনা এটার ব্যাখ্যা দেয়।

40 বছর বয়সের মহমুদ তার দুই ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে থাকত, যাদের একজন বিবাহিত ছিল। মহমুদের তিনটি সন্তান ছিল এবং সে এই মিশ্র পরিবারের কর্তা ছিল। ... তিন ভাইয়ের প্রত্যেকেই বিভিন্ন কারখানা এবং ফ্যাক্টরিতে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করত। মহমুদ এমন একটি মোটর পার্টস এর প্রতিরূপ সফলভাবে গড়েছিল যার আমদানি নিষিদ্ধ ছিল। নিজের এই সফলতায় উৎসাহিত হয়ে মহমুদ নিজেই একটি কারখানা শুরু করেছিল ...। পরবর্তী সময়ে এই মোটর পার্টস বানানোর জন্য দুটো কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্যে একটি কারখানার মলিক বড়ো দুই ভাই এবং অন্য কারখানাটি ছোটো ভাইকে দিয়ে দেওয়া হয় এই শর্তে যাতে সে নিজের পরিবার নিয়ে অন্য একটি বাড়িতে চলে যায়। এভাবে রসিদ, তার স্ত্রী এবং অবিবাহিত সন্তানদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র পরিবার গড়ে ওঠে। একটি মিশ্রিত পরিবার যেখানে তিনজন বিবাহিত ভাই একসঙ্গে ছিল, যা উদ্যোক্তাদের নতুন সুযোগের ফলে একটি ছোটো সাধারণ পরিবারের জন্ম নেয়। **উদ্ধৃত হয়েছে** ঃ-S.M. Akram Rizvi, 'Kinship and Industry among the Muslim Karkhanedars in Delhi', in Imtiaz Ahmad, ed. *Family, Kinship and Marriage among Muslims in India*, New Delhi, Manohar, 1976, pp. 27-48. থেকে।

উপরিউক্তি পরিবর্তনের ধরন থেকে এটা দেখা যায় যে এই পরিবর্তন শুধুমাত্র পরিবারের গঠনকেই পরিবর্তন করেনি, সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক ভাবনা, রীতিনীতি এবং মূল্যবোধেরও পরিবর্তন হয়েছে। যদিও এই ধরনের পরিবর্তন এত সহজে হয় না। ইতিহাস এবং সাম্প্রতিককালের ঘটনাবলি উভয় থেকেই ধারণা করা যায় যে পরিবার এবং বিবাহের রীতিনীতির পরিবর্তন প্রায়ই হিংসাত্মকভাবে প্রতিরোধ করা হয়। এই ব্যাপারে পরিবারেরও অনেক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে। যদিও ভারতে পরিবারে আলোচনা মূলত একক পরিবার এবং সম্প্রসারিত/যৌথ পরিবারের মধ্যেই আবর্তিত হয়ে থাকে।

একক এবং সম্প্রসারিত পরিবার

একটি একক পরিবার শুধুমাত্র বাবা -মা এবং তাদের সন্তানদের নিয়ে গঠিত হয়। একটি সম্প্রসারিত পরিবার (সাধারণত বলা হয় 'যৌথ পরিবার') বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, কিন্তু সেখানে একের বেশি দম্পতি এবং প্রায়ই দুই-এর বেশি প্রজন্ম একসঙ্গে বসবাস করে। সেখানে অনেক ভাই তাদের নিজেদের পরিবার নিয়ে থাকতে পারে, আবার কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ দম্পতি তাদের ছেলেরা ও নাতিরা এবং তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব পরিবারও থাকতে পারে। সম্প্রসারিত পরিবারকে প্রায়শই ভারতীয় লক্ষণ হিসাবে দেখা হয়। তথাপি সম্প্রসারিত পরিবারকে কোনো সময়েই (বর্তমান সময়ে বা আগেকার সময়ে) প্রভাবশালী পরিবারের রূপ হিসাবে মানা হয় না। এটা সম্প্রদায়ের কিছু নির্দিষ্ট শাখায় এবং কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। বাস্তবে, 'Joint Family' শব্দটি যাকে বাংলায় যৌথ পরিবার বা সংযুক্ত পরিবার বলা হয়, সেটা কোনো স্বদেশী শ্রেণিভুক্ত নয়। আই.পি.দেশাই যেমনভবে দেখেছিলেন, 'Joint Family'-র অভিব্যক্তি এই ধরনের কোনো ভারতীয় শব্দের অনুবাদ নয়। এটা আকর্ষণীয়ভাবে লক্ষ করা যায় যে অধিকাংশ ভারতীয় ভাষায় Joint Family বোঝাতে ব্যবহৃত হওয়া শব্দগুলি ইংরেজির 'Joint Family' শব্দের সমতুল্য কোন একটি অনুবাদ।" (দেশাই 1964:40)

পরিবারের বিভিন্ন রূপ ঃ-

অধ্যয়নের সাহায্যে দেখা গেছে যে কীভাবে বিভিন্ন সমাজে পরিবারের বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়। কর্মস্থানের নিয়ম অনুসারে , কিছু সমাজ বিবাহ এবং পারিবারিক প্রথা বা আচারের দিক থেকে মাতৃ-আবাসিক এবং কিছু সমাজ পিতৃ-আবাসিক। প্রথম ক্ষেত্রে, নববিবাহিত দম্পতি স্ত্রীর মাতা-পিতার সঙ্গো বসবাস করে, অন্যদিকে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নববিবাহিত দম্পতি বর বা স্বামীর মাতা-পিতার সঙ্গো বসবাস করে। উত্তরাধিকারের নিয়ম অনুসারে, মাতৃ বংশানুক্রমিক সমাজে সম্পত্তি মায়ের কাছ থেকে মেয়ের কাছে হস্তান্তরিত হয় এবং পিতৃ বংশানুক্রমিক সমাজে সম্পত্তি বাবার কাছ থেকে ছেলের কাছে হস্তান্তরিত হয়। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের গঠনে পুরুষের কর্তৃত্ব এবং আধিপত্য থাকে এবং মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের গঠনে একইভাবে মহিলাদের কর্তৃত্ব এবং আধিপত্য থাকে। যাইহোক, মাতৃতন্ত্র হচ্ছে পিতৃতন্ত্রের বিপরীত — প্রায়োগিক ধারণার পরিবর্তে একটি তাত্ত্বিক ধারণা। মাতৃতন্ত্র অর্থাৎ যে সমাজে মহিলারা প্রভাব বা আধিপত্য অনুশীলন করে — এই ধরনের সমাজের কোনো ঐতিহাসিক বা নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই। যদিও মাতৃ বংশানুক্রমিক সমাজের অস্তিত্ব অবশ্যই পাওয়া যায় অর্থাৎ যে সমাজে মহিলারা উত্তরাধিকারী হিসাবে মায়ের সম্পত্তি পেয়ে থাকে, কিন্তু সেই সম্পত্তির উপর ওদের কোনো অধিকার থাকে না বা সর্বজনীন ক্ষেত্রেও তারা নীতি নির্ধারণ করতে পারে না।

বাক্স 3.3 এ দেওয়া খাসি মাতৃবংশের বিবরণ মাতৃবংশ এবং মাতৃতন্ত্রের মধ্যে পার্থ্যকে স্পষ্ট করে। এই বিবরণ মাতৃবংশানুক্রমিক ব্যবস্থায় উৎপন্ন হওয়া গঠনগত উত্তেজনাকে দেখায় যা সমকালীন খাসি সমাজের পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই প্রভাবিত করে।

খাসি মাতৃ বংশানুক্রমিক পরিবার

বাক্স 3.3

মেঘালয় উত্তরাধিকার আইন (মেঘালয় বিধানসভার সকল পুরুষ সদস্য দ্বারা গৃহীত) কে 1986 সালে রাষ্ট্রপতির স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই উত্তরাধিকার আইন বিশেষত মেঘালয়ের খাসি এবং জয়ন্তিয়া উপজাতিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এতে অনুমোদন দেওয়া হত ' কোন খাসি এবং জয়ন্তিয়া যার বুদ্ধি সবল এবং যে নাবালক নয়, সেই ব্যক্তিকে তার নিজের স্ব-উপার্জিত সম্পত্তি উইল করার'। খাসি সমাজে উইল প্রথার কোনো অস্তিত্ব নেই। খাসি প্রথা অনুযায়ী পূর্বপুরুষের সম্পত্তির হস্তান্তর মাতৃবংশানুক্রমের ভিত্তির উপর করে হয়ে থাকে।

খাসিদের মধ্যে বিশেষ করে শিক্ষিত খাসিদের এটা মনে হয় যে তাদের আত্মীয়তার নিয়ম এবং উত্তরাধিকার মহিলাদের সুবিধার্থে এবং সেটা খুবই সীমিত। এই উত্তরাধিকার আইনকে তাই খাসি ঐতিহ্যে উপলব্ধ মহিলা পক্ষপাতকে সংশোধনের এবং এই ধরনের সীমাবদ্ধতাকে দূর করার একটি প্রচেস্টা হিসাবে দেখা হয়। খাসি ঐতিহ্যের মহিলা পক্ষপাতের জনপ্রিয় উপলব্ধি আসলেই বৈধ কি না, তা মূল্যায়ন করতে খাসি মাতৃবংশানুক্রমিক ব্যবস্থাকে প্রচলিত লিঙ্গ সম্পর্ক এবং লিঙ্গ ভূমিকার সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা প্রয়োজন।

অনেক পন্ডিতগণ মাতৃবংশানুক্রমিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এই ধরনের একটি দ্বন্দ্ব, একদিকে বংশানুক্রমের ধারা ও উত্তরাধিকার এবং অন্যদিকে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের গঠনের দ্বারা উৎপন্ন হয়। প্রথমাবস্থায় যেখানে মা আর মেয়েকে সংযুক্ত করে, পরবর্তী অবস্থার সূচনায় সেখানে মায়ের ভাইয়ের সঙ্গো বোনের ছেলেকে সংযুক্ত করে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। (অন্যভাবে বলতে গেলে, একজন মহিলা উত্তরাধিকার সূত্রে তার মায়ের সম্পত্তি পায় এবং সেটা নিজের মেয়েকে হস্তান্তর করে, যেখানে একজন পুরুষ নিজের বোনের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং সেই অধিকার সে তার বোনের ছেলেকে হস্তান্তরিত করে। এইভাবে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার মায়ের কাছ থেকে মেয়ের কাছে হস্তান্তরিত হয়, কিন্তু সেটা নিয়ন্ত্রণের অধিকার মামার (মায়ের ভাই) কাছ থেকে ভাগ্নের (বোনের ছেলে) কাছে হস্তান্তরিত হয়।)

খাসি মাতৃবংশানুক্রম পুরুষদের জন্য তীব্র ভূমিকা দ্বন্দ্বের সৃষ্টিকরে। তারা একদিকে তাদের জন্মস্থানের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং অন্যদিকে স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি কর্তব্যের মাঝে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিছু মাত্রায়, এই ভূমিকা দ্বন্দ্বের ফলে উৎপন্ন হওয়া চাপ খাসি মহিলাদের উপর আরও গভীর প্রভাব ফেলে। একজন স্ত্রী কখনও এটা সুনিশ্চিত করতে পারে না তার স্বামীর কাছে বোনের বাড়ি বেশি উপযুক্ত মনে হয় নাকি তার নিজের বাড়ি। একইভাবে একজন বোনও আশঙ্কিত থাকে তার নিজের প্রতি (বিবাহিত বোন) তার ভাইয়ের কর্তব্যনিষ্ঠা নিয়ে কারণ যে স্ত্রীর সঙ্গো সে বসবাস করে সে হয়তো তাকে তার জন্মস্থানের (নিজ গৃহ) এবং বিবাহিত বোনের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে ক্রমাগত চেস্টা করতে পারে। খাসি মাতৃবংশানুক্রমিক ব্যবস্থায় উৎপন্ন হওয়া ভূমিকা-দ্বন্দ্বের ফলে পুরুষের তুলনায় মহিলারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে শুধুমাত্র এই কারণেই নয় যে পুরুষরা ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং মহিলারা তা থেকে বঞ্চিত থাকে; এছাড়াও আরও কারণ হচ্ছে এই ব্যবস্থা পুরুষদের প্রতি একটু বেশি ক্ষমাশীল যখন তারা কোনো নিয়মের লঙ্ঘন করে থাকে। খাসি সমাজে মহিলাদের শুধু নামমাত্র অধিকার থাকে; সত্যিকারের অধিকার পুরুষদের হাতে ন্যস্ত। এই ব্যবস্থা যদিও পুরুষদের পিতৃ-আত্মীয়তার তুলনায় মাতৃ-আত্মীয়তার দিকে বেশি পক্ষপাতিত্ব দেখায়। অন্য শব্দে, মাতৃবংশানুক্রম সত্ত্বেও খাসি সমাজে পুরুষরাই ক্ষমতার অধিকারী; শুধু পার্থক্য এটাই যে একজন পুরুষের কাছে তার মায়ের দিকের আত্মীয়রা পিতার দিকের আত্মীয়দের তুলনায় বেশি মহত্ত্বপূর্ণ।

(Source: Adapted from Tiplut Nongbri, 'Gender and the Khasi Family Structure' in Uberoi 1994.)

প্রশ্নাবলি

1. জাতিপ্রথায় পৃথকীকরণ (separation) এবং পর্যায়ক্রম (hierarchy) ধারণাগুলির ভূমিকা কী?
2. জাতিপ্রথা দ্বারা আরোপিত নিয়মনীতিগুলি কী?
3. উপনিবেশবাদ জাতিপ্রথায় কী পরিবর্তন নিয়ে আসে?
4. কোন্ অর্থে নগরীয় উঁচু জাতির কাছে জাতি অপেক্ষাকৃত 'অদৃশ্য' হয়ে গেছে?
5. ভারতে উপজাতিদের শ্রেণিবিভাগ কিভাবে করা হয়েছে?
6. "উপজাতিরা আদিম সম্প্রদায়ভুক্ত যারা সভ্যতা থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে" — এই দৃষ্টিকোণের বিপরীতে তোমরা কী প্রমাণ দিতে পারো?
7. সম্প্রতিকালে উপজাতীয় পরিচিতির জন্য যে দাবি করা হচ্ছে তার কারণ কী?
8. পরিবারের বিভিন্ন ধরনের রূপ কী কী হতে পারে?
9. কী কী উপায়ে সামাজিক গঠনপ্রণালীর পরিবর্তন পরিবারের গঠনকে পরিবর্তিত করতে পারে?
10. মাতৃ বংশানুক্রম এবং মাতৃতন্ত্রের পার্থক্যের ব্যাখ্যা দাও।

REFERENCES

Deshpande, Satish. 2003. *Contemporary India: A Sociological View.* Penguin Books. New Delhi.

Gupta, Dipankar. 2000. *Interrogating Caste.* Penguin Books. New Delhi.

Sharma, K.L. ed. 1999. Social Inequality in India: *Profites of Caste, Class and Social Mobility.* 2nd edition, Rawat Publications. Jaipur.

Sharma, Ursula. 1999. *Caste.* Open University Press. Buckingham & Philadelphia.

Beteille, Andre. 1991. 'The reproduction of inequality: Occupation, caste and family', in *Contributions to Indian Sociology.* N.S., Vol. 25, No.1, pp3-28.

Srinivas, M.N. 1994. *The Dominant Caste and Other Essays.* Oxford University Press. New Delhi.

Dumont, Louis. 1981. *Homo Hierarchicus: The Caste System and its Implications.* 2nd editon, University of Chicago Press. Chicago.

Ghurye, G.S. 1969. *Caste and Race in India.* 5th edition, Popular Prakashan. Mumbai.

John, Mary E., Jha, Pravin Kumar. and Jodhka, Surinder S. ed. 2006. *Contested Transformations: Changing Economies and Identities in Contemporary India.* Tulika. New Delhi.

Dirks, Nicholas. 2001. *Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India.* Princeton University Press. Princeton.

Uberoi, Patricia. ed. 1994. *Family, Kinship and Marriage in India.* Oxford University Press. Delhi.

Xaxa, Virginius. 2003. 'Tribes in India' in Das, Veena. ed. *The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology.* Oxford University Press. Delhi.

চতুর্থ অধ্যায়

বাজার-একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান

আমরা সাধারণত মনে করি যে, বাজার এমন একটি জায়গা যেখানে জিনিসপত্র ক্রয় ও বিক্রয় হয়। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে এই 'বাজার' শব্দটি বলতে বোঝায়, এক বিশেষ বাজার, যেমন, রেলস্টেশনের পাশের বাজার, ফলের বাজার অথবা কোনও পাইকারী বাজার। কখনো কখনো এটি কোনো নির্দিষ্ট স্থান বোঝায় না, কিন্তু এটি নির্দেশ করে, ক্রেতা ও বিক্রেতা- যারা এই বাজারে একত্রিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমাদের গ্রামের বা নগরের আশেপাশে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন দিনে হওয়া সাপ্তাহিক সব্জি বাজার। অন্য অর্থে 'বাজার' শব্দটি নির্দেশ করে ব্যবসা বাণিজ্যের জায়গা বা বিভাগ, যেমন, গাড়ির বাজার, তৈরি পোশাকের বাজার ইত্যাদি। একটি সম্পর্কিত অর্থে বিশেষ কোনো জিনিসের বা পরিষেবার চাহিদা, যেমন, কম্পিউটার প্রফেশনালদের বাজার।

একটি নির্দিষ্ট বাজার স্বাভাবিক ভাবে এই সকল অর্থের উল্লেখ করে যা এই প্রসঙ্গ থেকে সহজেই বোধগম্য হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গা, মানুষের জমায়েত অথবা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রের উল্লেখ ছাড়া, বাজার বলতে কী বোঝায়? এর ব্যবহার নির্দিষ্ট অর্থে উপরে উল্লেখিত সমগ্র অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং প্রতিষ্ঠানকেও বোঝায়। তাই ব্যাপক অর্থে 'বাজার' প্রায়ই অর্থনীতির সমতুল্য। আমরা মনে করতে পারি যে, বাজার একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কিন্তু এই অধ্যায়ে তোমরা দেখবে যে, বাজার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানও বটে। এদিক থেকে, বাজার সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনাযোগ্য যেমন, জাতি, উপজাতি এবং পরিবার যা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

4.1 সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বাজার ও অর্থনীতি ঃ

অর্থশাস্ত্রের অধ্যয়নে এটা পরিলক্ষিত হয় যে, আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় বাজার কীভাবে কাজ করে, যেমন, মূল্য কীভাবে নির্ধারণ হবে, কোনো বিশেষ প্রকার বিনিয়োগের সম্ভাব্য প্রভাব অথবা সেই কারণগুলি যা মানুষকে টাকা পয়সা খরচ করতে বা জমাতে প্রভাবিত করে। তাহলে বাজারের পঠন পাঠনে সমাজতত্ত্বের অবদান কী যা অর্থনীতি থেকে ভিন্ন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ড ও আধুনিক অর্থ ব্যবস্থার শুরুর দিনগুলি সম্পর্কে জানতে হবে, যাকে সেই সময় রাজনৈতিক অর্থনীতি বলা হতো। ঐ সময়ের বিখ্যাত রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ্ অ্যাডম স্মিথ তার বই 'The Wealth of Nations'-এ বাজার অর্থ ব্যবস্থাগুলোকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যা সেই সময় উদীয়মান হয়েছিল। স্মিথের মতে, বাজার অর্থ ব্যবস্থা ব্যক্তির মধ্যে আদান প্রদান বা লেনদেনের একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যশীল এবং স্থির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়াটির সৃষ্টি তখনও হয় যখন কোটি কোটি টাকার লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এই ব্যবস্থাপনা চায় না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার মুনাফা বাড়ানোর চেষ্টা করে এবং এমন করার ফলে সমাজের প্রত্যেকের ভালোই হয়। এই প্রক্রিয়ায় এটা মনে হয় যে, কোন একটি অদৃশ্য শক্তি এই কাজটি করছে যা এক ব্যক্তির মুনাফাকে সমাজের মুনাফায় পরিণত করে।

এই অদৃশ্য শক্তিকে স্মিথ 'অদৃশ্য হাত' নাম দিয়েছেন। এই কারণে স্মিথের মতে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ব্যক্তিগত লাভের সঙ্গে সম্প্রসারিত হয় আর এটি তখনই সবচেয়ে বেশি কাজ করে যখন প্রত্যেক ব্যক্তি যথা ক্রেতা ও বিক্রেতা যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নিতে পারে যাতে তাদের উভয়ের মুনাফা হয়। স্মিথের 'অদৃশ্য হাত' ধারণাটি এই তর্কের রূপে প্রকাশ পায় যে, যদি বাজারে প্রত্যেক ব্যক্তি মুনাফা অনুসারে কাজ করে, তাহলে সবদিকে সমাজের লাভ হয়, কেননা এটা অর্থ ব্যবস্থাকে দৃঢ় এবং অধিক সমৃদ্ধ করে। এই কারণে স্মিথ 'মুক্ত বাজার'-এর সমর্থন করেন, যেটি এমন একটি বাজার, যা রাষ্ট্রীয় বা অন্য কোনো বাঁধা থেকে মুক্ত। এই আর্থিক দার্শনিকতাকে ফরাসি ভাষায় laissez-faire-ও বলা হয়, যার অর্থ বাজারকে 'একলা ছেড়ে দেওয়া' অথবা 'কোনো হস্তক্ষেপ না করা'।

অ্যাডাম স্মিথ এর মতো পন্ডিতদের ধারণার উপর নির্ভর করে আধুনিক অর্থ ব্যবস্থা গড়ে উঠে। এই ধারণায় অর্থব্যবস্থাকে সমাজের এমন একটি ভিন্ন অংশ হিসাবে ধরা হয় যা নিজস্ব নিয়মানুসারে চালিত হয় এবং যেখানে বাজারের সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকগুলো বিবেচিত হয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতাত্ত্বিকগণ সামাজিক পন্থায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বোঝানোর জন্য এক বিকল্প প্রক্রিয়া বিকশিত করার প্রয়াস করেন।

সমাজতাত্ত্বিকগণ মনে করেন যে, বাজার হচ্ছে এমন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা বিশেষ সংস্কৃতি দ্বারা গঠিত। উদাহরণস্বরূপ, বাজারের নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা কখনো কখনো বিশেষ সামাজিক শ্রেণি বা গোষ্ঠীর দ্বারা হয় এবং যার সংযোগ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, কোন সামাজিক প্রক্রিয়া এবং কাঠামোর সঙ্গে থাকে। সমাজতাত্ত্বিকগণ এই চিন্তাধারাকে কখনো কখনো এটা বলে মত প্রকাশ করেন যে অর্থব্যবস্থা সমাজের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। এটা দুটো উদাহরণের মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে, প্রথমত, সাপ্তাহিক উপজাতি *হাট*, দ্বিতীয়ত, 'প্রথাগত ব্যবসায়িক সম্প্রদায়' ও উপনিবেশিক ভারতে এর ব্যবসায়িক কর্মসূচি।

অ্যাডাম স্মিথ (1723-90)

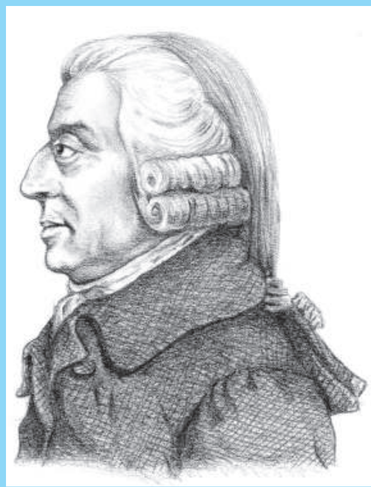

অ্যাডাম স্মিথকে সমকালীন অর্থনীতির উদ্ভাবক হিসাবে জানা যায়। স্মিথ তাঁর নিজের পাঁচটি বইয়ের সিরিজের 'The Wealth of Nations' থেকে প্রসিদ্ধ যেখানে একটি কথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে কিভাবে যুক্তিসম্মত ব্যক্তিগত স্বার্থ মুক্ত বাজারকে আর্থিক সমৃদ্ধিতে পরিণত করে।

ছত্তিশগড়ের বস্তর জেলায় ধোরাই গ্রামে 'উপজাতিদের' একটি সাপ্তাহিক বাজার

পৃথিবীর বেশিরভাগ কৃষিভিত্তিক সমাজে সাপ্তাহিক বাজার সামাজিক ও আর্থিক সংগঠনের একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য। সাপ্তাহিক যে বাজার হয় তা আশেপাশের গ্রামের লোকদের একত্রিত করে, কেউ নিজের ফসল বা জিনিস বিক্রি করার জন্য আসে, কেউ বা তৈরি শিল্পজাত পণ্য ক্রয় করার জন্য আসে যা তাদের গ্রামে পাওয়া যায় না। এইসব বাজার স্থানীয় লোকজন ছাড়াও বাইরের লোকজন, এছাড়া মহাজন, বিনোদনকারী, জ্যোতিষী এবং নামীদামী বিশেষজ্ঞদের আকর্ষণ করে, যারা নিজেদের পরিষেবা প্রদান করে। গ্রামীণ ভারতে কিছু অন্যরকমের বাজারও লক্ষ্য করা যায়, যার এক বিশেষ উদাহরণ হল গবাদি পশুর বাজার। এই অন্যরকমের বাজার বিভিন্ন স্থানীয় এবং আঞ্চলিক অর্থব্যবস্থাকে একত্রিত করে ও বৃহত্তর জাতীয় অর্থ ব্যবস্থায় শহর এবং মহানগরীর কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে।

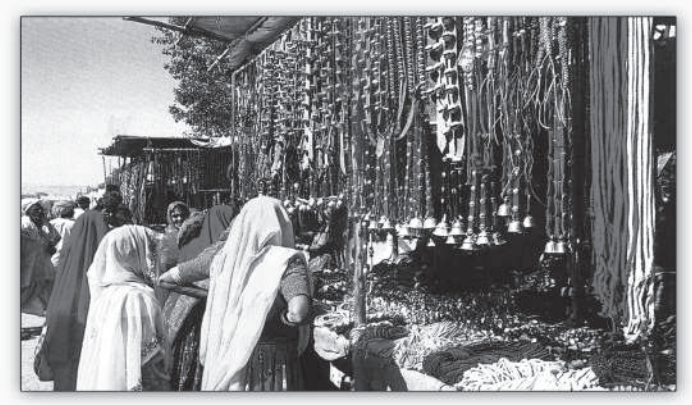

উপজাতি এলাকার একটি সাপ্তাহিক বাজার

সপ্তাহিক হাট গ্রামীণ ও নগরীয় ভারতে একটি পরিচিত দৃশ্য। পাহাড়ি বা বন্য এলাকায় (বিশেষ করে যেখানে আদিবাসীরা বসবাস করে) যেখানে মানুষের বসতি অনেক দূরদূরান্তে হয়, অনুন্নত রাস্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, আপেক্ষিকভাবে আর্থিক অবস্থাও দুর্বল, সেখানে সাপ্তাহিক বাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, জিনিসপত্র আদান-প্রদান ছাড়াও সামাজিক মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে। স্থানীয় লোকেরা তাদের জমির ফসল বা বনজ দ্রব্য বাজারে নিয়ে আসে। তারা এগুলো বড়ো ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে, যারা এই দ্রব্যগুলিকে শহরের বাজারে পুনরায় বিক্রি করে এবং এর বিনিময়ে তারা যে টাকা পায়, তা দিয়ে লবণ, কৃষিজাত দ্রব্য এবং উপভোগের বিভিন্ন জিনিস যেমন চুড়ি, গয়না ইত্যাদি ক্রয় করে। কিন্তু বেশিরভাগ লোকদের জন্য বাজারের মুখ্য কারণ হচ্ছে সামাজিক, যেমন নিজের আত্মীয়ের সাথে দেখা করা, পাত্রপাত্রীর বিয়ে ঠিক করা, গল্প করা ও অন্য কোনো কাজ করা।

উপজাতি এলাকায় সাপ্তাহিক বাজার একটি পুরানো প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপেরও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এসব প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিকে উপনিবেশিক রাজ্যগুলির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার পর, ক্রমশ বিস্তারিত আঞ্চলিক এবং রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে বোঝাপড়া ও রাস্তা নির্মাণের ফলে উপজাতি এলাকাগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপন সম্ভবপর হয়ে ওঠে (স্থানীয়রা অনেকেই 'আদিবাসী বিদ্রোহের' মাধ্যমে উপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করেন)। এরফলে এসব এলাকার সমৃদ্ধ বনভূমি ও খনিজ সম্পদগুলিকে কাজে লাগানো যায়। ফলে, ঐসকল জায়গায় ব্যবসায়ী, মহাজন ও উপজাতি ছাড়াও সমতল এলাকার লোকজনের প্রবেশ সম্ভব হয়ে ওঠে। তাই উপজাতিদের অর্থ ব্যবস্থায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, কেননা বনজ দ্রব্য বহিরাগতদের কাছে বিক্রি এবং নতুন ধরনের জিনিসপত্র তৈরি করার ফলে উপনিবেশিক শাসনকালে গড়ে ওঠা খনি ও চাষবাসের কাজে উপজাতিদের শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করা হতো। উপনিবেশিক সময়কাল থেকে উপজাতি শ্রমিকদের নিয়ে একটি 'বাজার' গঠিত হয়েছিল। এই সকল পরিবর্তনের কারণে স্থানীয় উপজাতিদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বড় বাজারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, যা স্থানীয় লোকদের ক্ষেত্রে নেতিবাচক ফলাফল প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, বাইরে থেকে আগত ব্যবসায়ী ও মহাজনরা ওইসব এলাকায় প্রবেশের ফলে আদিবাসীরা আরও দরিদ্র হতে থাকে। অনেকে নিজেদের জায়গা জমিও বাইরের লোকদের কাছে হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়।

সাপ্তাহিক বাজার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানরূপে, আদিবাসী এবং বহিরাগতদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাদের মধ্যে শোষণমূলক অর্থনৈতিক সম্পর্কও তৈরি করে; তারই চিত্র আমরা বস্তর জেলার সাপ্তাহিক বাজার গবেষণায় দেখতে পাই। ঐ জেলায় বিশেষ করে গোণ্ড আদিবাসীরা বসবাস করে। সাপ্তাহিক বাজারে স্থানীয় লোকজন, যার মধ্যে উপজাতি, অ-উপজাতি (বিশেষ করে ঃ হিন্দু) এবং বহিরাগতদের মধ্যে বিশেষত বিভিন্ন জাতির হিন্দু ব্যবসায়ীও থাকে। বনবিভাগের আধিকারিকরা, বন দফতরের জন্য কাজ করে এমন আদিবাসীদের সঙ্গে বাজারে আসে। তাছাড়া, ক্রেতা ও বিক্রেতাদের দ্রব্য ও পরিষেবা বিক্রয়ের জন্য সেই বাজার এক আকর্ষণীয় স্থল । বিশেষত ঐ বাজারে তৈরি জিনিসপত্রের ব্যবসা বেশি হয় (যেমন, গয়না ও নূপুর, হাড়ি এবং ছুরি) অ-স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য (যেমন- লবণ ও হলুদ) স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য এবং কৃষিজাত বস্তু এবং তৈরি জিনিসপত্র (যেমন- বাঁশের ঝুড়ি) ও বনের জিনিসপত্র (যেমন- তেঁতুল এবং তৈলবীজ) ইত্যাদি। বনের জিনিস দিয়ে তৈরি যেসব জিনিসপত্র আদিবাসীরা বিক্রির জন্য নিয়ে আসে, ব্যবসায়ীরা তা কিনে শহরে নিয়ে যায়।

এই বাজারে ক্রেতা বিশেষত আদিবাসীরা এবং বিক্রেতা হল হিন্দুরা। আদিবাসীরা বন ও কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদিত জিনিসপত্র বিক্রি করে এবং মজুরি হিসাবে যে অর্থ উপার্জন করে তা দিয়ে এই হাটে সস্তায় বিক্রি হওয়া নূপুর ও গয়না এবং উপভোগ করার জিনিস যেমন, তৈরি কাপড় কিনে।

অ্যালফ্রেড গেল (1982) -এর মতো নৃতত্ত্ববিদ্ যিনি ধোরাই নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁর মতে, বাজারের গুরুত্ব শুধুমাত্র এটার আর্থিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সীমিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি অঞ্চলের বাজারের আকার বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক সম্পর্কের ক্রমোচ্চ শ্রেণি বিন্যাসের প্রতীকস্বরূপ। ধনী এবং উচ্চ শ্রেণির রাজপুত গয়না বিক্রেতা ও মধ্যবিত্ত হিন্দু ব্যবসায়ীরা বাজারের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে এবং উপজাতি ব্যবসায়ী যেমন, সব্জি ও স্থানীয় জিনিসপত্রের ব্যবসায়ীরা মূল বাজার স্থলের বাইরের জায়গায় বসে তাদের ব্যবসার কাজ করে। ক্রয়-বিক্রয়ের জিনিসগুলির মাধ্যমে সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে লেনদেন সম্পন্ন করা হয়। এক্ষেত্রে বলা যায়, উপজাতি ও অ-উপজাতিদের মধ্যে আদান-প্রদানের সম্পর্ক, একই সম্প্রদায়ের হিন্দুদের মধ্যে সম্পর্কের থেকে ভিন্ন।

বাক্স 4.1

বস্তরে আদিবাসীদের একটি গ্রাম্য বাজার

ধোরাই একটি আদিবাসী গ্রাম্য বাজারের নাম যেটি ছত্তিশগড়ের উত্তরে বস্তর জেলার পশ্চাৎ ভূমির মধ্যে অবস্থিত। বাজার-বার ছাড়া অন্যান্য দিনগুলোতে ধোরাই গাছের ছায়ায় ঢাকা একটা পল্লী অঞ্চলে পরিণত হয়, যার দু'দিকে একটি উঁচু নিচু রাস্তা বনের মধ্যে গিয়ে মিশে গেছে। ধোরাইয়ের সামাজিক জীবন ওই জায়গার পুরানো দুটি চায়ের দোকানের মধ্যেই সীমিত, যার ক্রেতা হল রাজ্য বনবিভাগের নিম্ন শ্রেণির কর্মচারী যারা দুর্ভাগ্যবশত: ঐ দূরবর্তী ও নিরর্থক এলাকায় কাজের জন্য ফেঁসে আছে। বাজারবার, শুক্রবার ছাড়া ধোরাইয়ের অস্তিত্ব শূন্য-এর সমান হয়। কিন্তু বাজারের দিনে এটা মনে হয় যে ধোরাই সম্পূর্ণ আলাদা এক জায়গা। মালবাহী ট্রাকগুলোর কারণে রাস্তা আটকে যায়। বন বিভাগে কর্মরত নিম্নশ্রেণির কর্মচারীরা তাদের নতুন ইস্ত্রি করা জামাকাপড় পরে এদিক ওদিক চলাফেরা করতে থাকে, আর বনবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ অধিকারীকরা বনের বিশ্রামাগারের বারান্দা থেকে বাজারের দেখাশোনা করে। তারা উপজাতি শ্রমিকদেরও তাদের কাজের পারিশ্রমিক প্রদান করে ...

যখন বিশ্রামাগারে অফিস কক্ষের সভা অনুষ্ঠিত হয়, তখন উপজাতিদের দল চারদিক থেকে জমা হতে শুরু করে। তারা বনের বিভিন্ন জিনিসপত্র, নিজের ক্ষেতের ফসল বা নিজের হাতের তৈরি জিনিস নিয়ে উপস্থিত হয়। তারা হিন্দু সব্জি ব্যবসায়ী এবং দক্ষ কারিগর, মৃৎশিল্পী, তাঁতী ও কামারের সঙ্গে মিলিত হয়। এমন মনে হয়, ব্যস্ততার সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধি হচ্ছে, বাজারে যেন কোনো ধার্মিক উৎসবও চলছে, মনে হয় যেন সারা সংসার, ভগবান সবাই বাজারে একত্রিত হয়েছে। বাজার স্থলটি একটি 100 গজ বর্গক্ষেত্রের চতুর্ভূজ আকৃতির। যার মাঝামাঝি একটি বিশাল বটগাছ রয়েছে। বাজারের ছোট ছোট দোকানের ছাদগুলি খড় দিয়ে বানানো। এই দোকানঘরগুলো খুবই ঘিঞ্জি এলাকায় অবস্থিত, যার মাঝখান দিয়ে ছোট ছোট গলি চলে গেছে। যেসব কম প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নিজের কোনো দোকান ঘর থাকে না, তারা এই সংকীর্ণ গলিপথের খাঁজে খাঁজে নিজেদের পণ্য সামগ্রী নিয়ে বসে পড়ে। ফলে ক্রেতাদের খুব সাবধানে সেখানে হাঁটাচলা করতে হয় যাতে তাদের ধাক্কায় সেসব জিনিসপত্র ভেঙে না যায়। Source : Gell 1982- 470-71

বাক্স 4.1 এর অনুশীলনী

বাক্সে দেওয়া উদ্ধৃতাংশগুলিকে পড়ে নীচে দেওয়া প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

1. এই পরিচ্ছেদ থেকে তোমরা আদিবাসী এবং রাষ্ট্রের (যার প্রতিনিধিত্ব বনবিভাগের প্রতিনিধিদের দ্বারা হয়) সম্পর্ক সম্বন্ধে কী বলতে পার? আদিবাসী অঞ্চলে বন আধিকারিকরা কেন গুরুত্বপূর্ণ? ফরেস্ট গার্ডরা কেন উপজাতি শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করে থাকে?

2. বাজারের আকার তার সংগঠন ও কার্য ব্যবস্থা সম্পর্কে কী বোঝায়? কোন্ প্রকারের ব্যবসায়ীদের স্থায়ী দোকান থাকে, আর কম প্রতিষ্ঠিত দোকানদার কে, যারা নীচে বসে ব্যবসা করে?

3. বাজারে প্রকৃত ক্রেতা ও বিক্রেতা কারা? বাজারে কী প্রকারে জিনিসপত্র থাকে আর এই বিভিন্ন প্রকারে জিনিসপত্রকে কে ক্রয় ও বিক্রয় করতে আসে? এই ক্ষেত্রে স্থানীয় অর্থ ব্যবস্থা ও আদিবাসীদের বড়ো সমাজ ও অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে তোমরা কী বুঝতে পার?

প্রাক্ উপনিবেশিক ও উপনিবেশিক ভারতে জাতি ভিত্তিক বাজার এবং বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক

ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের গতানুগতিক বিবরণে ভারতের অর্থব্যবস্থা ও সমাজের এক অপরিবর্তনশীল রূপ লক্ষ্য করা যায়। এটা মনে করা হয় যে, এই আর্থিক রূপান্তর উপনিবেশবাদের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল। এটা মনে করা হতো যে, ভারত প্রাচীন গ্রাম সম্প্রদায়ের দেশ যা অপেক্ষাকৃত স্ব-নির্ভর ছিল আর এই অর্থ ব্যবস্থা প্রাথমিকভাবে বাজারবিহীন আদান প্রদানের উপর সংগঠিত হতো। উপনিবেশিক সময়কাল ও ভারতের স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এমন অনুমান করা হতো যে, ব্যবসায়িক অর্থ ব্যবস্থাকে স্থানীয় অর্থ ব্যবস্থায় আদান প্রদানের ফলে গ্রামীণ ও নগরীয় সমাজে ব্যাপক সামাজিক এবং আর্থিক পরিবর্তন হয়েছিল। এখানে এটা বলা ঠিক হবে যে, উপনিবেশবাদ বৃহৎ অর্থনৈতিক পরিবর্তন করেছিল, যেমন, ইংরেজদের দাবি ভূমি রাজস্ব নগদে দিতে হবে, এই পরিস্থিতিতে একটি ঐতিহাসিক গবেষণায় এটা দেখানো হয়েছে যে, ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে নগদীকরণ করা হয়েছিল (ব্যবসায় টাকা পয়সার ব্যবহার) যা উপনিবেশবাদের আগে থেকে শুরু হয়েছিল। যদিও অনেক গ্রামে ও অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের বাজার বহির্ভূত বিনিয়োগ ব্যবস্থার (যেমন যজমানী ব্যবস্থা) প্রচলন ছিল, তবু উপনিবেশবাদের আগেও গ্রামগুলোকে বিনিয়োগ ব্যবস্থার একটি বড়ো নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা হয়, যার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও বিভিন্ন জিনিসপত্র ব্যবহারের প্রচলন শুরু হয় (Bayly 1983, Stein and Subrahmanyam 1996)। এখন এমন মনে হয় যে, ‘পারস্পরিক’ ও ‘আধুনিক’ (অথবা পুঁজিবাদের আগে ও পুঁজিবাদের সময়ে) অর্থব্যবস্থায় কখনো কখনো যে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় তা পরিষ্কারভাবে ভাগ করা ছিল না, বরং একে অপরের সঙ্গে সম্মিলিত ছিল। সাম্প্রতিক একটি ঐতিহাসিক গবেষণায় এটা উঠে এসেছে যে প্রাক্ উপনিবেশবাদের সময়ে ভারতে ব্যবসা এবং অত্যাধুনিক বাণিজ্যিক সম্প্রচার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

এটা আমরা সবাই জানি যে, বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে ভারত সূতি এবং রেশম বস্ত্রের প্রধান উৎপাদক এবং রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। এছাড়া অন্যান্য জিনিস (যেমন মশলা) যার বিদেশের বাজারে, বিশেষ করে ইউরোপে খুব চাহিদা ছিল, ভারতে উৎপাদন এবং পরবর্তীকালে বাইরে রপ্তানি করা হতো। তাহলে এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, প্রাক্ উপনিবেশিক সময়কালে ভারত অত্যাধুনিক উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হতো। পাশাপাশি আদিবাসী ব্যবসায়িক সমিতি, ব্যবসায়িক যৌথ সম্প্রচার ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও উন্নত ছিল, যার ফলে ভারত অভ্যন্তরীণ ও বাইরের জগতের সঙ্গেও ব্যবসা বাণিজ্য করতে সক্ষম ছিল। এই পারস্পরিক ব্যবসায়িক সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর নিজস্ব ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও লোন নেওয়ার ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিনিয়োগ ও লোন নেওয়ার একটি মাধ্যম ছিল 'হুন্ডি' বা বিনিময় প্রথা (যা একটি ধার নেওয়ার কাগজ), যা ব্যবসায়ীরা দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায় ব্যবহার করতো। যেহেতু প্রাথমিকভাবে কিছু জাতিগত এবং আত্মীয়তার সূত্রেই ব্যবসা বাণিজ্য সম্পন্ন হতো, তাই দেশের কোনো এক কোণা থেকে একজন ব্যবসায়ী দ্বারা চালু করা হুন্ডি অন্য জায়গার ব্যবসায়ী দ্বারা স্বীকৃত হতো।

তামিলনাড়ুর নাট্টকোট্টাই চেট্টিয়ারস্ (বা নাকারাট্টারস)- এটির একটি জীবন্ত উদাহরণ, যা স্পষ্ট করে যে দেশি বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক কিভাবে সংগঠিত হয় এবং কাজ করে। উপনিবেশিক সময়কাল থেকে এই সম্প্রদায়ের উপর করা গবেষণায় এটা প্রমাণিত যে, ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসায়িক কার্যকলাপ কী প্রকারে সম্প্রদায়ের সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রয়েছে। জাতি, আত্মীয়তা ও পরিবারের কাঠামো সব কিছুই ব্যবসার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিল এবং সেই সামাজিক কাঠামোর অন্তর্গত ব্যবসা বিস্তার করতো। বেশিরভাগ প্রথাগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মতো সাধারণত নাকারাট্টার ব্যাঙ্ক এক যৌথ পরিবার প্রতিষ্ঠানের মতো ছিল, তাই এই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের গঠনও পরিবার অনুরূপ ছিল। এই রূপ বাণিজ্যিক ও ব্যাঙ্কিং কার্যকলাপ জাতি এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের মাধ্যমে সংগঠিত হতো। উদাহরণস্বরূপ, চেট্টিয়ার ব্যবসায়ী জাতিভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ বা সম্পর্ক দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ও সিংহলে তাদের কার্যকলাপের বিস্তার করতে সহায়তা করে। আবার দেখতে গেলে নাকারাট্টারস দেশীয় আর্থিক গতি প্রকৃতিকে একপ্রকারের পুঁজিবাদ বলা যায়। এই ব্যাখ্যা আমাদের এই প্রশ্ন করতে বাধ্য করে যে, 'পুঁজিবাদের' কী কোনও অন্য স্বরূপ আছে, না ছিল যা ইউরোপের পুঁজিবাদ থেকে ভিন্ন (Fudner 1994)

বাক্স 4.2

তামিলনাড়ুর নাকারাট্টারস্দের জাতি ভিত্তিক বাণিজ্য

এর তাৎপর্য এই নয় যে, নাকারাট্টারস্দের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সাথে অর্থনীতিবিদদের প্রদত্ত পশ্চিমের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মধ্যে কোনো সাদৃশ্য রয়েছে ... নাকারাট্টারস্রা তাদের জাতিভিত্তিক সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে একজন অন্যজন থেকে টাকা ধার নিতো অথবা টাকা জমা করতো। এই সামাজিক সম্পর্ক ব্যবসার জায়গা, আবাসিক অবস্থান, বংশানুক্রম, বিবাহ ও সাধারণ ধর্মীয় সদস্যপদ ইত্যাদির ভিত্তিতে গড়ে উঠতো। আধুনিক পশ্চিমী ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বিপরীত নাকারাট্টারস্দের সুখ্যাতি, সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ এবং এই সিদ্ধান্ত অনুসারে জমাপুঞ্জী বিনিময় ইত্যাদির কারণে সাধারণ জনগণ নাকারাট্টারদের তাদের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করে। এই ব্যবস্থা সরকার নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর মতো ছিল না। অন্য অর্থে বলা যায় যে, নাকারাট্টারদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা এক বর্ণভিত্তিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক নাকাট্টার বিভিন্ন প্রকারের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলে এবং ব্যবস্থানুসারে নিজের জীবন সংগঠিত করতো। এটি এমন প্রতিষ্ঠান ছিল যা নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে পুঁজি জমা করা এবং বন্টন করার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

Source: Rudner 1994:234.

বাক্স 4.2 এর অনুশীলনী

বাক্সে দেওয়া *Caste and Capitalism in Colonial India* (Rudner 1994) নামক বই থেকে নেওয়া লেখাংশকে পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

1. লেখকের অনুসারে, নাকারাট্টারদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা এবং আধুনিক পশ্চিমী ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কী গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে?
2. নাকারাট্টারদের ব্যাঙ্কিং এবং ব্যবসায়িক কার্যকলাপ কীভাবে অন্য সামাজিক কাঠামোর সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত?
3. আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার অন্তর্গত তুমি কি এমন উদাহরণের কথা চিন্তা করতে পার, যা আর্থিক গতি প্রকৃতিতে নাকারাট্টারদের মতো সামাজিক কাঠামোর সঙ্গো মিলিত?

বাজারের সামাজিক সংগঠন - 'প্রথাগত ব্যবসায়িক সম্প্রদায়'

ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থার অনেক সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নে 'প্রথাগত ব্যবসায়িক সম্প্রদায়' বা জাতি যেমন নাকারাট্টারদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা হয়েছে। তোমরা ইতিমধ্যেই জেনেছ যে, জমির উপর অধিকার, ব্যবসায়িক ভিন্নতা এবং অন্য বিষয়েও জাতি ব্যবস্থা এবং অর্থ ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এটা বাজার এবং ব্যবসার ক্ষেত্রেও প্রাযোজ্য। বাস্তবে 'বৈশ্য' হল চার বর্ণের মধ্যে অন্যতম — এটা ইঙ্গিত দেয় ভারতীয় সমাজে প্রাচীনকাল থেকে বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তথাপি অন্যান্য বর্ণের মতো 'বৈশ্য'-এর প্রতিষ্ঠা কখনো কখনো নির্দিষ্ট পরিচয় অথবা সামাজিক অবস্থার তুলনায় অধিকার এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে প্রাপ্ত হয়। যদিও এমন অনেক বৈশ্য সম্প্রদায় রয়েছে (যেমন, উত্তর ভারতের 'বানিয়া') যারা ঐতিহ্যগত পেশা হিসাবে বহুকাল ধরে ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে যুক্ত রয়েছে, আবার এমন কিছু জাতি গোষ্ঠীও রয়েছে যারা এই ব্যবস্থায় প্রবেশ করেছেন। সামাজিক পদমর্যাদায় নিজেদের উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এই গোষ্ঠীগুলি 'বৈশ্য' হিসাবে পরিচিতি লাভের দাবি করে। সমস্ত জাতি সম্প্রদায়ের ইতিহাসের মতো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতির অবস্থান বা পরিচয় এবং বর্ণপ্রথা যার মধ্যে পেশাও সম্পর্কযুক্ত রয়েছে, তাদের মধ্যে একটি জটিল সম্পর্ক বিস্তার করে। ভারতে প্রথাগত ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের মধ্যে 'বৈশ্য' ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী অথবা অন্যান্য সম্প্রদায় যেমন পারসী, সিন্ধি, বোহরা এবং জৈন রয়েছে। ব্যবসায়িক সম্প্রদায়গুলোর সমাজে সব সময় উচ্চ পদমর্যাদা ছিল না। এক্ষেত্রে বলা যায় উপনিবেশিক কাল থেকে লবণের দূরবর্তী বাণিজ্য 'বাঞ্জারা' নামক এক উপেক্ষিত উপজাতি সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত হতো।

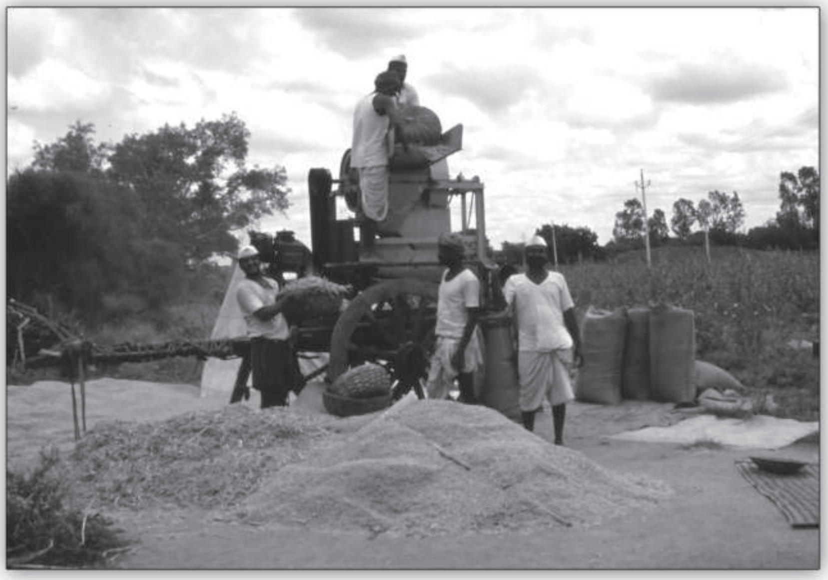

একটি গ্রামের কৃষিকাজ।

এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ও নীতির প্রকৃতি বিভিন্ন সংগঠন এবং ব্যবসার প্রচলনকে জন্ম দেয়।

ভারতের অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাজারের পরিচালন ব্যবস্থাকে বুঝতে হলে আমরা প্রথমে এটা অনুসন্ধান করতে পারি যে, কীভাবে ব্যবসার কিছু বিশেষক্ষেত্র কিছু নির্দিষ্ট সম্প্রদায় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। ব্যবসায় এই জাতিভিত্তিক বিশেষীকরণের একটি কারণ এমনও হতে পারে যে, ব্যবসা বাণিজ্যকেন্দ্রীক ক্রিয়াকলাপ সাধারণভাবে জাতি এবং আত্মীয়তার মধ্যে দিয়েই সংগঠিত হতো যা আমরা নাকারাট্টারদের উদাহরণে দেখেছি। যেহেতু ব্যবসায়ী তার নিজের সম্প্রদায়ের লোকের উপর বিশ্বাস ও ভরসা করতে পারে, এই কারণে তার মধ্যে বহিরাগতদের তুলনায় তার নিজের সম্প্রদায়ের লোকেদের সাথে ব্যবসা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাই ব্যবসার কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট জাতির একাধিকার পরিলক্ষিত হয়।

কাজ 4.1

তুমি যেখানে বসবাস কর, সেই শহর বা শহরের কেন্দ্রস্থলের একটি বাজার পরিদর্শন করো। সেখানকার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ীদের খুঁজে বের কর। তারা কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত? এইসব ব্যবসায় এমন কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্র রয়েছে যা কোনো বিশেষ সম্প্রদায় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যেমন, গয়নার দোকান, কিরানা (খাদ্য সম্ভার), লোহালক্কড়ের দোকান, আসবাদপত্রের দোকান ইত্যাদি? এই দোকানগুলির মধ্যে কিছু দোকান পরিদর্শন কর এবং সেই ব্যবসায়ীদের এবং সম্প্রদায়গুলিকে খুঁজে বের কর যারা ব্যবসাটি পরিচালনা করছে। এটা কী তাদের বংশগত পারিবারিক ব্যবসা?

উপনিবেশবাদ ও নতুন বাজারের আবির্ভাব

উপনিবেশবাদের আবির্ভাবের সময় থেকে ভারতের অর্থ ব্যবস্থায় এক অভুতপূর্ব পরিবর্তন আসে যা উৎপাদন, ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষির ক্ষেত্রে এক বিশাল বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর একটি প্রচলিত উদাহরণ হল, ভারতে হস্ততাঁত শিল্পের ধ্বংস। তার কারণ হল ওই সময়ে ইংল্যান্ড থেকে সস্তা তৈরি কাপড়ের সম্ভার ভারতীয় বাজারে আমদানি করা হতো। যদিও প্রাক্ উপনিবেশিক সময় থেকে ভারতে এক জটিল অর্থনীতি ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল, বেশিরভাগ ঐতিহাসিকগণ উপনিবেশবাদের সময়কে এক সন্ধিক্ষণ রূপে দেখেন। উপনিবেশিক সময়কালে ভারত বিশ্ব পুঁজিবাদী অবস্থার সাথে ব্যাপকভাবে যুক্ত হয়ে যায়। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের পূর্বে ভারত বিশ্ব বাজারে তৈরি জিনিসপত্রের প্রধান সরবরাহকারী ছিল। উপনিবেশবাদের পরবর্তীকালে, ভারত কাঁচামাল এবং কৃষিজাত দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রধান উৎস হয়ে উঠে, যা মূলত ইংল্যান্ডকে শিল্পোন্নত করে তোলার প্রক্রিয়ায় সহায়ক হয়। ঠিক একই সময়ে, নতুন গোষ্ঠী (মুখ্যতঃ ইউরোপিয়ান) ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবেশ করে, কখনো কখনো তৎকালীন ব্যবসায়িক সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধভাবে এবং কিছুক্ষেত্রে বলপূর্বক ইরেজরা তাদের ব্যবসায় বিস্তার ঘটায়। কিন্তু তৎকালীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করার পরিবর্তে, ভারতীয় বাজার অর্থ ব্যবস্থায় কিছু ব্যবসায়িক সম্প্রদায়কে নতুন সুযোগ প্রদান করে, যারা পরিবর্তিত আর্থিক অবস্থা অনুসারে নিজেদের পুনর্গঠিত করে এবং নিজেদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করে। কিছু ক্ষেত্রে, উপনিবেশবাদ দ্বারা প্রদান করা আর্থিক সুবিধার লাভ নেওয়ার জন্য নতুন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে এবং তারা স্বাধীনতার পরেও নিজেদের আর্থিক শক্তিকে অব্যাহত রাখে।

এই প্রক্রিয়ার একটি ভালো উদাহরণ হল, মাড়োয়ারিরা, যারা সম্ভবত ভারতের সুদূর প্রসারী ও বহু পরিচিত ব্যবসায়িক সম্প্রদায়। মাড়োয়ারির সম্পর্ক 'বিড়লা' পরিবারের মতো বড় শিল্প পরিবারের সঙ্গে তো আছেই, এছাড়া ছোট ছোট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও রয়েছে, যারা ভারতের চারিদিকে ব্যবসার সূত্রে ছড়িয়ে আছে। উপনিবেশবাদের সময় থেকে মাড়োয়ারিরা এক সফল ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। সে সময় তারা উপনিবেশিক শহর যেমন কলিকাতায় বাণিজ্যের নতুন সুযোগ লাভ করে এবং ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তারের জন্য দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

নতুন বাজার

নাকারাট্টারদের মতো মাড়োয়ারিদের সফলতাও ব্যাপক সামাজিক নেট ওয়ার্কের উপর নির্ভরশীল ছিল যা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিশ্বাসের জন্ম দেয়। অনেক মাড়োয়ারি পরিবার এমন ধন সম্পদ জমাতে সমর্থ হয় যে তারা মহাজনে পরিণত হয় এবং এইভাবে তারা ইংরেজদের ভারতে বাণিজ্যিক বিস্তার ঘটাতে সাহায্য করে (Hardgrove 2004)। উপনিবেশবাদের শেষের দিনগুলিতে এবং স্বাধীনতার পরবর্তীকালে, কিছু মাড়োয়ারি পরিবার নিজেদের আধুনিক শিল্পপতিতে রূপান্তরিত করে এবং আজও ভারতে বাকি অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় মাড়োয়ারিরা শিল্পের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো অংশীদার। উপনিবেশিক সময়ে এক নতুন ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের উত্থান ও এক ক্ষুদ্র প্রচরণ ব্যবসায়ী থেকে বড়ো ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিতে রূপান্তরিত হওয়ার এই কাহিনি আর্থিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধের গুরুত্বকে বর্ণনা করে।

4.2 পুঁজিবাদকে এক সামাজিক ব্যবস্থা রূপে বোঝা

আধুনিক সমাজতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে কার্লমার্কস আধুনিক পুঁজিবাদের সমালোচকও ছিলেন। মার্ক্স **পুঁজিবাদকে** পণ্য (Commodity) উৎপাদন অথবা বাজারের উৎপাদন ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করতেন, যা শ্রমিকের মজুরির উপর নির্ভর ছিল। তোমরা আগেই পড়েছ, মার্কস লিখেছিলেন যে, সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই আসলে সামাজিক ব্যবস্থা। প্রত্যেক **উৎপাদন** পদ্ধতি বিশেষ উৎপাদন সম্পর্কের অন্তর্গত যা এক বিশিষ্ট শ্রেণির কাঠামো গড়ে তোলে। মার্কস এই কথার উপর জোর দিয়েছেন যে, অর্থব্যবস্থা সেসব জিনিসের (বাজারের পণ্য) উপর নির্ভর নয়, বরং মানুষের সম্পর্কের মাধ্যমে হয়, যা উৎপাদন প্রক্রিয়া দ্বারা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পুঁজিবাদী উৎপাদন বিধির অন্তর্গত, শ্রমিক বা শ্রম একটি 'পণ্য', কারণ শ্রমিক নিজের **শ্রম শক্তিকে** বাজারে বিক্রি করেই নিজের মজুরি অর্জন করে। এইভাবে দুটি সাধারণ গোষ্ঠী গঠিত হয় — পুঁজিবাদী, যারা উৎপাদনের মালিকানা (বিশেষত কারখানায়) অর্জন করে এবং শ্রমিক যারা নিজের শ্রম পুঁজিবাদীদের বিক্রি করে। পুঁজিবাদী শ্রেণি শ্রমিকদের কম মজুরি দিয়ে অর্থাৎ শ্রমিকদের উৎপাদনের মূল্য থেকে কম মজুরি প্রদান করে মুনাফা লাভ করে। পাশাপাশি, তারা শ্রমিকদের শ্রম থেকে অতিরিক্ত মূল্য বের করে নেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মার্কসের পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার তত্ত্ব সমাজের অন্যান্য তত্ত্ব এবং পুঁজিবাদের প্রকৃতির উপর তর্কের জন্য অনুপ্রেরণা প্রদান করে।

পণ্যকরণ ও উপভোগ

পৃথিবীর সর্বত্র পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে জীবনের এমন সব ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার বিস্তার ঘটে যা পূর্বে এই ব্যবস্থাপনা দ্বারা অস্পর্শিত ছিল।

'পণ্যকরণ' তখন ঘটে, যখন এমন কোনও বস্তু যা আগে বাজারে কেনা ও বেঁচা হতো না, এখন তা পণ্যে পরিণত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, শ্রম বা দক্ষতা এখন পণ্যে পরিণত হয়েছে যা বাজারে এখন ক্রয় বিক্রয় করা হয়। মার্কস ও পুঁজিবাদের অন্যান্য সমালোচকদের মতে, পণ্যকরণ প্রক্রিয়ার নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব রয়েছে। শ্রমের পণ্যকরণ তারই একটি উদাহরণ। কিন্তু সমকালীন সমাজে এর আরো অনেক দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, কিডনি প্রতিস্থাপনের আবশ্যকতা রয়েছে এমন বিত্তশালী রোগী যখন কোনও দরিদ্র লোকের কিডনি ক্রয় করে, তখন সেটা বিতর্কে পরিণত হয়। কেননা অনেকেই মনে করেন যে মানব অঙ্গের পণ্যকরণ হওয়া উচিত নয়, অর্থাৎ মানব দেহের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পণ্যে পরিণত করা অনুচিত। পূর্বে মানুষ ক্রীতদাস হিসাবে ক্রয় বিক্রয় হতো। কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষকে পণ্যের সঙ্গে তুলনা করা অনৈতিক। তবে, আধুনিক সমাজে প্রায় প্রত্যেকেরই এই ধারণা গ্রহণযোগ্য যে, একজন মানুষের শ্রমকে ক্রয় করা যায় অথবা অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন পরিষেবা বা দক্ষতা প্রদান করা যায়। মার্কসের মতে এটি এমন পরিস্থিতি যা কেবলমাত্র পুঁজিবাদী সমাজেই পরিলক্ষিত হয়।

সমকালীন ভারতে আমরা লক্ষ্য করি এমন কিছু জিনিস বা প্রক্রিয়া যা পূর্বে বাজারের অংশ ছিল না কিন্তু তা এখন পণ্যে পরিণত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রথাগতভাবে বিবাহ পরিবার দ্বারা ঠিক করা হতো, কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন পেশাধারী সংস্থা বা ওয়েব সাইটের মাধ্যমে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বিবাহের জন্য পাত্রপাত্রী নির্বাচন করা হয়। অপর একটি উদাহরণ হল, সাম্প্রতিককালে অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য, ইংরেজি ভাষায় কথা বলা ইত্যাদির মতো কিছু কোর্সের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। ফলে বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত যুবক-যুবতি প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দক্ষতা অর্জন করে সাফল্য লাভ করতে পারে।

কাজ 4.2

পণ্যকরণ (Commoditisation or Commodification) এখানে একটি বড়ো শব্দ, যা শুনতে জটিল লাগে। কিন্তু এই শব্দটি যে প্রক্রিয়ার দিকে ইঙ্গিত করে, তার সঙ্গে আমরা সুপরিচিত এবং তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যমান। এর একটি সাধারণ উদাহরণ হল, — সিল করা জলের বোতল।

বর্তমানে শহর ও শহরতলী ছাড়া, অধিকাংশ গ্রামেও এখন প্যাকেটে সিল করা প্লাস্টিকের জলের বোতল পাওয়া যায় । যা 1 থেকে 2 লিটার বা তার ছোট আকারের হয়। এইসব বোতলগুলি বিভিন্ন কোম্পানি দ্বারা বাজারজাত করা হয় এবং এর অসংখ্য ব্র্যান্ডও রয়েছে। কিন্তু এটা একটা নতুন ঘটনা যা, দশ থেকে পনেরো বৎসর পূর্বেও ছিল না। এটা সম্ভাব্য যে, তোমরা মনে করে দেখতে পার, এমন একটা সময় যখন এরকম জলের বোতল বিক্রি করা হতো না। এ ব্যাপারে তোমাদের বয়োঃজেষ্ঠ্যদের জিজ্ঞেস করে দেখো। তোমাদের বাবা-মার প্রজন্মের মানুষদের নিশ্চই মনে থাকবে সেই অনুভূতি যখন জলের বোতাল ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। তোমাদের দাদু দিদা বা ঠাকুরমা ঠাকুরদাদাদের প্রজন্মে এটা অচিন্তনীয় ছিল যে, কেউ টাকার বিনিময়ে জলের বোতল বিক্রি করবে। কিন্তু বর্তমানে পণ্য হিসাবে আমাদের জলের বোতল কেনা (বা বিক্রি) একটি স্বাভাবিক ও সুবিধাজনক ব্যাপার। এটাই পণ্যকরণ — যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিছু বস্তু যা পূর্বে পণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতো না, কিন্তু বর্তমানে তা বাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠে।

তুমি কি এমন অন্য উদাহরণের চিন্তা করতে পার যা সম্প্রতি বাজারের পণ্যে পরিণত হয়েছে। মনে রাখবে, পণ্য যে কোন বস্তু বা জিনিসই হবে তা অপরিহার্য নয়; এটা যে কোন পরিষেবাও হতে পারে। এটাও চিন্তা করে দেখ যে, এমন কোনও বস্তু যা বর্তমানে পণ্য নয় কিন্তু ভবিষ্যতে তা পণ্যে পরিণত হতে পারে। কী কারণে এটা হতে পারে? পরিশেষে চিন্তা করো, এমন কোন জিনিস যা পূর্বে বাজারের পণ্য ছিল কিন্তু বর্তমানে তার পণ্যকরণ বন্ধ হয়ে গেছে (অর্থাৎ পূর্বে বাজারে তার মূল্য ছিল কিন্তু এখন আর নেই)। একটা পণ্য কখন এবং কেন পণ্য হিসাবে তার গ্রহণযোগ্যতা হারায়?

DNIe
TM
Digital Natural Image engine
SAMSUNG C100
LOADED. FULLY ADDICTIVE.
erfection
Get hold of one today.
You'll agree, it's addictive.

পূর্বে, সামাজিক দক্ষতা বিশেষ করে ভালো আচরণ এবং শিষ্ঠাচার ইত্যাদি প্রাথমিকভাবে পরিবারেই শেখানো হতো। অথবা আমরা এটা মনে করতে পারি যে, আজকাল বেড়ে ওঠা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন — বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং কোচিং ক্লাসের মাধ্যমে কোনভাবে শিক্ষার পণ্যকরণের প্রক্রিয়া ঘটছে।

পুঁজিবাদী সমাজের এক বিশেষগুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল 'উপভোগ' যা বর্তমান সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর পেছনে কেবলমাত্র আর্থিক কারণই নয়, এর প্রতীকমূলক (Symbolic) অর্থও রয়েছে। আধুনিক সমাজে উপভোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্ধতি যার দ্বারা সামাজিক পার্থক্যের সৃষ্টি এবং তার ভাব বিনিময় হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একজন ভোক্তা, কিছু নির্দিষ্ট বস্তু ক্রয় বা প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজের আর্থ-সামাজিক বা সংস্কৃতিক অবস্থান সম্পর্কে একটি বার্তা জ্ঞাপন করে থাকে। ঠিক একইভাবে, কোম্পানিগুলি কিছু বিশেষ পণ্য বিক্রয় করে ভোক্তার সাংস্কৃতিক অবস্থান বজায় রাখতে সাহায্য করে। টিভিতে যেসব বিজ্ঞাপন দেখানো হয় এবং রাস্তার ধারে তৈরি মঞ্চে যে বিজ্ঞাপন আমরা প্রতিদিন দেখি, সেগুলির মধ্যে লুকানো অর্থগুলি সম্পর্কে চিন্তা করো। ভেবে দেখো বিজ্ঞাপনদাতা নিজের উৎপাদনের বিক্রির জন্য কীভাবে এইসব বিজ্ঞাপন তৈরি করে।

> **কাজ 4.3**
>
> **বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা**
>
> সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিন থেকে কিছু বিজ্ঞান সংগ্রহ কর। এর মধ্যে থেকে দুই তিনটি মজাদার খুঁজে বের কর। এই প্রতিটি বিজ্ঞাপন থেকে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চেস্টা কর।
>
> 1. কোন্ দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে এবং ঐ দ্রব্যের কী প্রতিছ্ববি দেখানো হয়েছে?
> 2. বিজ্ঞাপনদাতা কীভাবে এই দ্রব্যটিকে কাম্য জীবনধারা অথবা সামাজিক মর্যাদার সঙ্গো সম্পর্ক তৈরি করার চেস্টা করেন?

সমাজতত্ত্বের এক অন্যতম প্রবক্তা, মাক্স ওয়েবার, প্রথমবারের মতো এটা প্রমাণ করেন যে, মানুষ যেসব জিনিস ক্রয় ও ব্যবহার করে, তা তাদের সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি এই সম্পর্ককে 'সামাজিক মর্যাদার প্রতীক' রূপে উদ্ভাবন করেন। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান ভারতে মধ্যবিত্ত পরিবার যে মডেলের গাড়ি ব্যবহার করে অথবা যে নামী কোম্পানির মোবাইল ফোন ব্যবহার করে তা তাদের সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদার মাপকাঠি হিসাবে কাজ করে। ওয়েবার আরও লিখেছিলেন, কীভাবে জীবনশৈলীর মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণি এবং মর্যাদা গোষ্ঠীর (Status group) পৃথকীকরণ করা হয়। 'উপভোগ' জীবনশৈলীর একটি দিক্। কিন্তু তার অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ও রয়েছে যেমন, তোমরা কীভাবে তোমাদের বাড়ি সুসজ্জিত করছ ও কী ধরনের পোশাক পরিধান করছ, অবসর সময় কীভাবে ব্যয় করছ এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনের ধারা ইত্যাদি। সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা উপভোগের রূপ ও জীবনশৈলীর অধ্যয়ন করেন কেননা আধুনিক সমাজে এর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে।

4.3 বিশ্বায়ন — স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের মধ্যে সম্পর্ক

1980 -এর দশকের পরে, ভারত অর্থনৈতিক ইতিহাসের এক নতুন যুগে প্রবেশ করে। এটা প্রধানত রাজ্যস্তরীয় উন্নতিতে উদারবাদের মতো আর্থিক নীতির পরিবর্তনের কারণে হয়েছিল। এই পরিবর্তনের ফলে বিশ্বায়নের সূচনা হয় — ঐ সময় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত ক্রমবর্ধমানভাবে পরস্পর সংযুক্ত হয়েছিল — তবে এটা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও হয়। বিশ্বায়ন শব্দটির মধ্যে অনেক ধরনের প্রবণতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য দ্রব্য, অর্থ, তথ্য এবং জনগণের গতিশীলতা। তার সঙ্গো রয়েছে উন্নত প্রযুক্তি (যেমন কম্পিউটার, টেলি যোগাযোগ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা) এবং অন্য পরিকাঠামোর উন্নতি, যা এই প্রক্রিয়াকে গতি প্রদান করে।

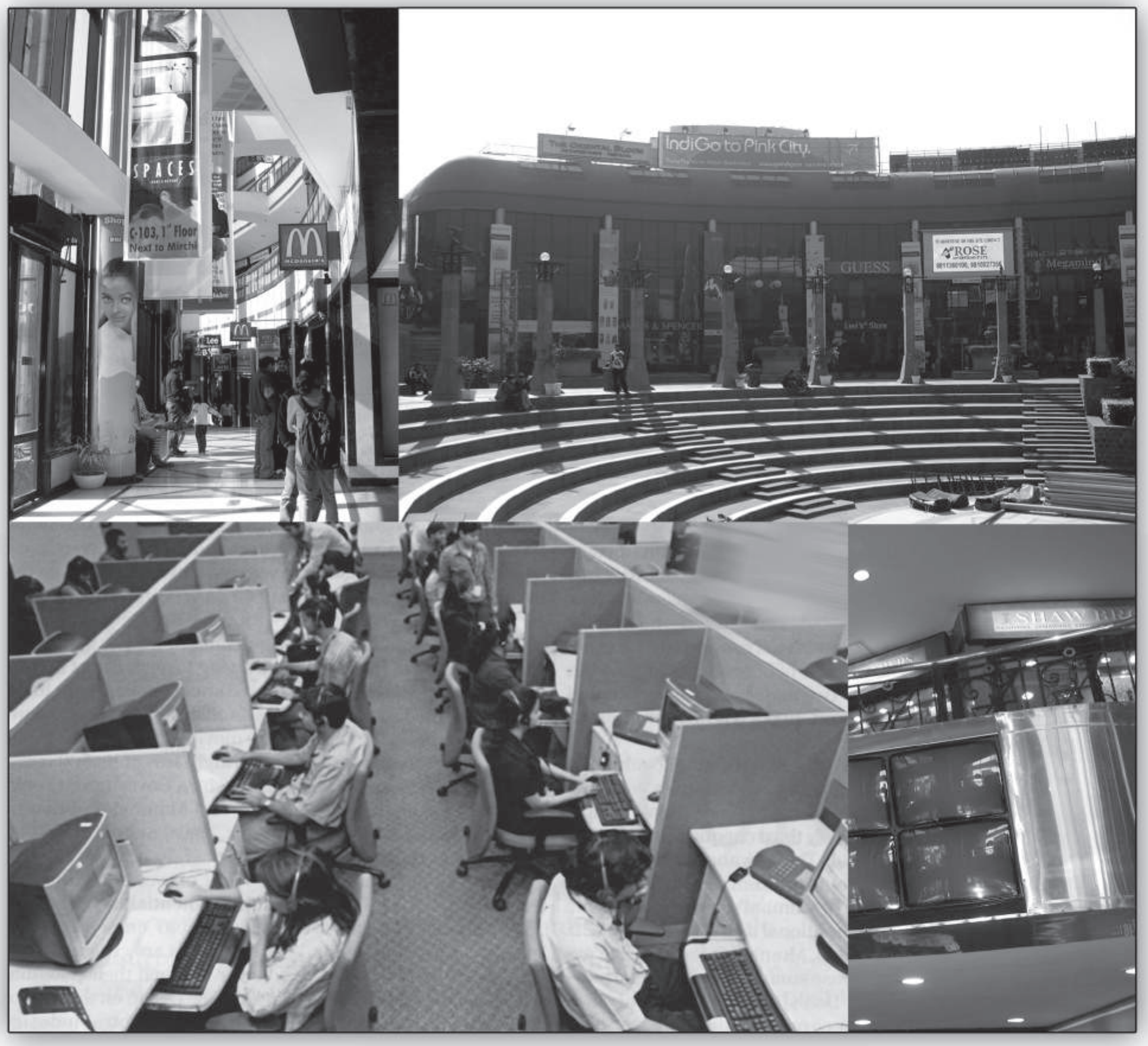

বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নতি

বিশ্বায়নের একটি কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হল পৃথিবীর সর্বত্র বাজারের বিস্তৃতি এবং একীকরণের বিস্তার। এই একীকরণের অর্থ হল পৃথিবীর যে কোনও অংশের বাজারে যদি কোন পরিবর্তন হয় তবে তার অনুকূল বা প্রতিকূল প্রভাব অন্যান্য অংশেও পরিলক্ষিত হবে। যেমন, যদি আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা মন্দা চলে তাহলে ভারতের সফ্টওয়ারের (Software) বাজারেও তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় (যেভাবে নিউইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে 9/11 এর হামলার পর দেখা গিয়েছিল)। যার ফলে এই সকল জায়গায় মানুষের ব্যবসায় প্রভাব পড়ে এবং চাকুরিও চলে যায়। সফ্টওয়ার সেবা কোম্পানি এবং বিজনেস প্রসেস আউট সোর্সিং (Business Process Outsourcing -**BPO**) কোম্পানি (বিশেষত, কল সেন্টার) ঐ সকল প্রধান ক্ষেত্র যার দ্বারা ভারত বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ভারতের কোম্পানিগুলি পশ্চিমের উন্নতশীল দেশের ভোক্তাদের সস্তায় শ্রম এবং পরিষেবা প্রদান করে। তাই আমরা বলতে পারি যে, ভারতে এখন সফ্টওয়ার শ্রম এবং আন্তর্জাতিক পরিষেবার আন্তর্জাতিক বাজার রয়েছে।

অপ্রত্যক্ষ বাজার ? সময় এবং দূরত্ব অতিক্রম

বাক্স 4.3

ময়শূর থেকে নাসদাকের উদ্বোধনী ঘণ্টা ঃ
ইনফোসিস রিমোর্ট অপারেশন স্ক্রিপ্টস্ রেকর্ড, যা আমেরিকার শেয়ার বাজারের সূচনা করেছিল।

ময়শূর ঃ যদি তোমার এখনও বিশ্বাস না হয় যে, পৃথিবী সমতল, তাহলে এটা বিবেচনা করে দেখ ঃ ইনফোসিস্ প্রযুক্তির মাধ্যমে ময়শূরের মতো দূরবর্তী স্থান থেকে নাসদাকের উদ্বোধনের ঘণ্টা বাজানো হয়। ইনফোসিসের চেয়ারম্যান ও সভাপতি এন আর নারায়ণ মূর্তি ঠিক সন্ধ্যে 7 টায় বোতাম টিপে নিউয়র্কের টাইম্স স্কয়ার টাওয়ারের নাসদাক বাজার সাইটের সোমবারের বাণিজ্যিক পর্বের উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধনী ঘণ্টা হল একটি আনুষ্ঠানিক পর্ব যা নাসদাকের অপ্রত্যক্ষ বাজারের মডেলকে প্রতিনিধিত্ব করে। যেহেতু নাসদাকের পরিচালন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ইলেকট্রনিক, তাই পৃথিবীর যে কোনও প্রান্ত থেকে তার সূচনা সম্ভব। তাই এই উদ্বোধনী পর্বের মাধ্যমে প্রতিটি বাণিজ্যিক দিনের সূচনা হয় যেখানে বিনিয়োগকারী এবং বাজারের প্রতিযোগীরা একত্রিত হয়।

Source: *News item in the* Times of India*, Bangalore, August 1, 2006*

বাক্স 4.3 এর অনুশীলনী

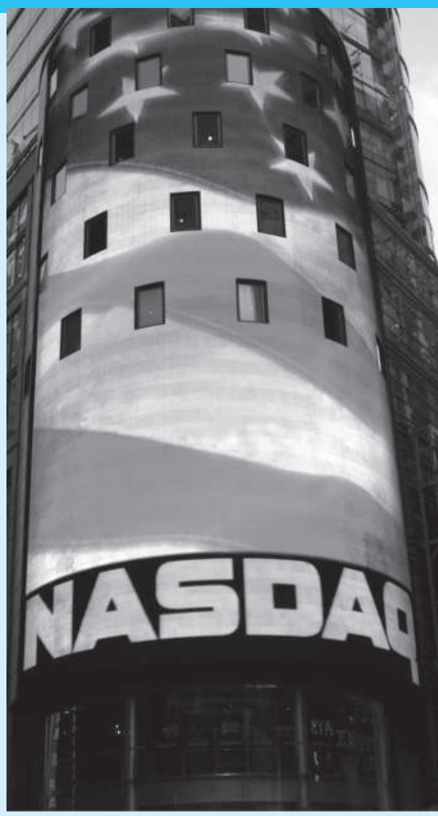

নাসদাক একটি প্রধান ইলেকট্রনিক বিনিময় কেন্দ্রের (stock exchange) নাম যা নিউইয়র্কে অবস্থিত। এই কেন্দ্রের পরিচালন ব্যবস্থা বিশেষ করে কম্পিউটার কেন্দ্রিক ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে হয়। এটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দালাল ও বিনিয়োগকারীদের ওইসব কোম্পানির শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করতে সাহায্য করে যেগুলো নাসদাক এ তালিকাভুক্ত থাকে। এই লেনদেন ‘বাস্তবিক সময়’ (in real time) - এ হয় — অর্থাৎ যা সামান্য সময়ের মধ্যে প্রতিফলিত হয় বিনা কাগজে বিনা নথিতে বা সঠিক কোন মুদ্রায়। উপরে দেওয়া খবরের অংশগুলিকে মন দিয়ে পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

1. শেয়ার বাজারের লেনদেন (যেমন, নাসদাক অথবা মুম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জ) অন্যান্য বাজার থেকে কীভাবে ভিন্ন ? তুমি শেয়ার বাজার সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য সংবাদপত্র ম্যাগাজিন অথবা ইন্টারনেট থেকেও নিতে পারো।

2. ইনফোসিসের সভাপতি নারায়ণ মূর্তি ময়শূরের অফিসে বসে নিউইয়র্কে অবস্থিত নাসদাক বাজারের উদ্বোধন করেন। এই ঘটনাটি পড়ে সাম্প্রতিক বিশ্বের বাজারের প্রকৃতি (বিশেষ করে শেয়ার ও আর্থিক বাজার সংক্রান্ত) এবং বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থার সঙ্গো ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থার যোগাযোগ সম্পর্কে কী জানা যায় ?

3. এই অনুচ্ছেদে ‘নাসদাক’ উদ্বোধনের ঘটনাকে এক বিশেষ অনুষ্ঠান হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তুমি কি এমন কোনো অনুষ্ঠান বা প্রথা সম্পর্কে জান যা অন্য ধরনের বাজারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ?

বিশ্বায়নের অন্তর্গত শুধুমাত্র অর্থ বা জিনিসপত্রই থাকে না, এর মধ্যে থাকে জনসাধারণ, সাংস্কৃতিক উপাদান এবং এমন সব ধারণা যা বিশ্বজুড়ে পরিচালিত হয়। পারস্পরিক বিনিময়ের এই ধরনের নতুন পন্থা নতুন বাজারের নির্মাণ করে। যেসব পণ্য, পরিষেবা এবং সাংস্কৃতিক উপাদান প্রথমদিকে বাজার ব্যবস্থার বহির্ভূত ছিল, তা এখন বাজারের অংশে পরিণত হয়।

যখন বাজার একটি পণ্যে পরিণত হয় ঃ পুষ্করে উটের মেলা

বাক্স 4.4

"কার্তিক মাসের শুরুতেই ... উট চালকেরা মরুভূমির জাহাজগুলিকে সুসজ্জিত করে ফেলে এবং কার্তিক পূর্ণিমার মেলায় যোগদান করার জন্য পুষ্করের দীর্ঘ যাত্রার জন্য তৈরি হয় ... এখানে প্রত্যেক বছর প্রায় 200,000 লোক তাদের প্রায় 50,000 উট ও গবাদি পশু নিয়ে একত্রিত হয়। ওই জায়গাটি অসাধারণ সব রঙ, শব্দ ও মানুষের চলাচলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। সঙ্গীত শিল্পী, সাধুসন্ত, পর্যটক, ব্যবসায়ী, পশু ও ভক্ত সবাই এক জায়গায় একত্রিত হয়। একদিক থেকে দেখতে গেলে, এটা উটের সাজগোজের অনুষ্ঠান যেখানে উটের চুলে সুন্দর করে বেনুনী বাঁধা হয়, তাদের নুপূর, পমপম ও বিভিন্ন অলঙ্কার দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়।

উটের মেলার পাশাপাশি সেখানে সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন জংলী যাদু, মন্ত্রপাঠ ও মিছিল চলে, কার্তিক পূর্ণিমার শেষ রাতে হাজার হাজার পূণ্যার্থী তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য জলে ডুব দেয় এবং সেই পবিত্র জলে প্রদীপ ভাসিয়ে দেয়।"

(From the Lonely Planet *tourist guidebook for* India, *11th edition)*

বাক্স 4.4 এর অনুশীলনী

বাক্স 4.4-এ দেওয়া অংশটিকে পড়ো। এটি বিদেশি পর্যটকদের জন্য লেখা এক ভ্রমণ বই থেকে নেওয়া হয়েছে। এই পরিচ্ছেদটি বর্ণনা করে যে, কীভাবে একটি ঐতিহ্যবাহী বার্ষিক গবাদি পশুর বাজার এবং পুষ্করের মেলা অন্য একটি বাজারে বিক্রি করা পণ্যে পরিণত হয়। এই ক্ষেত্রে এটি পর্যটকদের বাজারে পরিণত হয়। প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার আগে শ্রেণিকক্ষে এই অনুচ্ছেদটি আলোচনা কর ঃ

পুষ্করের মেলায় গবাদি পশুর বাজার

1. পুষ্কর আন্তর্জাতিক পর্যটনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই জায়গায় কী নতুন জিনিস, সুবিধা, পুঁজি ও মানুষের পরিসীমার উন্নতি হয়েছে?
2. তোমার মতে পুষ্করে প্রচুর সংখ্যক ভারতীয় এবং বিদেশি পর্যটকের আগমণের ফলে এই মেলা পরিচালনায় কী পরিবর্তন হয়েছে?
3. এই জায়গার 'ধার্মিকতা' কীভাবে এই বাজারের গুরুত্বকে বাড়ায়?
4. তোমরা এমন আরও উদাহরণের কথা চিন্তা করতেপার যেখানে ধর্ম, ঐতিহ্য, জ্ঞান অথবা ছবি (যেমন, রাজস্থানী মহিলাদের প্রথাগত পোশাক) আন্তর্জাতিক বাজারের পণ্যে পরিণত হয়েছে?

এর একটি উদাহরণ হল ভারতীয় অধ্যাত্মিকতা ও জ্ঞানের (বিশেষকরে ‘ যোগ’ এবং ‘আয়ুর্বেদ’) পশ্চিমে বাজারীকরণ। আন্তর্জাতিক পর্যটন ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি এটা প্রদর্শন করে যে কীভাবে সংস্কৃতি নিজেই একটি পণ্যে পরিণত হয়েছে। এর একটি উদাহরণ হল রাজস্থানের পুষ্করের বিখ্যাত বার্ষিক মেলা যারমধ্যে দূরদূরান্ত থেকে পশু পালক ও ব্যবসায়ীরা উট বা অন্যান্য পশু সম্পদ ক্রয় ও বিক্রয় করতে একত্রিত হয়। যেখানে স্থানীয় লোকজনদের জন্য পুষ্করের মেলা একটি আর্থ-সামাজিক অনুষ্ঠান, সেখানে আন্তর্জাতিক বাজারেও পর্যটকদের জন্য এটি একটি বিশেষ আকর্ষণ। পুষ্করের এই মেলাটি প্রতি বছর কার্তিক পূর্ণিমার উৎসবের ঠিক আগে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে দেশের নানা প্রান্ত থেকে তীর্থ যাত্রীরা পুষ্করে স্নান করতে আসে। এই কারণেই পুষ্করের বার্ষিক মেলা পর্যটকদের কাছে এত আকর্ষণীয়। এর ফলে হিন্দু তীর্থযাত্রী, উট ব্যবসায়ী এবং বিদেশি পর্যটকরা শুধুমাত্র পশু অথবা টাকাপয়সা বিনিয়োগের জন্যই নয়, বরং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতীক এবং ধার্মিক জ্ঞান আদান প্রদানের জন্যও এখানে একত্রিত হয়।

উদারীকরণের বিতর্ক — বাজার বনাম রাষ্ট্র

ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থার বিশ্বায়ন প্রাথমিক ভাবে উদারীকরণের নীতির কারণে হয়েছে যার সূচনা 1980 -এর শেষে হয়। উদারীকরণের মধ্যে অনেক প্রকারের নীতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন সরকারি ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ (সরকারি কোম্পানিগুলি প্রাইভেট সংস্থার কাছে বিক্রি) ; পুঁজি, শ্রম ও ব্যবসায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ কম হওয়া, বিদেশি দ্রব্যের সহজ আমদানীর জন্য আমদানী শুল্ক কম করা এবং বিদেশি কোম্পানিগুলিকে ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠা করার জন্য সহায়তা করা। এই পরিবর্তনগুলোকে ‘বাজারীকরণ’ ও বলা যায় অর্থাৎ বাজার বা বাজারভিত্তিক প্রক্রিয়াগুলি (সরকারি নিয়ম নীতির পরিবর্তে) সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। এর মধ্যে রয়েছে আর্থিক নিয়ন্ত্রণে ছাড় বা অপসারণ; শিল্পের বেসরকারীকরণ এবং মজুরি ও মূল্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা। যারা এই বাজারীকরণ সমর্থন করে তারা বিশ্বাস করে যে, এই পদক্ষেপগুলি আর্থিক বিকাশ এবং সমৃদ্ধি বর্ধিত করবে কেননা সরকারি সংস্থাগুলির তুলনায় বেসরকারি সংস্থাগুলি বেশি দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে।

উদারীকরণের কার্যক্রমের ফলে যে পরিবর্তন হয়েছিল তা আর্থিক বিকাশকে উদ্দীপিত করে এবং ভারতীয় বাজারকে বিদেশি কোম্পানিগুলির কাছে উন্মুক্ত করে। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে অনেক বিদেশি ব্র্যান্ডের বস্তু ভারতীয় বাজারে বিক্রি হয়, যা পূর্বে এখানে পাওয়া যেত না। মনে করা হয়, বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগের ফলে আর্থিক অগ্রগতি এবং রোজগার ব্যবস্থা বাড়তে পারে। সরকারি কোম্পানিগুলির বেসরকারিকরণের ফলে কর্মদক্ষতা বাড়ে এবং সরকারের উপর চাপ কমে। যাই হোক, উদারীকরণের প্রভাব মিশ্রিত। আবার কেউ কেউ এটাও মনে করেন যে ভারতে উদারীকরণের প্রতিকূল প্রভাব পড়েছে এবং ভবিষ্যতেও তাই হবে — অর্থাৎ সাহায্য ও সুবিধার পরিবর্তে অসুবিধা ও খরচ বৃদ্ধি পাবে। ভারতীয় শ্রম শিল্পের কিছু কিছু ক্ষেত্র (বিশেষ করে সফটওয়ার ও তথ্য প্রযুক্তি) অথবা কৃষি (বিশেষত, মাছ অথবা ফল) সমৃদ্ধ হতে পারে। তারা হয়তো আন্তর্জাতিক বাজার থেকে কিছু মুনাফা প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্র (যেমন, অটোমোবাইল, ইলেকট্রনিক অথবা তৈলবীজ) গভীর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কেননা তা বিদেশি উৎপাদকদের সাথে পাল্লা দিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে উঠতে পারবে না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতীয় কৃষক বর্তমানে অন্যান্য দেশের কৃষকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে কেননা কৃষিজাত উৎপাদনের আমদানি এখন সম্ভব।

পূর্বে ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য মূল্য ও ভুর্তকির দ্বারা বিশ্বের বাজারে সুরক্ষিত ছিল। এই সমর্থনযোগ্য মূল্য কৃষকের ন্যূনতম আমদানিকে সুনিশ্চিত করে কেননা এটা সেই নির্ধারিত মূল্য যা প্রদান করে সরকার কৃষিজাত পণ্য ক্রয় করে থাকে। সরকার কর্তৃক ভুর্তুকি প্রদানের ফলে কৃষিকার্যে ব্যবহৃত পণ্যের মূল্য (যেমন সার, ডিজেল তেল) কম হয়ে যায় কেননা সরকার কিছু কৃষিজাত দ্রব্যের আংশিক মূল্য প্রদান করে। উদারীকরণ বাজারে এই প্রকারের সরকারি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে, অতএব, ভুর্তুকি ও সমর্থনযোগ্য মূল্য হ্রাস করা হয় অথবা অপসারণ করা হয়। এটার অর্থ এই যে, বহু কৃষক কৃষি থেকে তাদের শালীন জীবনযাপন করতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। একইভাবে ছোট কারিগররা বিশ্ব প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় কেননা বিদেশি দ্রব্য এবং ব্র্যান্ড ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করেছে। তবে এরই মধ্যে কিছু এই প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে। বেসরকারীকরণের ফলে সরকারি খাতে লোক নিয়োগ বন্ধ হয়ে যায় অথবা বলা যায় কর্মসংস্থানের অনেক ক্ষতি হয়। এছাড়াও বেসরকারি অসংগঠিত রোজগার বাড়তে থাকে এবং সরকারি সংগঠিত বিভাগে কর্মসংস্থান কম হতে থাকে। এই পরিস্থিতি শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত নয় কারণ, সংগঠিত সংস্থা সাধারণত ভালো অর্থ প্রদান করে থাকে এবং নিয়মিত ও স্থায়ী চাকুরি দেয় (ক্লাস 12 -এর অন্য পাঠ্যবই ‘ভারতের সামাজিক পরিবর্তন এবং উন্নয়ন’-এ কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন এবং শিল্প সংক্রান্ত অধ্যায়গুলো দেখো)।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, সমকালীন ভারতে গ্রামীণ হাট থেকে শুরু করে অপ্রত্যক্ষ (Virtual) স্টক এক্সচেঞ্জের মত বিভিন্ন প্রকার বাজারের বিস্তার রয়েছে। প্রত্যেক বাজার নিজেই এক একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সামাজিক কাঠামো যেমন জাতি এবং শ্রেণির সঙ্গো ভিন্নভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাছাড়া, আমরা শিখেছি যে, বিনিয়োগের শুধুমাত্র আর্থিক গুরুত্বই থাকে না এর সামাজিক ও প্রতীকমূলক গুরুত্বও রয়েছে। এছাড়াও ভারতীয় অর্থনীতিতে উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের ফলে যে পদ্ধতিতে দ্রব্যের এবং পরিষেবার বিনিয়োগ বা সঞ্চালন হয়েছিল তা এখন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে জিনিসপত্র, পরিষেবা, সাংস্কৃতিক প্রতীক, টাকাপয়সা, অন্যান্য সামগ্রী চক্রাকারে ঘুরে - গ্রামের স্থানীয় বাজার থেকে শহরের বা বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কে সঞ্চালিত হয় উদাহরণস্বরূপ নাসদাক। বর্তমান সময়ের দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে এটা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বাজার কীভাবে ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এই ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পরিণাম কী হবে?

প্রশ্নাবলি

1. 'অদৃশ্য হাত' — বলতে কী বোঝায়?
2. বাজারের সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ কিভাবে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন?
3. একটি বাজার— উদাহরণস্বরূপ সাপ্তাহিক গ্রামীণ বাজার কীভাবে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে?
4. জাতি এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ব্যবসার সফলতায় কী অবদান রাখে?
5. উপনিবেশবাদের ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে কী ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়?
6. উদাহরণসহ পণ্যকরণ (Commoditisation)-এর অর্থ ব্যাখ্যা কর।
7. 'মর্যাদার প্রতীক' বলতে কী বোঝ?
8. 'বিশ্বায়ন' এর মধ্যে কী কী প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে?
9. 'উদারীকরণ' বলতে কী বোঝায়?
10. তোমার মতানুসারে উদারীকরণের দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা কী তার বিনিয়োগের মাত্রাকে ছাপিয়ে যাবে? উত্তরের সাপেক্ষে যুক্তি দাও।

REFERENCES

Bayly, C.A. 1983 *Rulers, Townsmen and Bazaars; North Indian Society in the Age of British Expansion, 1770-1870.* Oxford University Press. Delhi.

Durkheim, Emile. 1964 (1933). *The Division of Labour in Society.* Free Press. New York.

Gell, Alfred. 1982. 'The market wheel: symbolic aspects of an Indian tribal market,' *Man (N.S.).* 17(3):470-91.

Hardgrove, Anne. 2004. *Community and Public Culture; The Marwaris in Calcutta.* Oxford University Press. New Delhi.

Malinowski, Bronislaw. 1961 (1921). *Argonauts of the Western Pacific.* E.P. Dutton and Company. New York.

Mauss, Marcel. 1967. *The Gift; Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies.* W.W. Norton & Company. New York.

Polanyi, Karl. 1944. *The Great Transformation.* Beacon Press. Boston.

Rudner, David. 1994. *Caste and Capitalism in Colonial India; The Nattukottai Chettiars.* University of California Press. Berkeley.

Stein, Burton and Subrahmanyam, Sanjay. ed. 1996. *Institutions and Economic Change in South Asia.* Oxford University Press. New Delhi.

Notes

পঞ্চম অধ্যায়

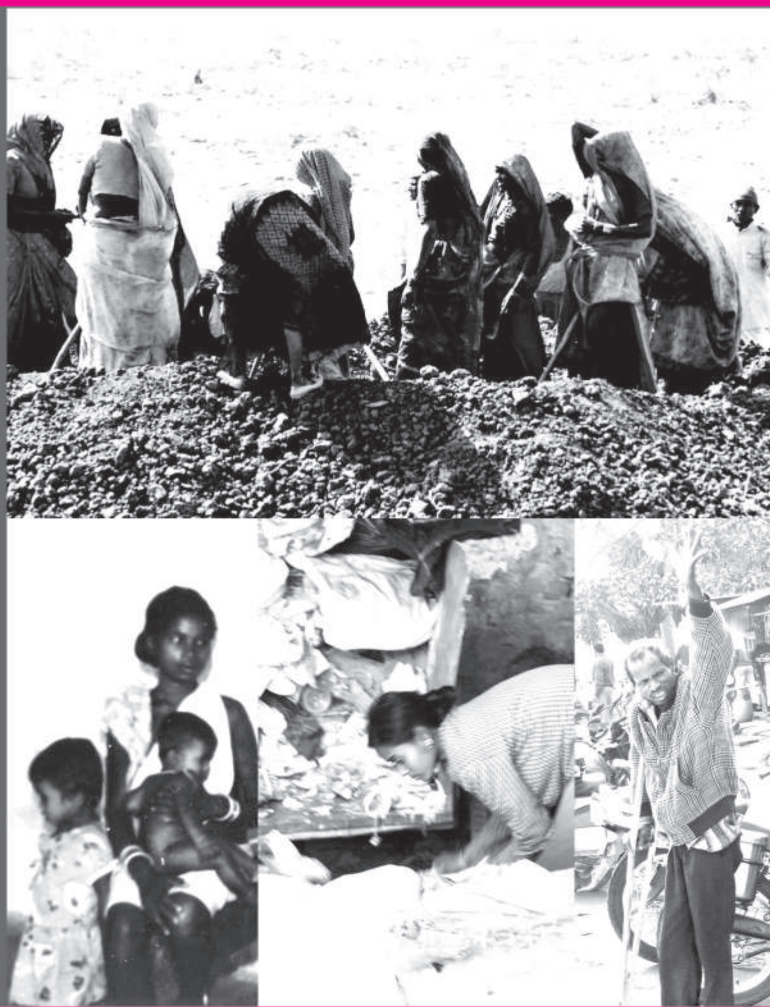

সামাজিক অসাম্য ও বহিষ্কারের নমুনা

পরিবার, জাতি, উপজাতি এবং বাজার এগুলো যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান তা পূর্বের দুই অধ্যায়ে বিবেচিত হয়েছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে, এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্প্রদায় এবং স্থিতিশীল সমাজ গঠনে তাদের ভূমিকার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা এই প্রতিষ্ঠানসমূহের সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিগুলো বিবেচনা করব, যেমন-অসাম্য এবং বহিষ্কারের গঠন ও স্থিতিশীল নিদর্শনে তাদের ভূমিকা।

আমাদের মতো বেশিরভাগ যারা ভারতে জন্মগ্রহণ করেছি এবং বসবাস করছি, সামাজিক অসাম্য এবং বহিষ্কার আমাদের জীবনের এক অন্যতম সত্য। রাস্তায় এবং রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে আমরা ভিখারি দেখি। আমরা দেখি ছোট শিশুরা গৃহপরিচারক/পরিচারিকা, নির্মাণ কাজে সাহায্যকারী, রাস্তার ধারের রেস্তোঁরায় (dhaba) এবং চায়ের দোকানে পরিষ্কারক এবং সাহায্যকারী হিসেবে কর্মরত। আমরা ছোট শিশুদের এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হই না যারা শহরের মধ্যবিত্ত বাড়িতে গৃহ পরিচারক/পরিচারিকার কাজ করে, বড় শিশুদের স্কুলের ব্যাগ বহন করে। এই ঘটনা অন্যায় হিসেবে তৎক্ষণাৎ আমাদের মনে আঘাত করে না যে কিছু শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আমাদের মধ্যে কিছু লোক বিদ্যালয়ে শিশুদের প্রতি জাতিগত বৈষম্য সম্পর্কে পড়েছেন; আবার কিছু লোক সেটার সম্মুখীনও হয়েছেন। অনুরূপভাবে, নারীদের বিরুদ্ধে হিংসা, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং ভিন্নভাবে সক্ষমদের ঘটনা আমরা দৈনন্দিন জীবনে সংবাদ প্রতিবেদনে দেখতে পাই।

সামাজিক অসাম্য এবং বহিষ্কারের এই দৈনন্দিন চর্চা এটাকে প্রায় সাধারণ এবং অনিবার্যরূপে প্রদর্শিত করে তোলে। যদি আমরা কখনো উপলব্ধি করি যে অসাম্য এং বহিষ্কার অনিবার্য নয়, আমরা কিছু অর্থে প্রায়শই এগুলোকে 'যোগ্য' অথবা 'সমর্থনযোগ্য' মনে করি। সম্ভবত, গরিব এবং প্রান্তিকরা (marginalised) যে জায়গায় অবস্থান করছে তার কারণ তাদের সক্ষমতার অভাব অথবা তাদের পরিস্থিতি উন্নত করার জন্য কঠিন পরিশ্রম না করা? এই কারণে আমরা তাদের দোষারোপ করতে পারি — শুধুমাত্র যদি তারা কঠিনতর পরিশ্রম করত এবং অধিকতর বুদ্ধিমান হতো, তাহলে তাদের এমন অবস্থা হতো না।

আরও গভীরভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে যারা সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত তাদের তুলনায় অন্যান্যরা অনেক কঠিন পরিশ্রম করে। দক্ষিণ আমেরিকার একটি প্রবাদে বলা হয় —"যদি কঠিন পরিশ্রম বাস্তবিক রূপে একটি ভালো জিনিস হতো, তাহলে সেটার সবটুকুই ধনীরা নিজেদের জন্য রাখত।" পৃথিবীর সর্বত্রই, পাথর ভাঙা, খনন কার্য, ভারী ওজন বহন, রিক্সা অথবা মালবাহী গাড়ি টানার মতো কঠিন কাজগুলো অপরিবর্তনীয় ভাবে গরিবদের দ্বারা করা হয়। কিন্তু এখনও কদাচিৎ তারা তাদের জীবন সম্ভাবনার উন্নতি করতে পেরেছে। এমন কি আমরা একজন গরিব নির্মাণ শ্রমিককে কমপক্ষে একজন ক্ষুদ্র নির্মাণ ঠিকাদার হয়ে উঠতে কতবার দেখি? এটা শুধুমাত্র সিনেমা বা চলচ্চিত্রে দেখা যায় যে একটি পথশিশু একজন শিল্পপতি হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু সিনেমায় এটাও দেখানো হয় যে এই ধরনের একটি নাটকীয় উত্থানের জন্য অবৈধ অথবা বিবেকবর্জিত পদ্ধতির প্রয়োজন।

কাজ 5.1

তোমার আশেপাশে কিছু ধনী এবং দরিদ্রতম লোককে সনাক্ত কর, যারা তোমার অথবা তোমার পরিবারের সঙ্গে পরিচিত (উদাহরণস্বরূপ, একজন রিক্সাচালক, বা কুলি বা গৃহ পরিচারক/পরিচারিকা এবং একজন সিনেমা হলের মালিক অথবা নির্মাণ ঠিকাদার বা হোটেলের মালিক বা ডাক্তার ... অথবা তোমার ক্ষেত্রে এটা অন্য কিছু হতে পারে)। প্রত্যেক গোষ্ঠীর একজন লোকের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা কর তাদের দৈনন্দিন রুটিন খুঁজে

বের করার জন্য। প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ কাজের দিনের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ — যেমন সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করে একটি সাধারণ ডায়েরির আকারে লিপিবন্ধ কর। এই ডায়েরির উপর ভিত্তি করে এবং তোমার সহপাঠীদের সঙ্গো আলোচনা করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে চেস্টা কর।

➢ এদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রাত্যহিক কত ঘণ্টা কাজের জন্য ব্যয় করে? তারা কী ধরনের কাজ করে — কী উপায়ে তাদের কাজ ক্লান্তিকর, দুঃশ্চিন্তাজনক, আনন্দদায়ক বা অপ্রীতিকর? অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গো তারা কী ধরনের সম্পর্কে জড়িত — তারা কী অন্যদের আদেশ পালন করে নাকি অন্যদের আদেশ দেয়; সহযোগিতা চায়, নিয়মানুবর্তিতার প্রেরণা দেয়? কাজের জন্য যেসব ব্যক্তির সাথে তারা জড়িত ওই ব্যক্তিরা কী তাদের সঙ্গো সম্মানজনক আচরণ করে অথবা তাদের নিজেদেরই কী অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হয়?

এমন হতে পারে, তোমার পরিচিত কোন ব্যক্তি যে দরিদ্র অথবা কিছুক্ষেত্রে সমৃদ্ধশালী, এমন ব্যক্তির বাস্তবে কোন কাজ নেই বা বর্তমানে সে কর্মহীন। যদি এমন হয়, তাহলে এগিয়ে যাও এবং যে কোনওভাবে খুঁজে বের কর তাদের দৈনন্দিন রুটিন। কিন্তু সেই সঙ্গো নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে চেস্টা কর।

➢ ব্যক্তিটি কেন 'বেকার'? সে কী কোন কাজের খোঁজ করছে? সে কীভাবে নিজের ভরণপোষণ চালায়? বস্তুতপক্ষে কোন কাজ না থাকায় তার উপর কী ধরনের প্রভাব পড়ছে? সে যখন কাজ করত সেই সময়ের সঙ্গো তার কর্মহীন জীবনের কোন পার্থক্য আছে কি ?

কাজ **5.1** তোমাকে সাধারণ জ্ঞানের বোধ দিয়ে ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত এই বিষয়ের উপর পুনর্বার চিন্তা করার জন্য আহ্বান করে যে প্রত্যেকে কেবলমাত্র কঠোর পরিশ্রমদ্বারা জীবনে উন্নতি করতে পারে। এটা সত্য যে কঠোর পরিশ্রম এবং ব্যক্তিগত দক্ষতা উভয়ই প্রয়োজন। যদি অন্যান্য সব জিনিষ সমান হয়, তাহলে ব্যক্তিগত প্রচেস্টা, প্রতিভা এবং ভাগ্যই ব্যক্তির মধ্যে সব পার্থক্যের জন্য উত্তরদায়ী। কিন্তু, সবসময়ের মতো, অন্যসব জিনিষ সমান হয় না। এটা অ-ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ভিন্নতা যা সামাজিক অসাম্য এবং বহিষ্কারকে বর্ণনা করে।

5.1 সামাজিক অসাম্য এবং বহিষ্কার কীভাবে সামাজিক?

এই বিভাগে জিজ্ঞেস করা প্রশ্নের তিনটি বিস্তারিত উত্তর হতে পারে যা সংক্ষিপ্তভাবে নিম্ন প্রকারের হতে পারে। প্রথমত, সামাজিক অসাম্য এবং বহিষ্কার ব্যক্তিগত নয় গোষ্ঠীর সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত তাই এটা সামাজিক। দ্বিতীয়ত, এগুলো সামাজিক কেননা এগুলো আর্থিক নয়, যদিও তাদের মধ্যে সাধারণত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের শক্তিশালী সংযোগ রয়েছে। তৃতীয়ত, এগুলো নিয়মানুগ এবং কাঠামোবন্ধ — সেখানে সামাজিক অসাম্যের নির্দিষ্ট নমুনা রয়েছে। 'সামাজিকতার' এই তিনটি বিস্তৃত অর্থ নীচে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা হবে।

সামাজিক অসাম্য

প্রত্যেক সমাজে, কিছু মানুষের কাছে অর্থ, সম্পদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ক্ষমতার মতো মূল্যবান সম্পদের ভাগ অন্যদের তুলনায় বেশি রয়েছে। এই সামাজিক সম্পদকে তিন ধরনের মূলধনে ভাগ করা যেতে পারে।

বস্তুগত সম্পদ এবং আয়ের আকারে অর্থনৈতিক মূলধন, সাংস্কৃতিক মূলধন যেমন, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং মর্যাদা, সামাজিক মূলধরনের আকারে পরিচিতির পরিধি এবং সামাজিক সংস্থা (Bourdieu 1986)। এই তিনটি রূপ বা ধরন প্রায়ই একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে এবং একটি অপরটিতে রূপান্তরিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, খ্যাতনামা (অর্থনৈতিক মূলধন) একজন ব্যক্তির ব্যয়বহুল উচ্চ শিক্ষার সামর্থ থাকতে পারে এবং তাই সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত মূলধন অর্জন করতে পারে। কোন প্রভাবশালী আত্মীয় এবং বন্ধুর (সামাজিক মূলধন) ভালো পরামর্শ, সুপারিশ বা তথ্য দ্বারা ভালো বেতনের চাকরি পেতে সক্ষম হয়।

সামাজিক সম্পদের অসম বণ্টনের নমুনাকে সাধারণত সামাজিক অসাম্য বলা হয়। কিছু সামাজিক অসাম্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সহজাত পার্থক্য প্রতিফলিত করে। উদাহরণস্বরূপ, তাদের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা এবং প্রচেস্টা। কেউ ব্যতিক্রমী বুদ্ধি বা প্রতিভার অধিকারী হতে পারে অথবা তারা সম্পদ এবং মর্যাদা অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। যাই হোক, মোটের উপর, সামাজিক অসাম্য মানুষের মধ্যে সহজাত বা 'প্রাকৃতিক' ভিন্নতার ফলাফল নয়, কিন্তু যে সমাজে তারা বসবাস করে সেই সমাজ দ্বারা সৃষ্ট। যে ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের বিভিন্ন বর্গের মানুষকে সামাজিক স্তরে পর্যায়ক্রমে স্থান দেওয়া হয়, সেই ব্যবস্থাকে সমাজতত্ত্ববিদগণ 'সামাজিক স্তর বিন্যাস' বলে আখ্যায়িত করেন। এই ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাস তখন মানুষের পরিচিতি ও অভিজ্ঞতা, অন্যদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এবং পাশাপাশিভাবে সম্পদ এবং সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রেও তাদের উপলব্ধির আকার দেয়। নিম্নলিখিত তিনটি মূলনীতির সাহায্যে সামাজিক স্তর বিন্যাসকে ব্যাখ্যা করা হয়।

1. *সামাজিক স্তরবিন্যাস শুধুমাত্র একটি স্বতন্ত্র পার্থক্যের কারক নয়, এটি সমাজের বৈশিষ্ট্য।* সামাজিক স্তরবিন্যাস একটি সমাজবাদী প্রক্রিয়া যা সামাজিক সম্পদকে বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের মধ্যে অসমভাবে বিতরণ করে। প্রযুক্তিগতভাবে পিছিয়ে পড়া আদিম সমাজ উদাহরণস্বরূপ শিকারী এবং সংগ্রাহক সমাজে সামান্য উৎপাদনের কারণে শুধুমাত্র প্রাথমিক সামাজিক স্তর বিন্যাসই পরিলক্ষিত হয়। আরও প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত সমাজে যেখানে মানুষ তাদের মৌলিক প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি উৎপাদন করে, তা সত্ত্বেও সামাজিক সম্পদ বিভিন্ন সামাজিক বিভাগে সহজাত পৃথক ক্ষমতা নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে অসমভাবে বণ্টিত।

2. *সামাজিক স্তরবিন্যাস প্রজন্মগতভাবে অব্যাহত।* এটি পরিবার এবং সামাজিক সম্পদের সঙ্গে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্ম পর্যন্ত উত্তরাধিকার সূত্রে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। একজন ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান 'আরোপিত'। অর্থাৎ শিশুরা তারবাবা-মা এর সামাজিক অবস্থান গ্রহণ করে। জাতি ব্যবস্থার অন্তর্গত কোনও ব্যক্তির পেশাগত সুযোগ সেই ব্যক্তির 'জন্ম' এর দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একজন 'দলিত' ব্যক্তির ঐতিহ্যগত পেশা প্রায়শই কৃষি শ্রম, মেথরগিরি অথবা চামড়ার কাজ করার মধ্যেই সীমিত থেকে যায় এবং তার কাছে উচ্চ বেতনের বাবু বা পেশাদারী কাজের সুযোগ সম্ভবত সীমিত থাকে। সামাজিক অসাম্যের এই আরোপিত দৃষ্টিভঙ্গি সমজাতির মধ্যে বিবাহ প্রথার প্রচলনকে আরো দৃঢ় করে তোলে। তাই বিবাহ সাধারণত সমজাতির মধ্যেই সীমাবন্ধ। অর্থাৎ নিম্ন জাতির জাতি - অসবর্ণ বিবাহের সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়।

3. সামাজিক স্তরবিন্যাস বিশ্বাস অথবা ভাবাদর্শের নিদর্শন দ্বারা সমর্থিত। সামাজিক স্তরবিন্যাসের কোন ব্যবস্থাই সম্ভবত প্রজন্মগতভাবে অব্যাহত থাকতে পারে না যতক্ষণ না এটিকে ব্যাপকভাবে ন্যায্য বা অনিবার্য হিসাবে দেখা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, জাতি ব্যবস্থা, জন্ম এবং পেশার ভিত্তিতে 'পবিত্রতা' বা

'অপবিত্রতা'-র ধারণাকে যুক্তিযুক্ত করে। এই ধারণায় ব্রাহ্মণদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং দলিতদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট হিসাবে মনোনীত করা হয়, যদিও প্রত্যেকেই অসাম্যকে বৈধ হিসাবে মনে করেন না। সাধারণত যারা সামাজিকভাবে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত, তারা সামাজিক স্তর বিন্যাসের এই পদ্ধতি, বিশেষ করে জাতি এবং বর্ণের ক্ষেত্রে শক্তিশালী সমর্থন ব্যক্ত করে। যারা এই ক্রমোচ্চ শ্রেণি বিন্যাসের সবচেয়ে নীচে হওয়ায় শোষণ এবং মানহানির অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত তারাই সম্ভবত এটার বিরোধিতা করে থাকে।

আমরা প্রায়শই সামাজিক অসাম্য এবং বহিষ্কারকে পার্থক্যমূলক অর্থনৈতিক সম্পদ রূপেই আলোচনা করি। যদিও এটি শুধুমাত্র আংশিকভাবেই সত্য। লিঙ্গ, নৃজাতি, ভাষা, জাতি এবং অক্ষমতার কারণেই মানুষ প্রায়শই বহিষ্কার ও অসাম্যের সম্মুখীন হয়। এই কারণেই অভিজাত পরিবারে মহিলারাও জনসমাগমস্থলে যৌন হয়রানির শিকার হতে পারে। সংখ্যালঘু ধর্ম বা নৃজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যবিত্ত পেশাদার ব্যক্তিরও মধ্যবিত্ত কলোনি বা মহানগরীতে বাসস্থান খুঁজতে অসুবিধা হতে পারে। মানুষ প্রায়শই অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠী সম্পর্কে পূর্ব ধারণার আশ্রয়ে থাকে। আমরা প্রত্যেকে এক সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে বেড়ে উঠি যেখানে আমরা শুধুমাত্র আমাদের নিজের 'সম্প্রদায়', আমাদের 'জাতি' বা ' শ্রেণি', আমাদের 'লিঙ্গা' সম্পর্কেই নয়, বরং অন্যান্যদের সম্পর্কেও ধারণা অর্জন করি। এই ধারণাগুলি প্রায়শই পূর্ব ধারণাকে প্রতিফলিত করে।

পূর্ব ধারণা বলতে এক গোষ্ঠীর সদস্যের প্রতি অন্যদের পূর্ব কল্পিত অভিমত বা মনোভাবকে বোঝায়। সোজাসুজি বলতে গেলে এই শব্দটির মানে হচ্ছে 'প্রাক্ রায়', অর্থাৎ কোন বিষয়ের সাথে ভালোভাবে পরিচিত হওয়ার আগেই সে বিষয় সম্পর্কে আগাম ধারণা গঠন করা — এই প্রাক্ রায় কোন উপলব্ধ প্রমাণ বিবেচনা করার পূবেই তৈরি হয়ে যায়। একজন পূর্ব ধারণাগ্রস্ত ব্যক্তির পূর্বকল্পিত অভিমত সরাসরি প্রমাণের পরিবর্তে প্রায়ই জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে থাকে এবং নতুন তথ্যের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও সেটাকে গ্রহণ করতে চায় না। পূর্ব ধারণা ইতিবাচক বা নেতিবাচকও হতে পারে। যদিও এই শব্দটি সাধারণত নেতি বাচক প্রাক্ রায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, এটি অনুকূল প্রাক্ রায়েও প্রয়োগ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি তার নিজের জাতি বা গোষ্ঠীর সদস্যের প্রতি পূর্ব ধারণার ভিত্তিতে পক্ষপাত করে থাকে — তাই প্রমাণ ছাড়াই সে বিশ্বাস করে যে অন্য জাতি বা গোষ্ঠীর তুলনায় তার জাতির সদস্যরা শ্রেষ্ঠ।

পূর্ব ধারণা প্রায়ই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের বাঁধাধরা, স্থায়ী ও অনমনীয় বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। নৃজাতীয় এবং জাতিগত গোষ্ঠী ও মহিলাদের উপর প্রায় এই বাঁধাধরা চিন্তাধারা আরোপিত হয়। দেশের মধ্যে বিশেষ করে ভারতে, যারা দীর্ঘদিন উপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ বাঁধাধরা চিন্তাধারা আংশিক উপনিবেশিক সৃষ্ট। যেমন কিছু সম্প্রদায় 'যোদ্ধা প্রজাতি' বলে গণ্য হতো অন্যরা দুর্বল এবং ভীরু, আবার কয়েকটি সম্প্রদায়কে অবিশ্বস্ত বলে মনে করা হতো। ইংরেজি ও ভারতীয় উভয় উপন্যাসে আমরা প্রায়ই এমন চরিত্রের মানুষ দেখতে পাই যাদের 'অলস' অথবা 'ধূর্ত' আখ্যা দেওয়া হয়। এটা সত্য যে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কখনো কখনো অলস, সাহসী কিংবা ভীরু হতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে এই বিবৃতিগুলো সবার ক্ষেত্রেই প্রাযোজ্য। তবে এই ধারণাগুলো সবার ক্ষেত্রে সবসময় সত্য নাও হতে পারে — যেমন একই ব্যক্তি কোন এক সময় কর্মঠ, আবার আরেক সময় আলস্যপূর্ণ ব্যবহার করতে পারে। বাঁধাধরা চিন্তাধারার ফলে গোষ্ঠীগুলো একক ও সমজাতীয় গোষ্ঠীতে শ্রেণিবদ্ধ হয়ে যায়। এই বাঁধাধরা চিন্তাধারা কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ে পরিলক্ষিত 'ব্যতিক্রম'কে স্বীকার করতে চায় না। এটি সম্পূর্ণ গোষ্ঠীকে এমন একজন ব্যক্তি রূপে দেখে যার মধ্যে শুধু এক ধরনের বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ বিদ্যমান।

কাজ 5.2

- ‘পূর্ব ধারণা’র আচরণের উদাহরণ চলচ্চিত্র বা উপন্যাস থেকে সংগ্রহ করো।
- তুমি এবং তোমার সহপাঠীরা একত্রিত হয়ে সংগৃহীত উদাহরণগুলো আলোচনা করো। কোন সামাজিক গোষ্ঠীর আচার-আচরণের মাধ্যমে পূর্ব ধারণা কীভাবে প্রতিফলিত হয়? তোমরা এটা কীভাবে বুঝতে পার যে একটি বিবরণে ‘পূর্বধারণা’ নিহিত রয়েছে কিনা?
- তুমি কি অভিপ্রেত পূর্বধারণা — যেমন কোন চলচ্চিত্রে লেখক বা পরিচালক কিছু ঘটনাবলীকে পূর্বধারণা বলে দেখাতে চাইছেন এবং অনভিপ্রেত ও অচেতন পূর্বধারণার মধ্যে পার্থক্য করতে পারো?

যেভাবে ‘পূর্বধারণা’ কোন ব্যক্তির মনোভাব এবং মতামত ব্যক্ত করে থাকে, আরেকদিকে ‘বৈষম্য’ অন্য গোষ্ঠী বা ব্যক্তির প্রতি প্রকৃত আচরণকে বোঝায়। বৈষম্য এমন সব আচরণে পরিলক্ষিত হতে পারে যেখানে এক গোষ্ঠীর সদস্যদের অযোগ্য বলে ধরা হয় অথচ অন্যান্য গোষ্ঠীদের সুযোগ দেওয়া হয়, অথবা যখন একজন ব্যক্তি তার লিঙ্গ বা ধর্মের কারণে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়। বৈষম্য প্রমাণ করা খুবই কঠিন কেননা এটা প্রকাশ করা বা স্পষ্টভাবে বলা নাও যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ বা অনুশীলনের পিছনে ‘পূর্বধারণা’ ছাড়া আরও বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে যা এইসব আচরণকে যুক্তিসঙ্গত বলে উত্থাপিত করে। উদাহরণ স্বরূপ, কোন ব্যক্তি যে তার জাতের কারণে চাকরি থেকে বহিষ্কৃত, তাকে বলা হতে পারে সে অন্যদের তুলনায় কম শিক্ষিত, বা চাকুরিপ্রাপ্ত প্রার্থী নির্ণয় পুরোপুরি মেধার উপর ভিত্তি করে হয়েছে।

সামাজিক বহিষ্কার

সামাজিক বহিষ্কার বলতে এই পদ্ধতিকে বোঝায় যার দ্বারা ব্যক্তিকে বৃহৎ সমাজের সঙ্গে জড়িত থাকার পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। এটি ঐসব কারণের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করে যার দ্বারা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে এমন কিছু সুযোগ সুবিধা থেকে বিরত রাখা হয় যা অধিকাংশ জনসংখ্যার জন্য খোলা থাকে। একটি পূর্ণ ও সচ্ছল জীবন যাপনের জন্য, ব্যক্তির শুধুমাত্র খাবার, পোশাক আর নিজের বাড়িই নয়, তার সাথে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং সেবা যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত, বীমা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং পুলিশ বা আইন ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকারও প্রয়োজন। সামাজিক বহিষ্কার আকস্মিক নয় কিন্তু নিয়মানুগ — এটি সমাজের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের ফল।

এই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক যে, সামাজিক বহিষ্কার অনৈচ্ছিক — বর্হিভূতদের ইচ্ছা অগ্রাহ্য করে তাদের বহিষ্কার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ধনী লোকদের কখনো ফুটপাতে অথবা সেতুর নীচে ঘুমাতে দেখা যায় না যেখানে শহর এবং শহরতলীর হাজার হাজার গৃহহীন দরিদ্র মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। এটার অর্থ তা বোঝায় না যে ধনীরা ফুটপাত অথবা পার্কের বেঞ্চে প্রবেশ থেকে ‘বর্হিভূত’, কারণ যদি তারা চায় অবশ্যই সেখানে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু তারা এটা নির্বাচন করে না। সামাজিক বহিষ্কার কখনো কখনো কিছু যুক্তিবিদ্যা দ্বারা ভুলভাবে বিচার করা হয় — এটা বলা হয় যে বহির্ভূত গোষ্ঠী নিজেরাই অংশীদার হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে না। এই তর্কের সত্যতা এই যে, কোন কিছু কাম্যকে ‘বহিষ্কার’ প্রতিহিত করে (স্পষ্ট অকাম্য থেকে ভিন্ন, যেমন- ফুটপাতে ঘুমানো)।

বৈষম্য বা অপমানজনক আচরণের দীর্ঘমেয়াদী অভিজ্ঞতা প্রায়ই বহিষ্কৃতদের ক্ষেত্রে এমন এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যার কারণে তারা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রচেস্টা বন্ধ করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চ শ্রেণির হিন্দু সম্প্রদায় প্রায়ই নীচু জাতি বিশেষ করে দলিতদের মন্দিরে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এই ধরনের আচরণের ফলে কিছু দশক পরে দলিতরা নিজেদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, অথবা অন্য ধর্মে যেমন বৌদ্ধ, খ্রিস্ট বা ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়।

তারা এটা করার পরে, হিন্দু মন্দির বা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ইচ্ছা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, সামাজিক বহিষ্কার বিদ্যমান নয়। এর অর্থ হল সামাজিক বহিষ্কার ইচ্ছা বহির্ভূতভাবে ঘটে থাকে।

বিভিন্ন সমাজের ন্যায় ভারতেও, সামাজিক অসাম্য এবং বহিষ্কারের তীব্র প্রচলন চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে জাতি, লিঙ্গ এবং ধর্মীয় অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে উঠে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনো 'পূর্বধারণা' রয়ে গেছে, এবং প্রায়ই এই প্রকার নতুন ধারণার উত্থান হয়। তাই শুধুমাত্র আইনকানুন প্রয়োগ করে সামাজিক রূপান্তর বা স্থায়ী সামাজিক পরিবর্তনের চেষ্টা করা ব্যর্থ। বাস্তবে তা দমন করার জন্য সচেতন এবং সংবেদনশীল নিয়ত স্থায়ী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

তোমরা ইতিমধ্যেই ভারতীয় সমাজে উপনিবেশবাদের প্রভাব সম্পর্কে জেনেছ। ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাজ্যের হাতে অধিকৃত হয় তখন ভারতবাসী অসাম্য ও বহিষ্কারের ধরন পুরোপুরি বুঝতে পারে যেখানে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত বা অভিজাত ভারতীয়রাও বাদ যায় না। এই প্রকারের অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে বৈষম্যের শিকার বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী, বিশেষ করে মহিলা, দলিত এবং বিভিন্ন নিপীড়িত জাতি ও উপজাতি ইত্যাদির জন্য সাধারণ বিষয় ছিল। উপনিবেশিক শাসনের মানহানিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে এবং গণতন্ত্র ও বিচারের উন্মুক্ত ধারণার সঙ্গো পরিচিত হওয়ার পর ভারতীয়রা একযোগে ব্যাপক সংখ্যায় সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু করে ও অংশগ্রহণ করে।

এই অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন গোষ্ঠী যারা ব্যাপক সামাজিক অসাম্য এবং বহিষ্কারের শিকার হয়েছিল, বিশেষ করে দলিত এবং পূর্ব অস্পৃশ্য জাতি; উপজাতি আদিবাসী বা সম্প্রদায়, মহিলা এবং ভিন্নভাবে সক্ষমদের সম্পর্কে আলোচনা করবো। নিম্নলিখিতভাবে আমরা তাদের সংগ্রাম এবং কৃতিত্বের কাহিনি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস করবো।

5.2 জাতি এবং উপজাতি — অসাম্যকে ন্যায্য ও চিরস্থায়ী করে তোলার পদ্ধতি

জাতি ব্যবস্থা একটি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা

স্বতন্ত্র ভারতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানে জাতি ব্যবস্থা একটি পদ্ধতি যা নির্দিষ্ট জাতিতে জন্মগ্রহণ করা মানুষের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবহারকে আইনসম্মত এবং জোরদার করে। এই বৈষম্যমূলক আচরণ অপমানজনক, বর্জনীয় এবং শোষণমূলক।

ঐতিহাসিকভাবে, জাতি ব্যবস্থায় মানুষকে তার পেশা এবং অবস্থার ভিত্তিতে ভাগ করা হতো। প্রত্যেক জাতি একটি পেশার সঙ্গো যুক্ত ছিল, যার অর্থ এটা যে একটি নির্দিষ্ট জাতিতে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি ওই পেশায় 'জন্মগ্রহণ' করে যা তার জাতির সঙ্গো যুক্ত — সেক্ষেত্রে তার অন্য কোনো পছন্দ থাকত না। উপরন্তু, সম্ভবত খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রত্যেক জাতি সামাজিক অবস্থার অনুক্রম হিসাবে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকত, তাই কঠোরভাবে বলা যায়, সামাজিক অবস্থা শুধুমাত্র পেশাগত শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ নয় বরং প্রত্যেক বৃহৎ পেশাগত শ্রেণীতে অধিকতর স্থান পায়। কঠোর শাস্ত্রসম্মত অর্থে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা চূড়ান্তভাবে একে অপরের থেকে ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, ব্রাহ্মণরা শাস্ত্রীয়ভাবে উঁচু জাতি, কিন্তু খুব বেশি সম্পদের অধিকারী ছিল না এবং ক্ষত্রিয় রাজা বা শাসকদের ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষমতার অধীনস্থ ছিল।

অন্যদিকে, উচ্চ অসাম্প্রদায়িক বা ধর্ম নিরপেক্ষ এবং ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও, রাজা শাস্ত্র ধর্মীয় পরিমণ্ডলে ব্রাহ্মণদের অধীনস্থ ছিল (বাক্স 5.1 এ পৃথকীকরণ ব্যবস্থার সঙ্গো এটির তুলনা কর)।

যাই হোক, বাস্তব ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা পরস্পর যুক্ত মনে হয়। তাই সামাজিক (যেমন, জাতি) মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক মর্যাদা পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত — 'উচ্চ' জাতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয়ভাবে উচ্চ অর্থনৈতিক অবস্থায় রয়েছে, যেখানে 'নীচু' জাতি প্রায় সবসময়ই নিম্ন অর্থনৈতিক অবস্থায় স্থান করে আছে। আধুনিক সময়ে এবং বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতি এবং পেশার মধ্যে সংযোগ অনেক নমনীয় হয়ে যায়। পেশাগত পরিবর্তনে আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা বর্তমানে সহজেই আরোপ করা হয় না এবং একজনের পেশাগত পরিবর্তন পূর্বের তুলনায় অনেক সহজ হয়ে যায়। উপরন্তু, একশো বা পঞ্চাশ বছর পূর্বের সময়ের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে বর্তমানে জাতি এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পর্ক আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে এখন প্রত্যেক জাতিতে ধনী এবং দরিদ্র ব্যক্তি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু মূল বক্তব্য হল বৃহত্তর ক্ষেত্রে জাতি -শ্রেণি সম্পর্ক এখনও লক্ষণীয়। এই ব্যবস্থা আরও নমনীয় হওয়ার ফলে, যেসব জাতি একই ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদার অন্তর্গত ছিল, তাদের মধ্যে বিদ্যমান প্রভেদ দুর্বল হয়ে পড়ে। তথাপি, সামাজিক অর্থনৈতিক শ্রেণিবন্ধনের মধ্যে বিভিন্ন প্রভেদ এখনও বিদ্যমান।

যদিও জাতি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত, কিন্তু বৃহত্তর ক্ষেত্রে তা বেশি পরিবর্তিত হয়নি। এটি এখনও সত্য যে সমাজের বিশেষ সুবিধা বা অধিকারপ্রাপ্ত (এবং উচ্চ অর্থনৈতিক মর্যাদা) বিভাগেই 'উচ্চ' জাতি হয়ে ওঠার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে, অনুন্নত (এবং নিম্ন অর্থনৈতিক মর্যাদা সম্পন্ন) বিভাগ তথাকথিত 'নিম্ন' জাতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাছাড়া, দরিদ্র সীমায় বসবাসকরছে এমন জনসংখ্যার অনুপাত অথবা সমৃদ্ধশালী জনসংখ্যার অনুপাত অথবা সমৃদ্ধশালী জনসংখ্যা জাতি গোষ্ঠী অনুসারে পৃথক বলে লক্ষ্য করা যায়। (1 এবং 2 নং টেবিল দেখ) সংক্ষেপে বলতে গেলে, যদিও সামাজিক আন্দোলন দ্বারা ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে তা সত্ত্বেও যোগাযোগ মাধ্যমের পরিবর্তন, রাষ্ট্র দ্বারা স্বতন্ত্র ভারতের জনগণের ভূমিকাকে দমন করার বিভিন্ন প্রয়াস এবং অব্যাহত জাতি বৈষম্যতা আজও ভারতীয় জীবনধারাকে প্রভাবিত করতে থাকে।

বাক্স 5.1

বর্ণ এবং জাতি : একটি সংমিশ্রিত সাংস্কৃতিক তুলনা

ভারতবর্ষে জাতির মতো, দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজে বর্ণের ভিত্তিতে স্তরীকৃত ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। প্রায় সাতজন দক্ষিণ আফ্রিকানের মধ্যে একজন ইউরোপীয় বংশের, তা সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গারা ক্ষমতা এবং সম্পদের প্রধান অধিকারী। ডাচ্ ব্যবসায়ীরা সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ব্রিটিশ উপনিবেশ দ্বারা তাদের উত্তরসূরীদের অন্তর্দেশে প্রেরণ করা হয়। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ব্রিটিশরা ইউনিয়ন এবং পরে দক্ষিণ আফ্রিকার গণতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ আয়ত্ব করে।

তাদের রাজনৈতিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করার জন্য, সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গারা 'জাতি বিদ্বেষ' বা 'বর্ণের পৃথকীকরণ' নীতি উন্নীত করে। বহু বছর পর্যন্ত এটি একটি অবিধিবদ্ধ প্রথা ছিল। পরে 1948 সালে এটি জাতিবিদ্বেষী আইনে পরিণত হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দক্ষিণ আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গাদের নাগরিকত্ব, জমির মালিকানা এবং সরকারে বিধিবদ্ধ কণ্ঠস্বরকে প্রত্যাখ্যান করে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে বর্ণের ভিত্তিতে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় এবং মিশ্র বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়। বর্ণভিত্তিক জাতি হিসাবে কৃষ্ণাঙ্গাদের কম মাইনের চাকরি প্রদান করা হতো; তারা শ্বেতাঙ্গাদের আয়ের কেবল এক-চতুর্থাংশই উপার্জন করতে পারতো। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গাদের বলপূর্বক 'বাসস্থান' বা 'আবাস ভূমিতে' স্থানান্তর করাহয় — সেগুলো নোংরা দরিদ্র জেলা যেখানে কোনো পরিকাঠামো বা কারখানা বা চাকুরি ছিল না। সেই সমগ্র আবাসভূমি একত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার মাত্র চৌদ্দ শতাংশ জমির অংশ, যেখানে দেশের জনসংখ্যা 80 শতাংশ কৃষ্ণবর্ণ লোকের বসবাস ছিল।

ফলস্বরূপ, অনাহার এবং কষ্টভোগ তীব্র এবং ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সংক্ষেপে, আফ্রিকার জমিতে ব্যাপক প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন হীরা, মূল্যবান খনিজ পদার্থ ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও সেখানকার বেশিরভাগ মানুষ দারিদ্র্যের জীবনযাপন করত।

সমৃদ্ধশালী সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গারা কৃষ্ণবর্ণদের সামাজিকভাবে হীন দেখানোর মাধ্যমে তাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধাগুলোকে রক্ষা করেছিল। যা হোক, কৃষ্ণাঙ্গাদের উপর তারা তাদের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য সেনাবাহিনীর দমনমূলক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল। কৃষ্ণবর্ণের বিক্ষোভকারীদের নিয়মিতভবে জেলে বন্দি করে নির্যাতন ও হত্যা করা হতো। এই সন্ত্রাসের রাজত্ব সত্ত্বেও কৃষ্ণাঙ্গারা কয়েক দশক পর্যন্ত সম্মিলিতভাবে আফ্রিকার ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং নেলসন মেন্ডেলার নেতৃত্বে লড়াই করে ও পরিশেষে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 1994 সালে সরকার গঠন করে। যদিও 'পূর্ব জাতিবিদ্বেষী' দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন সংবিধানে বর্ণবৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়, তথাপি অর্থনৈতিক পুঁজি এখনো শ্বেতাঙ্গাদের হাতে কেন্দ্রীভূত থেকে যায়। নতুন সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গাদের ক্ষমতায়ন প্রতিনিয়ত একটি চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়।

"আমি শ্বেতাঙ্গাদের কতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি এবং আমি কৃষাঙ্গাদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করেছি। আমি গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মুক্ত সমাজের ধারণা পোষণ করি যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি সঙ্গাতি এবং সমান সুযোগ সুবিধার সঙ্গো একসাথে বসবাস করবে। এটি এমন একটি আদর্শ যার জন্য আমি বেঁচে থাকার এবং তা অর্জন করার প্রত্যাশা রাখি। কিন্তু প্রয়োজনে, এই আদর্শের জন্য আমি মরতেও প্রস্তুত।"

টেবিল 1ঃ দরিদ্র সীমার নিচে বাস করা জনসংখ্যার শতকরা অনুপাত 2011–12

জাতি এবং সম্প্রদায় গোষ্ঠী	গ্রামীণ ভারত প্রত্যেক ব্যক্তি পিছু প্রতি মাসে 327 টাকা বা তার কম খরচ	নগরীয় ভারত প্রত্যেক ব্যক্তি পিছু প্রতিমাসে 454 টাকা বা তার কম খরচ
তপশিলি উপজাতি	45.3	24.1
তপশিলি জাতি	31.5	21.7
অন্যান্য অনগ্রসর জাতি	22.7	15.4
উচ্চ জাতির মুসলিম	26.9	22.1
উচ্চ জাতির হিন্দু	25.6	12.1
উচ্চ জাতির খ্রিস্টান	22.2	05.5
উচ্চ জাতির শিখ	06.2	05.0
সকল গোষ্ঠী	25.4	13.7

Source: Report of NITI Aayog, 2014

টেবিল 2 ঃ সমৃদ্ধশালী জনসংখ্যার শতকরা অনুপাত 1999–2000

জাতি এবং সম্প্রদায় গোষ্ঠী	গ্রামীণ ভারত প্রত্যেক ব্যক্তি পিছু প্রতি মাসে 1000 টাকা বা তার কম খরচ	নগরীয় ভারত প্রত্যেক ব্যক্তি পিছু প্রতি মাসে 2000 টাকা বা তার কম খরচ
তপশিলি উপজাতি	1.4	1.8
তপশিলি জাতি	1.7	0.8
অন্যান্য অনগ্রসর জাতি	3.3	2.0
উচ্চ জাতির মুসলিম	2.0	1.6
উচ্চ জাতির হিন্দু	8.6	8.2
উচ্চ জাতির খ্রিস্টান	18.9	17.0
উচ্চ জাতির শিখ	31.7	15.1
উচ্চ জাতির অন্যান্যরা	17.9	14.4
সকল গোষ্ঠী	4.3	4.5

Source: Computed from NSSO 55th Round (1999-2000) unit-level data on CD

টেবিল 1 এবং 2 -এর অনুশীলনী

টেবিল 1 -এ প্রত্যেক জাতি সম্প্রদায় যারা সরকারিভাবে 1999- 2000 সালে 'দারিদ্র্যসীমার নীচে' বসবাস করে তার শতকরা অনুপাত দেখানো হয়েছে। সেখানে গ্রামীণ ও নগরীয় ভারতের পৃথক স্তম্ভ দেওয়া হয়েছে।

টেবিল 2 -এ অনুরূপভাবে একই পদ্ধতিতে দরিদ্রের পরিবর্তে সমৃদ্ধশীল জনসংখ্যার অনুপাত দেখানো হয়েছে। 'সমৃদ্ধশীল'কে গ্রামীণ ভারতে প্রত্যেক ব্যক্তি পিছু ব্যয়িত অর্থ 1000 টাকা এবং নগরীয় ভারতের 2000 টাকা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এটি পাঁচ ব্যক্তির একটি পরিবারের প্রতি মাসের খরচ গ্রামীণ ভারতে 5000 টাকা এবং নগরীয় ভারতে প্রতিমাসে 10,000 টাকার সমতুল্য। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার আগে টেবিলগুলো ভালো করে লক্ষ্য করো।

1. ভারতে জনসংখ্যার কত শতাংশ দরিদ্র সীমার নীচে (অ) গ্রামীণ ভারতে এবং (আ) নগরীয় ভারতে বসবাস করে?

2. কোন্ জাতি/সম্প্রদায় গোষ্ঠীর সদস্যদের সর্বোচ্চ অনুপাত (অ) গ্রামীণ ও (আ) নগরীয় ভারতে

   চরম দারিদ্র্যসীমায় বসবাস করে? কোন্ জাতি/সম্প্রদায়ের সর্বনিম্ন জনসংখ্যার হার দারিদ্র্যতার সঙ্গে জীবন যাপন করে?

3. প্রতিটি নিম্নতর জাতির (SC, ST, OBC) জন্য দারিদ্র্যের শতাংশ জাতীয় গড়ের তুলনায় মোটামুটি কতগুণ বেশি? এখানে গ্রামীণ এবং শহরের / নগরের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে কি?

4. কোন্ জাতি/সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার সর্বনিম্ন শতাংশ যথাক্রমে গ্রামীণ এবং শহুরে/নগরীয় ভারতে সমৃদ্ধশালীভাবে বসবাস করে?

5. সমৃদ্ধশালী 'উঁচু' জাতির হিন্দু জনসংখ্যা 'নীচু' জাতির সংখ্যা থেকে মোটামুটি কতগুণ বেশি?

6. এই টেবিলগুলো OBC দের আপেক্ষিক অবস্থান সম্পর্কে কি ধারণা প্রদান করে? এখানে গ্রামীণ এবং শহুরে/নগরের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে কি?

অস্পৃশ্যতা

'অস্পৃশ্যতা' জাতি ব্যবস্থায় এক চূড়ান্ত এবং বিশেষব্যাধিযুক্ত দৃষ্টিকোণ। এটি 'পবিত্র -অপবিত্র' মানদণ্ডের সর্বনিম্ন স্তরে থাকা নিম্ন জাতির সদস্যদের বিরুদ্ধে কঠোর সামাজিক নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে। কঠোরভাবে বলতে গেলে, 'অস্পৃশ্য' জাতির সদস্যরা জাতি পর্যায়ক্রমের বাইরে অবস্থানরত --- তাদের 'অপবিত্র' বলে গণ্য করা হয় এবং তাদের স্পর্শ অন্য জাতির সদস্যকেও অপবিত্র করে দেয়। তাই এইরূপ ঘটনা ঘটলে অস্পৃশ্যদের ভয়ঙ্কর শাস্তি দেওয়া হতো এবং সেই অন্য জাতির সদস্যটিকে বিশদ শুদ্ধিকরণের ক্রিয়াকলাপ করতে বাধ্য করা হতো। এটা সত্য যে 'দর্শনেই অপবিত্রতা' (Distance Pllution) ধারণাটি ভারতের বহু অঞ্চলে প্রচলিত ছিল (বিশেষকরে দক্ষিণে) যেমন ঃ শুধুমাত্র অস্পৃশ্য ব্যক্তির উপস্থিতি বা ছায়াকেও অপবিত্র বলে ধরা হতো। এই শব্দের আক্ষরিক অর্থের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও 'অস্পৃশ্যতা' শব্দের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ শুধু শারীরিক স্পর্শে নিষেধাজ্ঞা বা পরিহার নির্দেশ করে না, কিন্তু সামাজিক নিষেধাজ্ঞা এক বৃহত্তর কার্যক্রমও নির্দেশ করে।

অস্পৃশ্যতার এই ঘটনাকে সংজ্ঞায়িত করতে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হল অস্পৃশ্যতার তিনটি মূল দিক --- বহিষ্কার, অবমাননা - অধীনতা এবং শোষণ। যদিও অন্য (অর্থাৎ 'স্পৃশ্য') নিম্ন জাতিরাও অধীনতা এবং শোষণের শিকার হয়, কিন্তু তারা অস্পৃশ্যদের মত বহিষ্কৃত হওয়ার চূড়ান্ত অপমান ভোগ করে না। দলিত জাতিরা বহিষ্কারের এমন রূপ অনুভব করে যা অন্য গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল না যেমন পানীয় জলের উৎসের ব্যবহার বা যৌথ ধর্মীয় পূজার্চ্চনা, সামাজিক অনুষ্ঠান ও উৎসবে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা। আবার একই সময়, অস্পৃশ্যতায় হয়তো বা অধীনস্ত ভূমিকায় বলপূর্বক অন্তর্ভুক্তিও হতে পারে, যেমন --- একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোনো অস্পৃশ্য ব্যক্তিকে ড্রাম বাজাতে বাধ্য করা। আত্ম অবমাননা এবং অধীনতা সম্পর্কিত প্রকাশ্য কার্য প্রদর্শন হল অস্পৃশ্যতা প্রথার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এক্ষেত্রে কিছু সাধারণ উদাহরণ হল --- সশ্রদ্ধ বাধ্যতা দেখানোর জন্য কিছু অঙ্গভঙ্গি বা আচরণ চাপিয়ে দেওয়া (যেমন মাথার পাগড়ি খুলে নেওয়া, জুতো হাতে নেওয়া, মাথা নীচু করে দাঁড়ানো, পরিষ্কার বা উজ্জ্বল বা রঙিন বস্ত্র পরিধান না করা ইত্যাদি) ও নিয়মিতভাবে দুর্ব্যবহার এবং অবমাননা সহ্য করা। তাছাড়া, অস্পৃশ্যতা প্রায় সর্বদা ভিন্ন প্রকারের অর্থনৈতিক বঞ্চনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সাধারণত তা করা হয় বলপূর্বক, অবৈতনিক (বা কম বেতনে) শ্রমিক নিয়োগ বা সম্পত্তি দখলের মাধ্যমে।

பெண்கள் பொது நவீன கழிப்பிடம்
மூளிக்குளம்

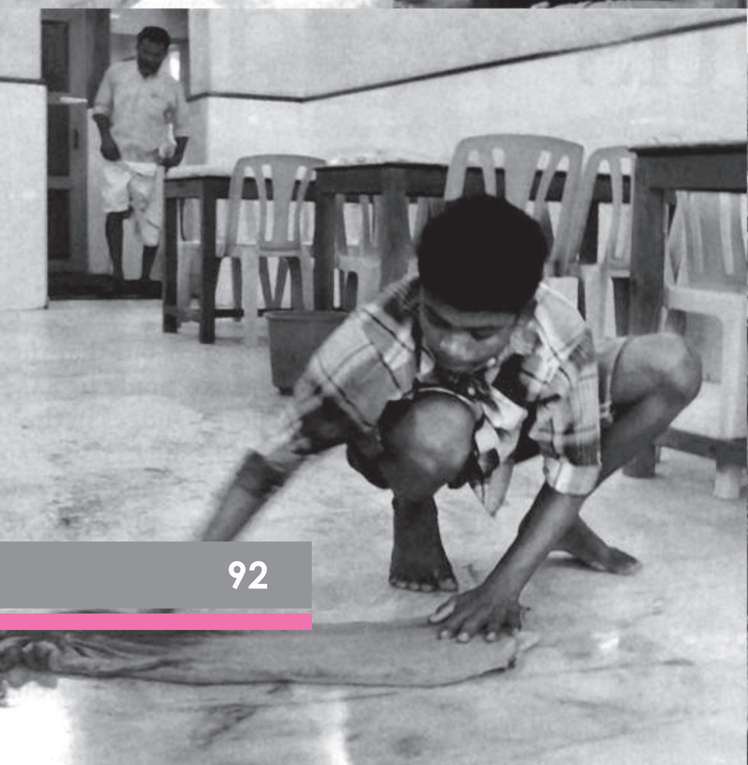

সর্বশেষে, অস্পৃশ্যতা হল এক ভারত-ব্যাপী ঘটনা, যদিও তার নির্দিষ্ট আকার ও প্রবণতা অঞ্চলভিত্তিক এবং সামাজিক ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

একটি দলিত মেথরের প্রতিনিয়ত কঠোর সংগ্রাম

বাক্স 5.2

ভারতের আনুমানিক 8 মিলিয়ন মেথরের মধ্যে নারায়ণাম্মা হল অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত অনন্তপুর পৌরসভার 400 সিট যুক্ত সর্বজনীন শৌচাগারে কর্মরত মেথর। শৌচাগারে জলের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই মহিলাদের শৌচকার্যের পরে নারায়াম্মা এবং তার সহকর্মীদের ঝাড়ু দিয়ে তা পরিষ্কার করতে হয়। শৌচাগারের নোংরা পরে আধা কিলোমিটার দূরে থাকা ট্রাকটর ট্রলিতে (tractor trolley) পৌঁছাতে হয়। এই কাজ প্রায় সকাল 10 টা অবধি চলতে থাকে, তারপর নারায়ণাম্মা স্নান করে ঘরে ফিরে যায়। “এই পৌরসভা, এদিকে এসে পরিষ্কার করো” --- এই ভাবেই রাস্তায় চলার সময়, নারায়ণাম্মা ও তার সহকর্মীদের সম্বোধন করা হয়। তার বক্তব্য, মানুষের এই ব্যবহার তাকে বোধ করায়, যেন তাদের নাম নেই। তাছাড়া তাদের দেখলেই মানুষ নিজেদের নাকে কাপড় দেয় যেন তাদের গায়ে দুর্গন্ধ লেগে রয়েছে। সে আরও জানায় যে, যেহেতু তাদের স্পর্শে অপবিত্রতা ছড়িয়ে পড়ে তাই তাদের পৌরসভার জলের টেপ খোলার জন্য অপেক্ষা করতে হয় বা অন্য কেউ কল চাপ দিলেই তারা জল ভরতে পারে। খুব দুঃখের সাথে সে জানায় যে চায়ের দোকানে তাদের বেঞ্চে বসা নিষেধ; সেজন্য আলাদা মাটিতে বসতে হয়। কিছু সময় পূর্বেও তাদের ব্যবহারের জন্য আলাদা ভাঙা চায়ের পেয়ালার ব্যবস্থা থাকত, যা তারা নিজেরাই পরিষ্কার করে আলাদাভাবে সরিয়ে রাখতে হতো। অনন্তপুর গ্রামের এবং সে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের প্রথার প্রচলন রয়েছে।

Source: Adapted from Mander 2001: 38-39.

বহু শতাব্দী ধরে, তথাকথিত ‘অস্পৃশ্যদের’ বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হতো। ওই সকল নামের বুৎপত্তি যাই হোক না কেন, সবগুলোই ক্ষতিকর এবং চরম মর্যাদাহানির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এটা সত্য যে, আজও সেই নামগুলো ‘গালাগাল’ রূপে ব্যবহৃত হয়, যদিও তার ব্যবহার এখন আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। 1930 সালে, মহাত্মা গান্ধি ‘হরিজন’ (অর্থ ভগবানের সন্তান) শব্দটি জনপ্রিয় করেন, যাতে বিভিন্ন জাতির নামযুক্ত মর্যাদাহানিকর ধারণাগুলোর সম্পূর্ণ বিরোধিতা করতে সক্ষম হন।

তা সত্ত্বেও, পুরাতন অস্পৃশ্য সম্প্রদায়গুলো এবং তাদের নেতারা ‘দলিত’ (Dalit) শব্দটির উদ্ভাবন করে, যা বর্তমানে এই সকল গোষ্ঠীগুলিকে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে সাধারণভবে স্বীকৃত শব্দ। ভারতীয় অর্থে, দলিত শব্দটি সাধারণত নিপীড়িত এবং প্রতারিত মানুষের কথা বোঝায়। যদিও ডঃ আম্বেদকর দ্বারা এই শব্দটি উদ্ভাবিত বা ব্যবহৃত হয়নি, তথাপি এই ধারণাটি তার দর্শন এবং তার নেতৃত্বে সংগঠিত হওয়া ক্ষমতায়নের জন্য আন্দোলনের সঙ্গে নিশ্চিত রূপে অনুসরণ করে। 1970 সালের প্রারম্ভে বোম্বে দাঙ্গার সময় এই ধারণাটির প্রচলনের বিস্তার ঘটে। তাছাড়া পশ্চিম ভারতে ঠিক সে সময় দলিত পান্থার (Dalit Panthers) নামক এক গোড়া গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। তারা এই শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের পরিচিতি প্রমাণ করতে চেস্টা করে যা তাদের অধিকার ও সম্মানের জন্য হওয়া লড়াইয়ের অংশ ছিল।

জাতি এবং উপজাতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য উদ্যোগ

স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই ভারতীয় রাষ্ট্রে উপজাতি এবং তপশিলি জাতিদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম বিদ্যমান। এই কার্যক্রমের অন্তর্গত বহু বছর ধরে নিপীড়িত এবং ঘোষিত হয়ে আসা জাতি ও উপজাতিদের 'তালিকা'ভুক্ত করা হয়, যাতে বলা হয় যে এই জাতি উপজাতিগুলো বিশেষসুবিধা পাওয়ার উপযুক্ত। এই 'তালিকা' 1935 সালে ভারতীয় ব্রিটিশ সরকার দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে, সে সকল নীতি বজায় রাখা হয় এবং পাশাপাশি অনেক নতুন নীতিও যুক্ত হয়। এরই মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যোগদান ছিল 1990 সাল থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য বিশেষ কার্যক্রম।

অতীত এবং বর্তমান জাতি বৈষম্যতাকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র পদক্ষেপ হল 'সংরক্ষণ'। 'সংরক্ষণ' আইনের অন্তর্গত সর্বসাধারণ স্তরে কিছু আসন বা 'সিট' তপশিলি জাতি এবং উপজাতির জন্য আলাদাভাবে রাখা হয় অর্থাৎ 'সংরক্ষিত' করা হয়। এই সংরক্ষণের আওতায় রয়েছে রাজ্য এবং কেন্দ্র বিধানসভা (অর্থাৎ রাজ্য সংসদ, লোকসভা ও রাজ্যসভা) যেখানে কিছু আসন সংরক্ষিত করা থাকে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সকল দফতরে এবং কোম্পানিতে আসন সংরক্ষিত থাকে; তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে। মোট জনসংখ্যায় তপশিলি জাতি ও উপজাতির শতাংশের ভিত্তিতে সমান আসন সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু পিছিয়ে পড়া শ্রেণির ক্ষেত্রে এই অনুপাত ভিন্নভাবে নির্ধারিত হয়। একই নীতি অনুসারে সরকারের অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমও সম্পন্ন করা হয়। এর মধ্যে কিছু কেবলমাত্র তপশিলি জাতি বা উপজাতির জন্য নির্ধারিত থাকে।

জাতি বৈষম্যতা, বিশেষকরে অস্পৃশ্যতাকে নির্মূল করতে, নিষেধাজ্ঞা ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ছাড়াও বহু সংখ্যক আইন পাশ করা হয়েছে। এরই মধ্যে একটি বহুল প্রাচীন আইন হল 1850 সালের জাতিগত অক্ষমতা অপসারণ আইন। এই আইন, ধর্ম ও জাতি পরিবর্তনের ফলে নাগরিকদের অধিকার চ্যুত হওয়ার প্রবণতাকে সংকুচিত করে। সম্প্রতিকালে এই ধরনের আইনের উদাহরণ হল 2005 সালের 'সাংবিধানিক সংশোধন আইন' (93 তম সংশোধন), যা 23 শে জানুয়ারি 2006 সালে আইনরূপে স্বীকৃতি পায়। ঘটনাচক্রে, 1850 সালের আইন ও 2006 সালের সংশোধনী আইন উভয়ই শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তিরানব্বই (93)তম সংশোধনী আইন দ্বারা পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আসন সংরক্ষণ করা হয়, অন্যদিকে 1850 সালের আইন দ্বারা সরকারি বিদ্যালয়ে 'দলিত' জাতির প্রবেশ অনুমোদিত করা হয়েছিল। আরও এমন অসংখ্য আইন রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ভারতের সংবিধান যা 1950 সালে পাশ হয়; এবং 1989 সালের তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতির (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন। ভারতীয় সংবিধান অস্পৃশ্যতার প্রথাকে বিলুপ্ত বা অবসান করে (ধারা 17) এবং উপরে উল্লিখিত সংরক্ষণ নীতির সূচনা করে। 1989 সালের 'অত্যাচার প্রতিরোধ' আইন দলিত এবং আদিবাসীদের বিরুদ্ধে হওয়া হিংসার ঘটনাকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে আখ্যায়িত করে এবং শাস্তি প্রদানের বিধানগুলো আরও বলিষ্ঠ করে তোলে। এই বিষয়ে বারংবার আইন পাশ হওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে যে আইন এককভাবে কোনো সামাজিক প্রথার অবসান করতে পারে না। এটা সত্য যে, সমগ্র ভারতে বৈষম্যতার ঘটনা ও দলিত এবং আদিবাসীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অত্যাচারের মামলা প্রায়শই খবরের কাগজে ও গণমাধ্যমে লক্ষ্য করা যায়।

বাক্স 5.3 তে উল্লিখিত এই নির্দিষ্ট ঘটনাটি শুধু একটি উদাহরণ; অথচ তুমি এই ধরনের অসংখ্য উদাহরণ খবরের কাগজ ও গণমাধ্যমে শনাক্ত করতে পারবে।

কোন রাষ্ট্র তার কার্যকলাপের মাধ্যমে এককভাবে সামাজিক পরিবর্তন সুনিশ্চিত করতে অক্ষম। তাই যে কোনও ক্ষেত্রে, যে কোন দুর্বল বা নিপীড়িত সামাজিক গোষ্ঠীকে শুধুমাত্র প্রত্যাশিত বলা যায় না। মানবজাতি সংগঠন এবং একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা পোষণ করে বিশেষ করে কঠোর পরিস্থিতি এবং ন্যায় ও মর্যাদা সম্পর্কিত ক্ষেত্রে। দলিত জাতিও রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আন্দোলনের মতো বিভিন্ন স্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। প্রাক্-স্বাধীনতাকালে জ্যোতিবা ফুলে, আইওথি দাশ, পেরিয়ার, আম্বেদকর ও অন্যান্যদের দ্বারা প্রারম্ভ করা বিভিন্ন সংগ্রাম এবং আন্দোলন থেকে বর্তমান সময়ের উত্তরপ্রদেশের বহুজন সমাজ পার্টি (Bahujan Samaj Party) বা কর্ণাটকের দলিত সংঘর্ষ সমিতি (Dalit Sangharsh Samiti) ইত্যাদির বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। তাই এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে দলিতদের রাজনৈতিক দাবি দাওয়াগুলো দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। (সাম্প্রতিককালের দলিতদের রাজনৈতিক সংগ্রামের উদাহরণের জন্য বাক্স 5.3 দেখ) সাহিত্যেও দলিতদের উল্লেখযোগ্য অবদান পরিলক্ষিত হয় যা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ রয়েছে, বিশেষকরে মারাঠী, কন্নড়, তামিল, তেলেগু এবং হিন্দি ভাষায় (বাক্স 5.4-এ স্বনামধন্য মারাঠী দলিত কবি, দয়া পাওয়ারের ছোট কবিতা দেওয়া হয়েছে।)

কাজ 5.3

ভারতীয় সংবিধানের একটি প্রতিলিপি সংগ্রহ কর। তোমরা এটা তোমাদের বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি বা বইয়ের দোকান অথবা ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করতে পারো। http://indiacode.nic.in/) তপশিলি জাতি এবং উপজাতি বা জাতি সম্পর্কিত সমস্যা যেমন-অস্পৃশ্যতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সকল সাংবিধানিক ধারা ও আইনগুলো খুঁজে একটি তালিকা তৈরি করো। তোমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলো চার্ট রূপে তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে লাগিয়ে রাখতে পারো।

বাক্স 5.3

দলিতদের প্রকাশ্য অবাধ্যতা

হরিয়ানার সোনিপত- রোহতক সড়কের অন্তর্গত গোহানা, একটি ছোট ধুলোময় শহর। সেখানে রাস্তার ধারে অনেক বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করা যায়, যেখানে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া রয়েছে। এই শহর চত্বর পেরোলে গোহানার সবচেয়ে বড় দলিত পাড়া, বাল্মিকী কলোনি (Valmiki Colongy) রয়েছে, যা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে বর্তমান স্থিতিতে পৌঁছেছে। 31 শে আগস্ট 2005 সালে, একটি জাট যুবকের কিছু দলিত যুবকদের সঙ্গে ধস্তাধস্তির ফলে মৃত্যু হয়। এরই প্রতিশোধরূপে একদল জাট এই এলাকাকে লুটপাট ও অগ্নিদগ্ধ করে। এই খুনের ঘটনার পর দলিতরা তাদের বাড়ি থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। সেই সময় ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকরা উগ্র দলটিকে চুয়ান্নটি দলিত বাড়ি ঘরকে আক্রমণ করা থেকে বাঁধা দেয়নি। এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে বিনোদ কুমার যার বাড়ি ওই ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে যায়, বলেন, "পুলিশ, প্রশাসন এবং সরকার সকলই জাট দ্বারা অধীনস্ত; যখন আমাদের বাড়িগুলো অগ্নিদগ্ধ হচ্ছিল, তারা শুধু তাকিয়ে দেখছিল ..."

পাঁচ মাস বাদে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে যাওয়া বাড়িঘর পুনর্নির্মিত হয়। বাড়িগুলোর সম্মুখভাগ লাল, সবুজ, গোলাপি রঙে রাঙানো হয়। তাছাড়া দলিত পরিচিতির প্রতিটি বাড়ি বাল্মিকী এর ছবি দেওয়া মারবেল টাইলস দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়। কুমার তার নীল রঙের বৈঠকখানার নতুন সোফাতে বসে বলেন --- "আমাদের ফিরে আসতেই হতো। এটা আমাদের বাড়ি।"

গোহানার দলিতদের উদ্দীপনা কুমারের মধ্যে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত করা যায়। 30 বছর বয়সি কুমার, তার জাতি সমাজের অন্যান্যদের মতো মেথর-এর পেশা মেনে নেয়নি। সে একটি বীমা কোম্পানিতে সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে কর্মরত। বেশিরভাগ দলিত আজ শিক্ষাকে আলিঙ্গান করেছে এবং জাতি ব্যবস্থার বাঁধা বা নিষেধাজ্ঞাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। কুমার বলেন যে, তার মতন অনেকেরই স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে এবং তারা সরকারি ও বেসরকারি পদে কর্মরত। সে জানায় যে তাদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। তাই বলতে গেলে বাল্মিকী কলোনির তরুণরা প্রথাগতভাবে বাঁধাধরা, নতমস্তক নির্যাতিত দলিতদের থেকে ভিন্ন। তারা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জুতো যেমন- Nike বা Wrangler jeans পোশাক পরিধান করে, তাদের অঙ্গভঙ্গি বেপরোয়া। কিন্তু হরিয়ানার অধিকাংশ ভূমিহীন দলিতদের ক্ষেত্রে এইরূপ উর্ধ্ব সামাজিক সচলতা এখনো কঠিন।

"অধিকাংশ ছেলেরা দারিদ্র্যের কারণে উচ্চ বিদ্যালয়ের পর "বিদ্যালয়— ছুট হয়ে যায়—" একথা জানান সুদেশ কাটারিয়া, যিনি একটি বহুজাতিক সংস্থায় সহকারী বাস্তুকার (assistant engineer) পদে কর্মরত। গুরগাঁও-এর Industrial Training Institute থেকে সুদেশ ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ারে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত করে। ITI থাকাকালীন তার ঘনিষ্ঠ জাট বন্ধু একবার তাকে তাদের পরিবারের বিবাহ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানায়, কিন্তু সুদেশকে তার দলিত পরিচয় গোপন রাখতে জোর করে। সুদেশ কাটারিয়া সে দিনের কথা মনে করে বলেন যে, বিবাহ অনুষ্ঠানে একজন তাকে তার জাতি সম্পর্কে প্রশ্ন করে, কিন্তু সে তার জাতির পরিচয় গোপন রাখে। তারপর তাকে তার গ্রামের নাম জিজ্ঞেস করা হয়। এইবার সে সত্য কথা জানায়। তার দলিত পরিচয় প্রকাশ হওয়ার পর অতিথি ও গৃহকর্তার মধ্যে এক কোন্দল সৃষ্টি হয়। তাদের প্রশ্ন কীভাবে একজন দলিতকে প্রবেশের অনুমোদন দেওয়া হল? পরবর্তী সময় কাটারিয়াকে অনুষ্ঠান থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং যে চেয়ারে সে বসেছিল তা ধুয়ে ফেলা হয়।

কাটারিয়া তার সহ দলিতদের জন্য এক নতুন জীবন কামনা করে। তাই সে অন্য শিক্ষিত দলিতদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে গুরগাঁও এর গ্রামে প্রচারকার্য চালায়। "আমরা দলিতরা ঊর্ধ্বগমণ করব, বলিষ্ঠ হব এবং শক্তিশালী হব। তাই আমাদের এক হতে হবে, এবং যে মুহূর্তে আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াইয়ে যোগদান করব, কোন গহনা বা ঝাঝারের অস্তিত্ব বিরাজ করবে না। আর নয়।"

(Source: Adapted from an article by Basharat Peer*, in* Tehelka *February 18, 2006)*

বাক্স 5.4

একটি নগর

—দয়া পাওয়ার

একদিন বিংশ শতাব্দীতে কোন একজন একটি শহর রচনা করে এবং এর পর্যবেক্ষণে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সেখানে একটি মজাদার লিপি লেখা ঃ 'এই জলের নলটি সকল জাতি এবং ধর্মের লোকদের জন্য অবারিত'।
এই লেখন কি বোঝাতে পারে ঃ
— যে এই সমাজটি বিভক্ত?
—যে এখানে কেউ কেউ উঁচু যেখানে অন্যান্যরা নীচু? ভালো, অতি উত্তম, তাহলে এই শহরের কবরে সমাহিত হওয়া প্রাপ্য—
কেন তারা এটাকে মেশিনের যুগ মনে করে?
এটা তো বিংশ শতাব্দীর প্রস্তরযুগের মতো।

অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণি

অস্পৃশ্যতা ছিল সামাজিক অসাম্যের সবচেয়ে স্পষ্ট ও ব্যাপক আকার। এছাড়াও সমাজে অন্যান্য অনেক জাতিগোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল যারা ভিন্ন স্তরীয় বৈষম্যের শিকার হয়। তারা হল পরিষেবা প্রদানকারী বা কারিগর জাতি, যারা ক্রমোচ্চ শ্রেণি বিন্যাসে নিম্নস্থানে অবস্থান করে। ভারতীয় সংবিধান এই সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেয় যে, তপশিলি জাতি ও উপজাতি ছাড়াও অনেক গোষ্ঠী বিদ্যমান থাকতে পারে যারা সামাজিক প্রতিকূল অবস্থা দ্বারা নিপীড়িত। এই সকল গোষ্ঠী শুধুমাত্র জাতি দ্বারা নির্ধারিত নয়, কিন্তু সাধারণত তাদের জাতির ভিত্তিতেই চিহ্নিত করা হয়। এই সকল গোষ্ঠী 'সামাজিকভাবে ও শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি' বলে বর্ণিত। এটাই প্রচলিত শব্দ 'পিছিয়ে পরা শ্রেণির' (OBC) সাংবিধানিক ভিত্তি, যা আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে থাকি।

'উপজাতি'দের মতো (তৃতীয় অধ্যায়ে দেখো) অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণিগুলোকেও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, সাধারণত যা তারা নয়। সামাজিক মর্যাদা স্তরে তারা না উচ্চপ্রান্তে অবস্থিত 'অগ্রসর' জাতি না তারা নিম্নপ্রান্তে থাকা দলিত জাতি। কিন্তু যেহেতু 'জাতি' শুধুমাত্র হিন্দুধর্মে সীমাবদ্ধ নয় এবং সকল প্রধান ভারতীয় ধর্মে প্রবেশ করেছে, তাই পিছিয়ে পড়া জাতির অন্তর্গত অন্য ধর্মের সদস্যরাও শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। তারাও একই প্রথাগত পেশার সঙ্গে যুক্ত এবং তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থানে সাদৃশ্যতা পরিলক্ষিত হয়।

এই সকল কারণে, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণিরা দলিত বা আদিবাসীদের তুলনায় অনেক 'বিচিত্র' গোষ্ঠী। স্বাধীনতার পর জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে গঠিত ভারতের প্রথম সরকার একটি কমিশন স্থাপন করে যা OBC-দের কল্যাণ বা সমৃদ্ধির জন্য কাজ করে। 1953 সালে কাকা কালেলকর-এর নেতৃত্বে প্রথম পিছিয়ে পড়া শ্রেণির কমিশন প্রতিবেদন জমা করে। কিন্তু সেই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই প্রতিবেদনটিকে গুরুত্বহীন মনে করে ফেলে রাখে। অথচ পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে, OBC সমস্যা আঞ্চলিক বিষয়ে পরিণত হয় যা কেন্দ্রস্তরে নয় কিন্তু রাজ্যস্তরে অনুধাবন করা হয়।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে দক্ষিণী রাজ্যগুলিতে পিছিয়ে পরা শ্রেণির রাজনৈতিক বিক্ষোভের দীর্ঘ ইতিহাস লক্ষ্য করা যায়। এই সকল শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলনের কারণে, উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে আলোচনার অনেক আগেই, OBC সমস্যা সমাধানের নীতিগুলো জমা দেওয়া হয়। 1970 সালের শেষের দিকে আপাতকালীন স্থিতির পর যখন জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসে তখন OBC সমস্যা পুনরায় কেন্দ্রীয় স্তরে ফিরে আসে। এই সময়ে বি.পি. মণ্ডল এর নেতৃত্বে, 'দ্বিতীয় পিছিয়ে পরা শ্রেণির' গঠন হয়। তবে 1990 সালে যখন কেন্দ্রীয় সরকার দশ বছর পুরানো মণ্ডল কমিশনের প্রতিবেদনকে বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন OBC সমস্যা জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

1990 সাল থেকে উত্তর ভারতের নিম্ন জাতি আন্দোলনের পুনরুত্থান লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে দলিত ও OBC দের মধ্যে OBC রা রাজনীতিকরণের মধ্য দিয়ে তাদের বৃহৎ সংখ্যাকে রাজনৈতিক প্রভাব যুক্ত করতে সক্ষম হয়। সাম্প্রতিক সমীক্ষা সম্ভবত দেখায় যে জাতীয় জনসংখ্যায় তাদের সংখ্যা প্রায় 41%। এটা জাতীয় স্তরে পূর্বে নির্ধারিত ছিল না যা কালেলকর কমিশন ও মণ্ডল কমিশনের প্রতিবেদনে গুরুত্বহীন হিসাবে দেখানো হয়।

উচ্চ OBC (যে জাতি প্রচুর ভূমির মালিক এবং ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলের, গ্রামীণ সমাজে তাদের প্রভুত্ব বিস্তার করে) এবং নিম্ন OBC (যারা খুব দরিদ্র ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বসবাস করে এবং প্রায়শ সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যারা দলিতদের চেয়ে ভিন্ন নয়)-এর মধ্যে বৃহৎ অসমতা এই সমস্যাকে জটিল রাজনৈতিক বিষয় করে তোলে। কিন্তু ভূস্বামী ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব (তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক MLA ও MP রয়েছে) ছাড়া, সকল ক্ষেত্রে OBC দের প্রতিনিধিত্ব গুরুতরভাবে সীমিত। যদিও গ্রামীণ বিভাগে উচ্চ OBC দের প্রভাব বিস্তার লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু নগরীয় OBC রা প্রতিকূল স্থিতিতে বসবাস করে। তাই বলতে গেলে তাদের অবস্থান উচ্চ জাতির তুলনায় তপশিলি জাতি এবং উপজাতির অনুরূপ।

আদিবাসী সংগ্রাম

তপশিলি জাতির মতো, তপশিলি উপজাতি হল এমন সামাজিক গোষ্ঠী যারা ভারতীয় সংবিধান স্বীকৃত এবং দারিদ্র্য, ক্ষমতাহীনতা ও সামাজিক কলঙ্ক দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত। 'জন' বা উপজাতিদের 'অরণ্যের সন্তান' বলে আখ্যায়িত করা হয়। তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে পাহাড়ি ও বন্য এলাকায় বসবাসের কারণে। তাসত্ত্বেও, বাস্তু সংস্থান সংক্রান্ত বিচ্ছিন্নতা কোথাও নিখুঁত ছিল না। উপজাতি গোষ্ঠীর হিন্দু সমাজের এবং সংস্কৃতির সঙ্গে দীর্ঘ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, যা 'উপজাতি' এবং 'জাতি' বিভেদকে অনেকটা হ্রাস করে। (তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ব আলোচিত 'উপজাতি' ধারণাটি মনে করে দেখ)

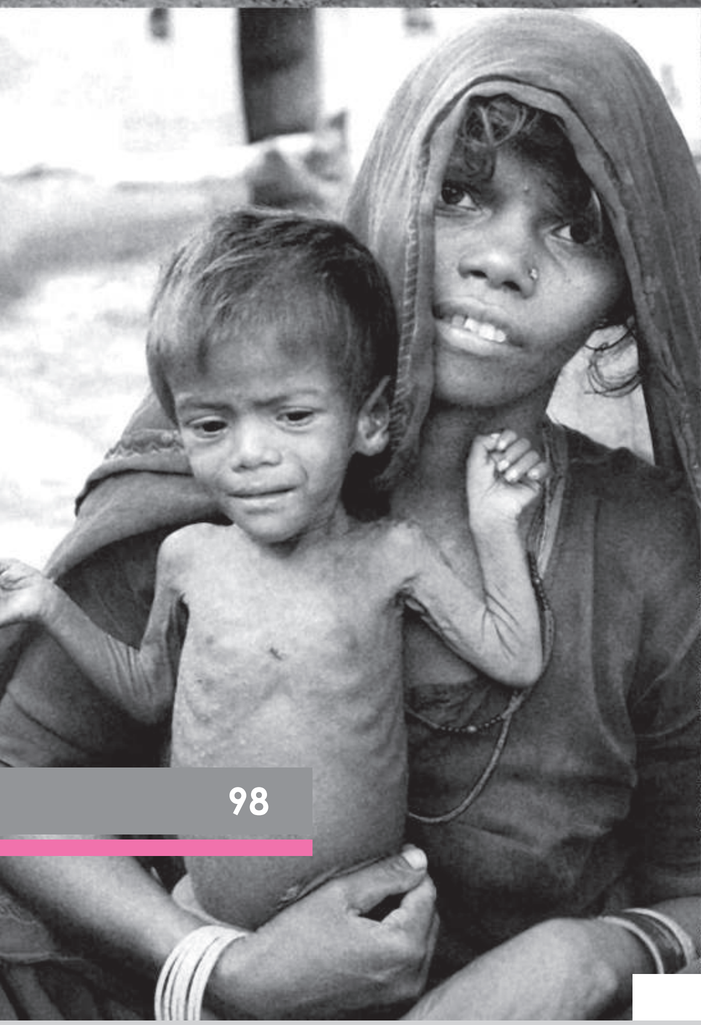

একটি দলিত গ্রাম

আদিবাসীদের ক্ষেত্রে, এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় জনসংখ্যার যাতায়াত এই চিত্রটিকে আরও জটিল করে তোলে। বর্তমানে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো ছাড়া, দেশে এমন কোনও অঞ্চল নেই যা সম্পূর্ণভাবে উপজাতি অধ্যুষিত; যেখানে শুধুমাত্র উপজাতিরাই বিদ্যমান। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, অ-উপজাতিরা মধ্যভারতের উপজাতি জেলায় স্থানান্তরিত হতে শুরু করে, অন্যদিকে সেই একই জেলা থেকে উপজাতিরা রোজগারের জন্য বাগিচা, খনি, কারখানা এবং অন্যান্য স্থানে প্রচরণ করতে শুরু করে।

যে সকল এলাকায় উপজাতি জনসংখ্যার সমাবেশ পরিলক্ষিত হয় সেখানে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান অ-উপজাতিদের তুলনায় অধিকতর মন্দ। আদিবাসীরা যে ধরনের জীর্ণ, অস্বাস্থ্যকর এবং শোষিত পরিস্থিতিতে বসবাস করে, তার সূচনা ঐতিহাসিকভাবে ব্রিটিশ সরকারের সম্পদ নিষ্কাশনের সময় প্রারম্ভ হয়ে গিয়েছিল এবং এই পরিস্থিতি স্বাধীন ভারতের সরকার দ্বারা অব্যাহত রাখা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, উপনিবেশিক সরকার বন অঞ্চলকে নিজের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত করে। এর ফলে আদিবাসীদের দীর্ঘকালীন বন অধিকার যার দ্বারা তারা জুম চাষ বা বন্য উৎপাদন সংগ্রহ করে থাকে, তা সংকোচিত করা হয়। বনভূমিকে কাঠ উৎপাদনের বৃদ্ধির জন্য সংরক্ষিত করা হতো। এই নীতির মাধ্যমে আদিবাসীদের থেকে তাদের জীবিকার প্রধান উৎসগুলো ছিনিয়ে নেওয়া হয় ও তাদের জীবনকে দারিদ্র এবং অনিশ্চয়তায় পরিণত করা হয়। ভূমিতে চাষবাস এবং বনে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়ার ফলে আদিবাসীরা বাধ্য হয়ে বেআইনিভাবে বনের ব্যবহার শুরু করে (এর ফলস্বরূপ তাদের চোর বা অবৈধভাবে পদার্পণের কারণে অভিযুক্ত বা হয়রানি করা হয়) বা তাদের ভিন্ন স্থানে জীবিকার জন্য প্রচরণ করতে লক্ষ্য করা যায়।

1947 সালে স্বাধীনতার পর আদিবাসীদের জীবনধারা সহজ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। প্রথমত, বনের উপর সরকারের একাধিকার অব্যাহত থাকে। তাই বন শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, ভারত সরকার দ্বারা পুঁজি ভিত্তিক শিল্পায়নের নীতি গৃহীত হওয়ার কারণে খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা ঘটে, যা আদিবাসী এলাকায় নিবিষ্ট ছিল। তাছাড়া আদিবাসীদের জমি নতুন খনন এবং বাঁধ (dam) নির্মাণকারী কার্যে দ্রুত অধিকৃত হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রচুর সংখ্যক আদিবাসীরা কোন সঠিক ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন ছাড়াই স্থানচ্যুত হয়। 'জাতীয় উন্নয়ন' এবং অর্থনৈতিক বিকাশের নামধারী এই নীতিগুলো এক প্রকারের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ যার লক্ষ্য আদিবাসীদের অধীনস্ত করা ও তাদের নিজ নির্ভরশীল সম্পদগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করা। পশ্চিম ভারতে নর্মদা নদীর উপর নির্মিত সর্দার সরোবর বাঁধ এবং অন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরী নদীতে পোলাভারম বাঁধের মতো প্রকল্প হাজারো আদিবাসীদের স্থানচ্যুত করে ও তাদের নিঃসঙ্গ করে দেয়। এই সকল প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে এবং আরও বলিষ্ঠ হয় যখন 1990 সালে ভারত সরকার দ্বারা অর্থনৈতিক উদারীকরণ সরকারিভাবে গৃহীত হয়। এখন বেসরকারি সংস্থার দ্বারা আদিবাসীদের স্থানচ্যুত করে বিশাল এলাকা অধিকৃত করা সহজ হয়ে উঠেছে।

'দলিত' শব্দের মত আদিবাসী শব্দটিও রাজনৈতিক সচেতনতা এবং অধিকারের দাবির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'আদি বাসিন্দা' যা 1930 সালে উদ্ভুত হয়। উপনিবেশিক সরকার, বহিরাগত ও মহাজনদের অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যই এই শব্দের উদ্ভাবন হয়। আদিবাসী হওয়া মানে বনের অনধিকার, ভূমি থেকে বিচ্ছিন্নতা ও স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের নামে বারবার স্থানচ্যুত হওয়ার অভিজ্ঞতা।

প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং প্রান্তিকীকরণ সত্ত্বেও, বহুসংখ্যক উপজাতি গোষ্ঠী বহিরাগত (যাদের দিক্কু বলা হয়) ও রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে। স্বাধীনোত্তর ভারতে, আদিবাসী আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি হল ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড় রাজ্যগুলোর স্বীকৃতি অর্জন করা, যা পূর্বে বিহার এবং মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, আদিবাসীরা ও তাদের সংগ্রাম দলিতদের সংগ্রামের চেয়ে ভিন্ন কেননা আদিবাসীরা সমবেতভাবে ঘনসন্নিবিষ্ট এলাকায় বসবাস করে এবং তাই তারা নিজস্ব রাজ্য দাবি করতে সক্ষম।

বাক্স 5.5

উন্নয়নের নামে - বিপদের সম্মুখীন আদিবাসীরা

নতুন বছর ওড়িশায় মৃত্যুর বার্তা নিয়ে আসে। 2006 সালের 2 রা জানুয়ারি পুলিশ প্রশাসন আদিবাসীদের এক গোষ্ঠীকে গুলিবর্ষণ করে ও সেখানে 12 জন নিহত এবং অন্যান্যরা আহত হয়। বিগত 23 দিন ধরে, কলিঙ্গানগরের অন্তর্গত রাজ্য সড়কটি আদিবাসীরা অবরোধ করে রাখে। তারা ইস্পাত কোম্পানি দ্বারা তাদের জমি অধিকৃত হওয়ার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানায়। প্রশাসনকে তীব্র চাপের সম্মুখীন হতে হয় কারণ আদিবাসীরা নিজস্ব ভূমি প্রদানে অস্বীকার করে। অবস্থা আরও গুরুতর আকার ধারণ করে শুধু এই ভূমি নয় কিন্তু গোটা নীতি যা শিল্পায়নের গতিরুদ্ধ করে, সবকিছুই বিপন্ন হয়ে উঠবে যদি সরকার আদিবাসীদের দাবি গ্রাহ্য করে। তাই বলপূর্বক সড়ক মুক্ত করার ক্ষেত্রে পুলিশকে যুক্ত করা হয়। পুলিশি হস্তক্ষেপের ফলস্বরূপ 12 জন আদিবাসী পুরুষ ও মহিলার মৃত্যু ঘটে। এরমধ্যে বহু সংখ্যক আহত হয় যখন তারা প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায় পালাতে শুরু করে। যখন আদিবাসীদের মৃতদেহ তাদের পরিবারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তখন পুলিশি বর্বরতা ধরা পড়ে। দেখা যায় পুলিশ মৃতদেহের হাত, পুরুষের যৌনাঙ্গ (genitals) ও মহিলাদের স্তন কেটে ফেলে।ওই মৃতদেহগুলোর অঙ্গহানি আসলে সতর্কবার্তা ছিল — অর্থাৎ "আমরা ব্যবসা বুঝি"।

অধিকাংশ ভয়ের ঘটনার মতো, কালিঙ্গানগর ঘটনাও সংক্ষিপ্ত রূপে খবরের কাগজের হেডলাইন হয় এবং পরবর্তী সময়ে জনগণের চোখের আড়ালে চলে যায়। দরিদ্র আদিবাসীদের জীবন ও মৃত্যু আবারও অন্ধকারে ফিরে যায়। এখনো তাদের সংগ্রাম অব্যাহত। তাদের সংগ্রামের ঘটনাগুলো পুনরায় পরিদর্শন করে আমরা শুধুমাত্র সমাজের অন্যায়কে সমাধান করার প্রয়োজনীয়তা মনে করি না, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের মনে পরে যে ভারতে পরিবেশ এবং উন্নয়নের সঙ্গে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব ওতোপ্রতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। দেশের বহু আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার মতো, মধ্য ওড়িশার জাজপোর জেলার কালিঙ্গানগরও একটি আপাতবিরোধী অভিজ্ঞতা। এই এলাকা প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পন্ন যা এখানকার বসবাসকারীদের, বিশেষ করে ছোট কৃষক এবং শ্রমিকদের দারিদ্র্যের স্মৃতির সঙ্গে বৈসাদৃশ্য প্রকাশ করে। এই এলাকার মাটির নীচে জমা লৌহ আকরিক হল রাষ্ট্র সম্পত্তি এবং এই সম্পদের 'উন্নয়নের' অর্থ হল আদিবাসী জমি, রাজ্য দ্বারা সামান্য ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে অর্জন করা। একদিকে কিছু স্থানীয় বাসিন্দা শিল্প জগতে নিম্নস্তরে নিরাপদ চাকরি করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে অধিকাংশ আদিবাসী দিনমজুর, অস্বাস্থ্যকর এবং অনাহারের স্থিতিতে জীবনযাপন করছে। 1947 সালে ভারতের স্বাধীনতার পর, এই ভূমি দখল নীতির মাধ্যমে আনুমানিক 30 মিলিয়ন মানুষ স্থানচ্যুত হয় যা কানাডার জনসংখ্যার চেয়েও অধিক। সরকারি বক্তব্য অনুযায়ী, এরমধ্যে প্রায় 75 শতাংশ আদিবাসী এখন পুনর্বাসনের অপেক্ষায় রয়েছে। সর্বজনীন স্বার্থে ভূমি দখলের এহেন নীতিকে ন্যায় সঙ্গত প্রক্রিয়া রূপে গণ্য করা হয়, যেহেতু রাজ্য শিল্প উৎপাদন ও পরিকাঠামোর উন্নয়নের মধ্য দিয়েই অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

তাই বলা হয়, জাতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই ধরনের বিকাশ আবশ্যক।

এই সকল তর্কের সঙ্গে এক নতুন যৌক্তিকতা যুক্ত করা হয়েছে 1990 সাল থেকে, ভারত সরকার অর্থনৈতিক উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করে — উন্নয়নমূলক কার্যের স্থিতিকে পরিবর্তন করে এবং বেসরকারি সংস্থার নিয়ন্ত্রিত প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিগুলোকে নিবারণ করে। অর্থনৈতিক নীতি বিদেশি মুদ্রা আমদানিকেঅধিকতর করে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক ও পাশাপাশি ভারতীয় ও বিদেশি সংস্থাগুলোকে ছাড় প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিতে ও রফতানি করতে উৎসাহিত করে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইস্পাতের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে কলিঙ্গানগরের লৌহ আকরিক বাজার সকলকে আকর্ষণ করে। তাই তারা নতুন স্টিল প্ল্যান্ট নির্মাণ করতে ওড়িশার রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ভূমি ক্রয় করে এবং কারখানা নির্মাণের স্থানটি প্রাচীর দিয়ে ঘিরে ফেলে। এই প্রাচীরের নির্মাণকে কেন্দ্র করে আদিবাসীরা তীব্র প্রতিবাদ জানায় ও তার ফলস্বরূপ কিছু আদিবাসীদের মৃত্যুও ঘটে। রাজ্য সরকার কিছু বছর পূর্বে এই জমি বলপূর্বক অধিগ্রহণ করে ও ক্ষতিপূরণ রূপে প্রতি একক পিছু হাজার টাকা প্রদান করে। যেহেতু এই স্বল্প ক্ষতিপূরণ দিয়ে আদিবাসীরা অন্য কোনও জীবিকা গ্রহণ করতে পারেনি, তাই তারা সেই এলাকায় বসবাস করে ও কৃষিকাজ চালিয়ে যায়, যদিও এই ভূমি আইনগত সরকারি (জমি অধিগ্রহণের পর প্রশাসন কোন কাজে জমি ব্যবহার করেনি)। 2005 সালের ডিসেম্বর মাসে জমিকে প্রাচীরবদ্ধ করার পদক্ষেপ প্রত্যক্ষভাবে আদিবাসীদের জীবিকার একমাত্র উৎসকে আঘাত করে। তাদের হতাশা ও ক্রোধ বেড়ে যায় যখন তারা জানতে পারে যে রাজ্য সরকার বলপূর্বক এই জমি চড়া মূল্যে স্টিল প্ল্যান্টের কাছে বিক্রি করে এবং ওই বিক্রয়মূল্য তাদের প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের আনুমানিক দশ গুণ বেশি। এই পরিস্থিতিতে আদিবাসীরা রাস্তা অবরোধ করে ও জমি ছাড়তে অস্বীকার করে।

ওড়িশাতে আদিবাসীদের সংগ্রাম এবং তাদের হিংস্র প্রত্যাধিকার এটা প্রমাণ করে যে জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব কীভাবে ভারতের উন্নয়ন ক্ষেত্রে প্রতিবনধক রূপে কাজ করে। ভারতের পরিবেশগত দ্বন্দ্বের মানচিত্রের মধ্যে এখন কালিঙ্গানগরে নাম নর্মদা, সিংরাউলি, তেহরি, হীঁরাকুদ, কোয়েল কারো, সুবর্ণরেখা, নাগারহোল, প্লাচিমাদা এবং অন্যান্য স্থানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। অন্যান্যদের মতো, এর সমোন্নতি রেখা সমকালীন ভারতের গভীর সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিভাজন প্রতিফলিত করে।

এই বিষয়ে আরও তথ্য প্রাপ্ত করারজন্য নিম্নলিখিত সূত্রগুলো দেখো ঃ

Frontline, v. 23, n.1, Jan 14-27, 2006 or the People's Union for Civil Liberties report at http://www.pucl.org/Topics/Dalit-tribal/2006/kalinganagar.htm

5.3 নারীদের সমতা এবং অধিকারের জন্য সংগ্রাম

লিঙ্গা বৈষম্যতাকে প্রায়শ প্রাকৃতিক বলেই ধরা হয়। কেননা পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সুস্পষ্ট জৈবিক ও শারীরিক ভিন্নতা বিদ্যমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও পণ্ডিতগণ দেখিয়েছেন পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে এইসকল অসমতা হল সামাজিক। উদাহরণস্বরূপ, কোন জৈবিক কারণ এটা সুস্পষ্টভাবে ব্যখ্যা করতে পারে না যে কেন সরকারি কতৃত্বপূর্ণ স্থানে শুধু স্বল্প সংখ্যক মহিলাদেরই লক্ষ্য করা যায়। আবার, প্রকৃতি এটাও ব্যাখ্যা করতে অক্ষম যে কেন বেশিরভাগ সমাজেই মহিলারা পারিবারিক সম্পত্তিতে সাধারণত অল্প বা কোন অংশ প্রাপ্ত করে না। কিন্তু সবচেয়ে বলিষ্ঠ তর্ক সেই সব সমাজ থেকে উঠে আসে, যেগুলো 'স্বাভাবিক' সমাজ থেকে ভিন্ন ছিল। যদি মহিলারা উত্তরাধিকারী এবং গৃহকর্তা রূপে জৈবিকভাবে অক্ষম হতো, তাহলে এত শতাব্দী ধরে কীভাবে মাতৃ-বংশানুক্রমিক সমাজগুলো (যেমনঃ কেরালার নায়ার বা মেঘালয়ের খাসিয়া) কাজ করছে? কীভাবে আফ্রিকান সমাজের মহিলারা কৃষক এবং ব্যবসায়িক রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয়েছে? সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, কোন জৈবিক কারণই সমাজে মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে বিদ্যমান অসমতাকে চিহ্নিত করতে পারে না। তাই লিঙ্গা হল জাতি এবং শ্রেণির মতো সামাজিক অসাম্য এবং বহিষ্কারের একটি ধরন, কিন্তু তার নিজস্ব কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই পরিচ্ছেদে আমরা দেখবো যে কীভাবে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে লিঙ্গা বৈষম্যতা একটি অসমতা রূপে স্বীকৃতি লাভ করে এবং এই স্বীকৃতি কী ধরনের প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত শ্রেণির সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের অংশ রূপে আধুনিক ভারতেও 'নারী' সম্পর্কিত প্রশ্নের উদ্ভব হয়। আঞ্চলিকভাবে এই আন্দোলনগুলোর প্রকৃতি ভিন্ন ছিল। এই ধরনের আন্দোলনগুলোকে প্রায়ই 'মধ্যবিত্ত শ্রেণির সামাজিক সংস্কার' হিসাবে ধরা হতো কেননা অধিকাংশ সংস্কারকই ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। তারা সেই সময়ের আধুনিক পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় এবং তাদের নিজের গণতান্ত্রিক প্রথা সম্পর্কে গভীর গৌরব বোধ করতো। অধিকাংশই নারী অধিকারের লড়াইয়ের জন্য এই সকল সম্পদ ব্যবহার করে। এই ক্ষেত্রে কিছু ব্যাখ্যামূলক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেমন, বঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলন, বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে বিধবা বিবাহ আন্দোলন যেখানে রানাডে একজন গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারকের ভূমিকায় ছিলেন, আবার জাতি এবং লিঙ্গ নীপিড়নের বিরুদ্ধে জ্যোতিবা ফুলের আক্রমণ এবং স্যার সৈয়দ আহমেদ-এর নেতৃত্বে ইসলাম ধর্মে সামাজিক সংস্কার আন্দোলন।

রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ, ধর্ম এবং নারী মর্যাদা সম্পর্কিত সংস্কারের প্রয়াসকেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গে হওয়া সামাজিক সংস্কারের উৎস বলে গণ্য করা হয়। 1928 সালে ব্রাহ্ম সমাজের স্থাপন হওয়ার এক দশক পূর্বেই, রামমোহন রায় 'সতীদাহ' প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা নারী সম্পর্কিত প্রথম বিষয় ছিল। রামমোহন রায়ের ধারণাগুলো পাশ্চাত্য যৌক্তিকতা এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের বিবৃতির মিশ্রণের প্রতিফলন। উপনিবেশবাদের প্রতিক্রিয়ামূলক আন্দোলনে এই উভয় প্রবণতাই লক্ষ্য করা যায়। তাই রাজা রামমোহন মানবিকতা, প্রাকৃতিক অধিকার মতবাদ ও হিন্দু শাস্ত্রের ভিত্তিতে সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করেন।

সামাজিক সংস্কারকদের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল উচ্চ জাতির হিন্দু বিধবাদের প্রতি শোচনীয় এবং অন্যায় আচরণ। এক্ষেত্রে রানাডে বিভিন্ন পণ্ডিতগণদের লেখা ব্যবহার করেন, যেমন- বিশপ জোসেফ বাটলার-এর লেখা Analogy of Religion এবং Three Sermons on Human Nature যার প্রভাব 1960 সালে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈতিক দর্শনের পাঠ্যক্রমে লক্ষ্য করা যায়। ঠিক সেই সময় এম জী রানাডে রচিত "*The Texts of the Hindu Law* on the *Lawfulness of the Remarriage of Widows* and *Vedic Authorities for Widow Marriage*" বই বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয় নিয়মনীতিগুলোর ব্যাখ্যা করে।

একদিকে রানাডে এবং রামমোহন রায়কে ঊনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত উচ্চ জাতি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সামাজিক সংস্কারক হিসাবে ধরা হতো। অন্যদিকে জ্যোতিবা ফুলে সামাজিকভাবে বহিষ্কৃত জাতির সদস্য ছিলেন।তিনি জাতি ও লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করেন। তিনি সত্যশোধক সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল 'সত্য সন্ধান' করা। ফুলের সামাজিক সংস্কারের প্রথম প্রয়াস এমন দুই গোষ্ঠীতে কার্যকর হয়, যাদের ব্রাহ্মণ সংস্কৃতিতে নিম্ন বলে ধরা হয়। এই দুই গোষ্ঠী হল ঃ নারী এবং অস্পৃশ্য (তৃতীয় অধ্যায় দেখো)।

কাজ 5.4

- ভারতের এমন একজন সমাজ সংস্কারকের নাম খুঁজে বের করো যে তোমার রাজ্যে বসবাস করেন। তাঁর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো।
- যে কোনো সমাজ সংস্কারকের আত্মজীবনী/জীবনী সম্পর্কে অধ্যয়ন করো।
- এই সমাজ সংস্কারকদের চিন্তাধারায় তুমি কি এমন কোনো ধারণা লক্ষ্য করেছ যা আজকের দৈনন্দিন জীবনে বা সাংবিধানিক নিয়মনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

দলিত শ্রেণির মহিলা ও কন্যাগণ

কাজ 5.5

- এমন কিছু পেশার তালিকা প্রস্তুত কর যেখানে আজ মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- তুমি কি এমন কোনও শিক্ষাগত ক্ষেত্রের কথা ভাবতে পার যেখানে আজও মহিলাদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে? ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মহিলাদের স্থান সম্পর্কিত সাম্প্রতিক আলোচনাটি হয়তো এ বিষয়ে কিছু স্পষ্টীকরণ করবে।

অন্য সংস্কারকদের মত, স্যার সৈয়দ আহমেদ খান-এর মুসলমান সমাজে সংস্কারের প্রচেষ্টাতেও আধুনিক পাশ্চাত্য ধারণা এবং পবিত্র গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যের মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। তিনি চাইতেন মেয়েরা শিক্ষিত হোক তবে নিজেদের গৃহের অন্দর মহলে। আর্য সমাজের দয়ানন্দ সরস্বতীর মতো, তিনিও নারী শিক্ষার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তিনি এমন পাঠ্যসূচির প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন যেখানে ধার্মিক নীতি নির্দেশনা, গৃহস্থালির কাজ, হস্তশিল্প এবং শিশু প্রতিপালনের প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আজ হয়তো এটা পুরানোপন্থী চিন্তাধারা বলে মনে হতে পারে। তবে এটা উপলব্ধি করার বিষয় যে আজ নারীরা সব প্রকারের শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে উঠছে এবং এই প্রক্রিয়া শুরু হয় যখন তাদের শিক্ষার অধিকার প্রদান করা হয়।

এটা প্রায়শ অনুমান করা হয় যে মহিলাদের অধিকারের সংগ্রামে পুরুষ সংস্কারকরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং 'নারীদের' সমতার ধারণাটি বিশেষভাবে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত। তাই এই অনুমানগুলো কতটা বিভ্রান্তিকর তা জানতে পরবর্তী অংশটি পড়ো, যা মহিলাদের দ্বারা রচিত। প্রথমটি হল 1882 সালে লেখা *স্ত্রী পুরুষ তুলনা* এবং দ্বিতীয়টি 1905 সালে রচিত *সুলতানাস্ ড্রিম* (Sultana's Dream)।

'স্ত্রী পুরুষ তুলনা' নামক বইটি তারাবাই শিন্ডে নামে একে মারাঠী গৃহবধূ দ্বারা রচিত। এই বইটি পুরুষ শাসিত সমাজে বিদ্যমান কপট দ্বৈত আদর্শের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে। একজন কম বয়সী ব্রাহ্মণ বিধবাকে নিজের অবৈধ নবজাতককে খুনের দোষে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু সেই পুরুষটি যে নবজাতকটির পিতা, তাকে শনাক্ত করা বা শাস্তি দেওয়ার কোন প্রচেষ্টাই করা হয়নি। 'স্ত্রী পুরুষ তুলনা' বইটি প্রকাশের পর ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বেগম রোকেয়া শেখাওত হুসেন-এর জন্ম এক প্রভাবশালী বাঙালি মুসলমান পরিবারে হয় এবং একজন উদার চিন্তাধারার স্বামী পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করতেন।

বাক্স 5.6

1882-র 'স্ত্রী-পুরুষ তুলনা' থেকে

এই মহিলারা কারা যাদের তুমি এই নাম দেবে? তুমি যার গর্ভে জন্ম নিলে? যে নয় মাস ধরে তোমার মারণ বোঝা বয়ে চলছিল? যে সতী-স্বাধ্বী ছিল ... যে তোমাকে তার চোখের তারা বানিয়ে রেখেছিল ... তোমার কি মনে হবে যদি কেউ তোমার মা সম্পর্কে বলে, "এই হচ্ছে বুড়ো ছেলের মা, তুমি জান, সে যে নরকের প্রবেশদ্বারা।" অথবা তোমার বোন সম্পর্কে যদি কেউ বলে, "এই যে অমুক ... এবং ... অমুকের বোন, সে প্রতারণা বা ফাঁকির একটি আস্ত ঝুড়ি।" ... তখন কি চুপচাপ বসে বসে তাদের খারাপ কথাগুলো শুনবে?

... যখন তুমি কিছুটা শিক্ষিত হয়ে একটি নতুন অফিসে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে তোমার পদোন্নতি হয় ... এবং তুমি তোমার প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে লজ্জা বোধ কর। টাকা পয়সা তোমার উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করে এবং তুমি নিজেকে বলতে শুরু কর যে সর্বোপরি একজন স্ত্রীর ভূমিকা কী? আমরা কি তাদের অল্প কিছু মাসিক টাকা দিয়ে অন্য যে কোন কাজের লোকের মতো বাড়িতে রাখি না? ... রান্না করা এবং ঘর সামলানোর জন্য? তুমি তার সম্পর্কে একজন বেতনভোগীকাজের লোকের মতো চিন্তা করতে শুরু কর ... যদি তোমার একটি ঘোড়া মরে যায়, তাহলে সেটাকে প্রতিস্থাপিত করতে বেশি সময় লাগে না এবং এইভাবে একজন স্ত্রীর পরিবর্তে আরেকজন স্ত্রী পেতে বেশি পরিশ্রম করতে হয় না ... অসুবিধাটা হল ইয়ামা তার স্ত্রীদের নিয়ে যাওয়ার পর্যাপ্ত সময় পায় না ... অথবা তুমি হয়তো একদিনের মধ্যে বিভিন্ন জনকে পেতে চাও!

বাক্স 5.7

'সুলতানার স্বপ্ন' থেকে (1905)

... "ব্যাপারটা কী, প্রিয় ? " সে আদরের সুরে বলেছিল। "আমি কিছুটা বিভ্রান্তিকর অনুভ করছি", আমি বলেছিলাম কিছুটা ক্ষমা চাওয়ার সুরে, "একজন পর্দা-নশীন মহিলা হওয়ার সুবাদে অনাবৃত হয়ে হাটতে বা চলতে আমি অভ্যস্ত নই।"

" কোন পুরুষের সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয় এখানে তুমি পেও না। এটা একটা মহিলাক্ষেত্র (Ladyland), কোন পাপ এবং ক্ষতিকারক চিন্তা থেকে মুক্ত ...।"

... আমি খুব উৎসাহিত ছিলাম এটা জানার জন্য যে পুরুষরা কোথায়। সেখানে চলতে চলতে আমি একশোরও বেশি মহিলার দেখা পেয়েছিলাম, কিন্তু কোন পুরুষ ছিল না।

"পুরুষরা কোথায় ?" আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। "তাদের যথাযথ জায়গায়, যেখানে তাদের হওয়া উচিত।" "তাদের 'যথাযথ জায়গা' বলতে তুমি কি বুঝাতে চেয়েছ সেটা কি আমি জানতে পারি।"

"ওহ, আমি ভুল করে ফেলেছি দেখতে পাচ্ছি, তুমি তো আমাদের প্রথা জানো না যেহেতু আগে তুমি কখনও এখানে আসো নি। আমরা পুরুষদের বাড়ির ভিতরে বন্ধ করে রাখি।"

" যেভাবে আমাদেরকে অন্তঃপুরে রাখা হয় ?" "একদম তাই"।

" কি মজার।" আমি হাসিতে ফেটে পড়ি। সিস্টার সারাও হেসে উঠেছিল।

তার স্বামী প্রথমে উর্দু এবং পরবর্তীকালে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণে তাকে উৎসাহিত করেন। যখন তিনি ইংরেজি ভাষার উপর নিজের দক্ষতা পরীক্ষা করতে সুলতানাস ড্রিম রচনা করেন, তার আগেই তিনি উর্দু এবং বাংলা ভাষায় লেখিকা রূপে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। এই উল্লেখযোগ্য ছোট গল্পটি হয়তো ভারতের সবচেয়ে পুরানো কল্প বিজ্ঞান এর গল্প এবং তিনি পৃথিবীর সর্বপ্রথম লেখিকা যে এই ধরনের কল্পবিজ্ঞান রচনা করেন। সুলতানা তার স্বপ্নে এমন একটি যাদুর দেশে ভ্রমণ করে যেখানে লিঙ্গগত ভূমিকাগুলোর অদলবদল ঘটে। পুরুষেরা গৃহে আবদ্ধ থাকে ও পর্দাপ্রথা পালন করে, অন্যদিকে মহিলারা বৈজ্ঞানিক রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে এবং বৃষ্টি ও মেঘের গতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং উড়ন্ত যন্ত্র আবিষ্কারে ব্যস্ত থাকে।

প্রাথমিক নারীবাদী চিন্তাধারা ছাড়াও সমাজে বহু সংখ্যক নারী সংগঠন বিদ্যমান ছিল যা বিংশ শতাব্দীতে সর্বভারতীয় স্তরে এবং স্থানীয় স্তরে গড়ে উঠে। তাছাড়া, জাতীয় আন্দোলনেও তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। এটা অবাক হওয়ার বিষয় নয় যে নারীদের অধিকার জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ওতোপ্রতোভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। 1931 সালে করাচিতে ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্পর্ক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটি ঘোষণাপত্র জারি করে। সেখানে তারা নারীদের সমতার বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ঘোষণাপত্রটিতে বলা হয়েছেঃ

কাজ 5.6

- এমন কিছু নারী সংগঠনের নাম অনুসন্ধান কর যার উদ্ভব জাতীয় স্তরে এবং তোমার রাজ্যের আঞ্চলিক স্তরে হয়েছে ?
- এমন কোনো মহিলার নাম সন্ধান কর যে উপজাতি বা কৃষক আন্দোলনে অথবা শ্রমিক সংগঠন বা যে কোন স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।
- তোমার অঞ্চলের কোনো প্রবন্ধ বা ছোট গল্প বা নাটককে চিহ্নিত কর যা নারী বৈষম্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রদর্শন করে।

1. জাতি, ধর্ম, বর্ণ অথবা লিঙ্গ নির্বিশেষ সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান।
2. সরকারি চাকুরি, কর্তব্য বা সম্মানের ক্ষেত্রে এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ অথবা লিঙ্গ কোনোভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না।

কাজ 5.7

তোমার শ্রেণিকক্ষের ছাত্রদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করো। প্রতিটি দল যে কোনো নারী অধিকার সম্পর্কিত বিষয় নির্বাচন করো। তাদের অবশ্যই খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি, বা অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তোমাদের প্রাপ্ত তথ্যগুলো শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো। সম্ভাব্য বিষয়গুলোর উদাহরণ নীচে দেওয়া হল ঃ

- নির্বাচনে মহিলাদের জন্য 33% আসন সংরক্ষণ।
- গার্হস্থ্য হিংসা
- চাকুরির অধিকার ... তাছাড়া, আরও অনেক বিষয় রয়েছে, তোমাদের পছন্দের বিষয় বেছে নাও।

3. সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভোট গ্রহণ করা হবে।

4. মহিলাদের ভোট প্রদান, সরকারি আধিকারিক রূপে কাজ এবং প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার থাকা আবশ্যক। (Report of the Sub-Committee, 'Woman's Role in Planned Economy', 1947: 37-38)

স্বাধীনতার দুই দশক পর, 1970 সালে নারী সম্পর্কিত বিষয়ের পুনঃউদ্ভব লক্ষ করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনগুলো মূলত সতীদাহ, বাল্যবিবাহ অথবা বিধবাদের প্রতি অমানবিক ব্যবহারের মতো কু প্রথাগুলোর, পুলিশি হেফাজতে নারী ধর্ষণ, পণের জন্য খুন, প্রচলিত গণমাধ্যমে মহিলাদের ছবি এবং অসম উন্নয়নের লিঙ্গগত প্রভাবের মতো আধুনিক সমস্যাগুলোর উপর জোর দেওয়া হয়। 1980 সালে এবং পরবর্তীকালে আইন পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু হয়, বিশেষ করে যখন এটা লক্ষ্য করা হয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে মহিলা সম্পর্কিত অধিকাংশ আইনের কোন সংস্কারই ঘটেনি। তবে যেই মাত্র আমরা একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করি, লিঙ্গাভিত্তিক অবিচারের নতুন দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের লিঙ্গা অনুপাত হ্রাসের উপর আলোচনাটি মনে করে দেখ। শিশু লিঙ্গা অনুপাতে তীব্র হ্রাস এবং কন্যা শিশুর বিরুদ্ধে অন্তর্নিহিত সামাজিক পক্ষপাতের ঘটনাগুলো লিঙ্গা বৈষম্যতার নতুন প্রতিবন্ধকতা রূপে প্রকাশ পায়।

সামাজিক পরিবর্তন, তা নারীদের অধিকারের ক্ষেত্রেই হোক বা অন্যান্য ক্ষেত্রেই হোক, সেটা একই সঙ্গো সকলের জন্য কখনো হওয়া সম্ভব নয়। অন্যান্য সামাজিক সমস্যার সংগ্রাম দীর্ঘ হয়, তাই ভারতেও নারী আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত অধিকার বজায় রাখতে সংগ্রাম করতে হবে ও পাশাপাশি নতুন সমস্যা সমাধানে কাজ করতে হবে।

5.4 দিব্যাঙ্গাদের (DISABLED) সংগ্রাম

ভিন্নভাবে সক্ষমদের শুধু শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী বলেই দিব্যাঙ্গা বলা হয় না, এছাড়াও আর একটি কারণ হল আমাদের সমাজ তাদের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করতে অসফল। দলিত; আদিবাসী বা নারী অধিকারের তুলনায় দিব্যাঙ্গাদের অধিকার অতি সম্প্রতিকালে স্বীকৃতি লাভ করে যদিও সকল ঐতিহাসিক কালে, সকল সমাজে দিব্যাঙ্গারা বিদ্যমান। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে অনিতা ঘাই নামে একজন সক্রিয় কর্মী ও পণ্ডিত যিনি দিব্যাঙ্গাদের নিয়ে কাজ করেন, বলেন র‍্যালফ এলিসন-এর 'অদৃশ্য মানব' (Invisible Man) এর সঙ্গো সমাজে দিব্যাঙ্গাদের অদৃশ্যতার স্থিতি তুলনা করা যায়। এলিসনের উপন্যাসের নামটি যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত আমেরিকায় বসবাসরত আফ্রিকানদের (African American) প্রতি বর্ণবাদকে নির্দেশ করে।

আমি অদৃশ্য, আমায় দেখা যায় না, শুধুমাত্র এই কারণে যে মানুষ আমায় দেখতে অস্বীকার করে। সার্কাসের পার্শ্ব প্রদর্শনে তোমরা কখনো কখনো যেমন শরীর বিহীন মাথা দেখ ঠিক তেমনি আমি যেন শক্ত বিকৃত কাচের আয়না দ্বারা ঘেরা।

যখন তারা আমার কাছাকাছি আসে, তারা তাদের কল্পনার মিথ্যা উদ্ভাবনের মাধ্যমে আমার পরিবেষ্টন দেখেও তাদের নিজেদের দেখে। প্রকৃতপক্ষে, তারা আমাকে ছাড়া সবকিছু লক্ষ্য করে। (এলিসন, 1952:3)

'দিব্যাঙ্গ' শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ কেন না তা আমাদের সমাজে বিদ্যমান 'দিব্যাঙ্গ' সম্পর্কিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাড় করায়।

এখানে সমগ্র বিশ্বের 'দিব্যাঙ্গ' সম্পর্কিত মুখ্য সামাজিক ধারণার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে ঃ-

- দিব্যাঙ্গতাকে জৈবিক হিসাবে বোঝা হয়।
- যখনই একজন দিব্যাঙ্গ ব্যক্তি সমস্যার সম্মুখীন হয়, এটা ধরে নেওয়া হয় যে তার অক্ষমতাই সমস্যাটির উৎস।
- দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিকে সাধারণত প্রতারিত বলে গণ্য করা হয়।
- দিব্যাঙ্গতাকে দিব্যাঙ্গ ব্যক্তির আত্মবোধের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত করা হয়।
- 'দিব্যাঙ্গ' তার ধারণাটি ইঙ্গিত দেয় যে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে।

ভারতে 'দিব্যাঙ্গতা', অপূর্ণতা, বিকলাঙ্গ, অন্ধ এবং 'বধির' শব্দগুলো সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রায়ই এই ধারণাগুলো মানুষকে অপমান করতেও ব্যবহৃত হয়। এমন একটি সংস্কৃতি যেখানে শারীরিক 'পরিপূর্ণতা' কাম্য, সেখানে যে কোনও প্রকারের শারীরিক বিচ্যুতিকে অস্বাভাবিকতা, খুঁত বা বিকৃতি বলে গণ্য করা হয়। 'বেচারা'— (দুর্বল ব্যক্তি) শব্দের দ্বারা দিব্যাঙ্গ ব্যক্তির প্রতারিত অবস্থাকে আরো জোরালো করা হয়। এই প্রকারের আচরণের মূল উৎস সাধারণত সাংস্কৃতিক ধারণা যা একটি প্রতিবন্ধী শরীরকে ভাগ্যের ফল হিসাবে দেখতে শেখায়। ভাগ্যকে অপরাধী ও দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিকে প্রতারিত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়। সাধারণ উপলব্ধিতে দিব্যাঙ্গতাকে পূর্ব কর্মের প্রতিফলন রূপে দেখা হয় ও তার থেকে মুক্তির কোনও উপায় নেই। তাই ভারতের প্রভাবশালী গঠনমূলক সংস্কৃতিতে দিব্যাঙ্গতাকে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য রূপে দেখা হয়। পৌরাণিক কাহিনিগুলোতে জনপ্রিয় দিব্যাঙ্গ চরিত্রকে ব্যাপক নেতিবাচক রূপে প্রতিফলিত করা হয়েছে।

তাই এই 'দিব্যাঙ্গ' শব্দটি-এর সঙ্গো সম্পর্কিত প্রত্যেকটি ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে। আজ 'মন্দীভূত' (retarded) 'বিকলাঙ্গ', বা 'পঙ্গু'-র মত বিভিন্ন নেতিবাচক শব্দগুলোকে 'মানসিক প্রতিবন্ধী', 'দৃষ্টিমূলক ত্রুটি সম্পন্ন ব্যক্তি' এবং শারীরিকভাবে অক্ষম-এর মতো শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। দিব্যাঙ্গরা শুধু জৈবিক কারণেই দিব্যাঙ্গ নয়। তাছাড়াও সমাজ তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই উপস্থাপিত করে।

আমরা গঠনগতভাবে দিব্যাঙ্গ যা সমাজে আমাদের স্বীকৃতির কথা মাথায় রেখে গঠিত হয়নি অর্থাৎ আমরা স্বীকৃতি পাই না এবং এই না পাওয়া আমাদের শিক্ষা, রোজগার ব্যবস্থাপনা, সামাজিক জীবনে আরও বেশি দিব্যাঙ্গতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। দিব্যাঙ্গতার উৎস ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা নয়, সেটা আমাদের সামাজিক কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত (Brisenden 1986 :176)

কাজ 5.8

- বিভিন্ন প্রথাগত বা পৌরাণিক কাহিনীগুলোতে কিভাবে দিব্যাঙ্গদের দেখানো হয়েছে তা খুঁজে বের করো। তোমরা পৃথিবীর যে কোনো অংশ থেকে বা ভারতের যেকোনো অংশের প্রথাগত কথকথা (story telling) বা অসংখ্য আঞ্চলিক লোককথা, পৌরাণিক কাহিনি থেকে এগুলো সংগ্রহ করতে পারো।
- দিব্যাঙ্গদের প্রতি নেতিবাচক আচরণ প্রদর্শনে ব্যবহৃত প্রচলিত কথা বা প্রবাদবাক্যের একটি তালিকা তৈরি করো।

দিব্যাঙ্গতার সামাজিক গঠনে অন্য আর একটি দিক আছে। দিব্যাঙ্গতা এবং দারিদ্রতা ওতোপ্রতোভাবে সম্পর্কযুক্ত। অপুষ্টি, কম সময়ের ব্যবধানে অধিক সন্তান জন্মের কারণে দুর্বল মা, অপর্যাপ্ত টীকাকরণ, অপরিসর, অধিক সংখ্যক সদস্যযুক্ত ঘরে দুর্ঘটনা — এই সব কিছুই দরিদ্রদের মধ্যে বেশিরভাগ সময়ে দিব্যাঙ্গতার কারণ হয় যা সহজ অবস্থায় বসবাস করা মানুষদের চেয়ে ভিন্ন। তাছাড়া, দিব্যাঙ্গতা শুধু ব্যক্তির জন্য নয়, পরিবারের জন্যও গুরুতর দারিদ্রতার সৃষ্টি করে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে দরিদ্র দেশগুলোতে দিব্যাঙ্গরা অধিকাংশই দরিদ্রতর হয়।

কাজ 5.9

তোমরা কি ইকবাল সিনেমটি দেখেছো? যদি না দেখে থাক তাহলে দেখার চেস্টা করো। এটা একটি ছোট ছেলের আদর্শ এবং স্থির সংকল্পের গল্প যে কানে শুনতে পায় না এবং কথাও বলতে পারে না। কিন্তু তার ক্রিকেট খেলার প্রতি গভীর আসক্তি ছিল এবং শেষে সে একজন বিখ্যাত বোলার রূপে খ্যাতি অর্জন করে। এই সিনেমাটি শুধু ইকবালের সংগ্রামের ছবিকেই জীবন্ত করে না, এছাড়াও ভিন্নভাবে সক্ষম কথাটির বাস্তব অর্থগুলোও তুলে ধরে।

বাক্স 5.8

2011 সালের জনগণনায় দিব্যাঙ্গদের জন্য কার্যধারা ঃ

- 2011 সালের জনগণনার জনসংখ্যা গণনা পর্বে 'পারিবারিক তালিকা'র মাধ্যমে দিব্যাঙ্গতার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল।
- পরিবারের সকল সদস্যকে দিব্যাঙ্গতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল।
- গণনাকারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা উত্তরদাতা ছাড়াও পরিবারে যদি কোনো দিব্যাঙ্গ ব্যক্তি থাকে তার সঙ্গে কথা বলতে।
- এইকাজের জন্য 'রাষ্ট্রীয়' (National), 'প্রাতিষ্ঠানিক' (Institutional) এবং 'পারিবারিক' (Household) সকল ক্ষেত্রকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।
- সকল রাজ্যের নগরীয় এবং গ্রামীণ নমুনাগুলোকে নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠান এবং নোডাল মন্ত্রকের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করে এবং নির্দিষ্ট দিব্যাঙ্গতার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রশ্নকে যথা স্থানে পরীক্ষা (field trial) করার পর দিব্যাঙ্গতা সম্পর্কে প্রশ্ন এবং নির্দেশগুলোকে চূড়ান্ত করা হয়।
- প্রশ্নের চূড়ান্তকরণের জন্য দিব্যাঙ্গতার ধরণ/প্রকারের উপর নির্ভর করে একটি সাধারণ তালিকা প্রস্তুত করা হয় যা গণনাকারী এবং উত্তরদাতা, পরিকল্পক এবং নীতি নির্ধারকের তথ্যের প্রাসঙ্গিকতার জন্য; 1995 এর প্রতিবন্ধী আইন (Disability Act.) এবং 1999 এর জাতীয় আস্তা আইনে (National Trust Act.) অন্তর্ভুক্ত সব ধরনের দিব্যাঙ্গতা সম্পর্কে প্রশ্ন করার সুবিধার জন্য করা হয়।
- নির্দিষ্ট ধরনের দিব্যাঙ্গতার জন্য কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- 2001 সালের জনগণনায় দেখানো পাঁচ ধরনের দিব্যাঙ্গতার জায়গায় এখানে আট ধরনের দিব্যাঙ্গতা সম্পর্কে তথ্য একত্রিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল।
- জনগণনার তালিকায় দিব্যাঙ্গতা সম্পর্কে প্রশ্নগুলোর স্থান পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং সেটাকেই কাজে লাগানো হয়েছিল।
- অন্তর্ভুক্তির পরিধি উন্নত করার জন্য বিশেষ প্রচেস্টা নেওয়া হয়েছিল যার অন্তর্ভুক্ত ছিল গণননাকারী এবং প্রচার ব্যবস্থার বিস্তৃত প্রশিক্ষণ।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে দিব্যাঙ্গরাই প্রচেস্টা করে। বাক্স 5.8 এ দেওয়া বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সরকার পদক্ষেপ নিয়েছিল।

সম্প্রতিকালে দিব্যাঙ্গদের নিজেদের প্রচেস্টাতে সমাজে কিছু সচেতনতা গড়েউঠেছে, যা আমাদের 'দিব্যাঙ্গতা' সম্পর্কে পুনঃরায় ভাবতে শেখায়। পরবর্তী পৃষ্ঠাতে পত্রিকার প্রতিবেদন দ্বারা ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

বিস্তৃত শিক্ষা পদ্ধতিতে দিব্যাঙ্গদের স্বীকৃতি অনুপস্থিত। শিক্ষা ব্যবস্থার ঐতিহাসিক অনুশীলনে এটা স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে শিক্ষা ব্যবস্থায় দুই ধরনের ধারা বা পদ্ধতি বজায় রেখে দিব্যাঙ্গদের দূরে সরিয়ে রাখা হয় যেমন — একটি দিব্যাঙ্গদের জন্য এবং অপরটি অন্যান্য শিক্ষার্থীদের জন্য।

বাক্স 5.9

'দিব্যাঙ্গাতা - প্রতিকূল' আদালত

উচ্চ বিচার বিভাগের কেটি 'স্বতন্ত্র' নীতি হিসাবে বিচারক পদের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অ-বিবেচনার বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে, একজন প্রবীণ আইনজ্ঞ বলেন প্রতিবন্ধীদের অবজ্ঞাকে অব্যাহত রেখে বিচার বিভাগ সংবিধিবদ্ধ আদেশকে অমান্য করছে। উচ্চবিচারালয় নিজেকে 'দিব্যাঙ্গা- অনুকূলতা' থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। বিচারালয়ের সকল প্রবেশপথেই সিঁড়ি বসানো কিন্তু কোথাও চালু রাস্তা (ramp) নেই। এমনকি শুধু লিফ্‌ট-এর সুবিধা পেতে হলেও একজনকে অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে যেতে হয়।

শহরের লোক আদালত (City Civil Court) যেখানে বিভিন্ন ধরনের দিব্যাঙ্গ অথবা আহত ব্যক্তিরা দুর্ঘটনার জন্য দাবির শুনানিতে আদালতে আসে, সেখানকার অবস্থা আরও খারাপ। একজন আইনজীবীর মতে, প্রায়ই এটা দেখা যায় যে দিব্যাঙ্গ অথবা আহত ব্যক্তিদের তাদের সঙ্গী বা সহযোগীদের সাহায্য নিয়ে আদালতে যেতে হয়।

The Hindu *Wednesday 2 August 2006.*

এই অধ্যায়ে আমরা জাতি, উপজাতি, লিঙ্গ এবং দিব্যাঙ্গাতাকে প্রতিষ্ঠান রূপে দেখেছি যা অসাম্য এবং বহিষ্কারের সৃষ্টি করে ও সেটার স্থায়িত্ব প্রদান করে। তা সত্ত্বেও, তারা এই অসাম্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের উত্তেজনাকে উদ্দীপ্ত করে ঐতিহাসিকভাবে। সমাজ বিজ্ঞানে অসাম্যতাকে শ্রেণি, প্রজাতি ও সম্প্রতিকালে লিঙ্গের প্রভাবের ভিত্তিতে বোঝা হতো। জাতি এবং উপজাতির মতো অন্যান্য ধরনের জটিলতাগুলো একমাত্র পরবর্তী সময়েই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে, এখন জাতি, উপজাতি এবং লিঙ্গ উপযুক্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্র এখনও বিদ্যমান যেখানে বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন। যেমন- ধর্মগতভাবে বা অন্যান্য ধরনের প্রান্তিক লোকরা। ধর্ম ও জাতি, লিঙ্গ ও জাতি অথবা জাতি ও অঞ্চলের ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত জটিল গোষ্ঠীও সুদূর ভবিষ্যতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এরই একটি উদাহরণ হল সাচার কমিটি রিপোর্ট (Sachar Committee Report)

বাক্স 5.10

এমন একটি দেশ যেখানে 5-14 বছর বয়স গোষ্ঠীর অর্ধেক শিশুরা বিদ্যালয়ের বাইরে, সেখানে কিভাবে দিব্যাঙ্গা শিশুদের জন্য স্থান হবে, বিশেষকরে যদি একটি পৃথকীকৃত বিদ্যালয়ের দাবি হয়? যদিও আইনগতভবে দিব্যাঙ্গা শিশুর জন্য শিক্ষা সহজলভ্য করার চেষ্টা করা হয়, তাসত্ত্বেও গ্রামের পিতামাতারা তাদের দিব্যাঙ্গা শিশুর ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এই পদক্ষেপকে সহায়ক বলে মনে করে না। এর পরিবর্তে তারা কুয়ো থেকে জল তোলার ভাল ব্যবস্থা ও উন্নত কৃষি ব্যবস্থার মতো পদক্ষেপের পক্ষে। একইভাবে নগরীয় বস্তিতে বসবাসকারী পিতামাতারাও চায় যে শিক্ষা কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হোক যা তাদের শিশুর জীবনের সাধারণ মান বাড়াতে সাহায্য করবে।

Source: Anita Ghai 'Disability in the Indian Context', 2002:93

কাজ 5.10

- উপরের লেখাটি পড় এবং কিভাবে দিব্যাঙ্গাদের সমস্যাগুলো সামাজিকভাবে গঠিত হয় তার বিভিন্ন উপায়গুলোকে আলোচনা করো।

প্রশ্নাবলী

1. কীভাবে সামাজিক অসাম্যতা ব্যক্তিভিত্তিক অসাম্যতা থেকে ভিন্ন ?
2. সামাজিক স্তরবিন্যাসের কিছু বৈশিষ্ট্য কি কি ?
3. কীভাবে তোমরা পূর্ব ধারণাকে অন্য প্রকারের মতামত বা বিশ্বাস থেকে পৃথক করবে ?
4. সামাজিক বহিষ্কার কি ?
5. বর্তমানকালে জাতি এবং অর্থনৈতিক অসাম্যের মধ্যে কি সম্পর্ক রয়েছে ?
6. অস্পৃশ্যতা কী ?
7. জাতিগত অসাম্যতা সমাধানে কিছু নীতির বর্ণনা করো।
8. কীভাবে পিছিয়ে পড়া জাতি (OBC) দলিত (তপশিলি জাতি) থেকে ভিন্ন ?
9. বর্তমানকালে আদিবাসীদের প্রধান সমস্যা কি কি ?
10. ঐতিহাসিক স্তরে নারী আন্দোলন কি কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাজ করছে ?
11. কি পরিপ্রেক্ষিতে এটা বলা যেতে পারে যে 'দিব্যাঙ্গতা' শারীরিক দিক থেকে বেশি সামাজিক দিকের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত ?

REFERENCES

Bourdieu, Pierre. 1986. 'The Forms of Capital', in Richardson, John G. ed. *Handbook of Theory and Research in the Sociology of Education.* Greenwood Press. New York.

Brisenden, Simon. 1986. 'Independent Living and the Medical Model of Disability', in *Disability, Handicap and Society.* V.1, n.2, pp. 173-78.

Deshpande, Satish. 2003. *Contemporary India: A Sociological View.* Penguin Books. New Delhi.

Ellison, R. 1952. *Invisible Man.* Modern Library. New York.

Fernandes, Walter. 1991. 'Power and Powerlessness: Development Projects and Displacement of Tribals', in *Social Action.* 41:243-270.

Fuller. C.J. ed. 1996. *Caste Today.* Oxford University Press. New Delhi.

Ghai, Anita. 2002. 'Disability in The Indian Context', in Corker, Marian. and Shakespeare, Tom. ed. *Disability/Postmodernity: Embodying Disability Theory.* Continuum. London, pp. 88-100.

Ghai, Anita. 2002. 'Marginalisation and Disability: experiences from the third world', in Priestly, M. ed. *Disability and the Life Course: Global Perspectives.* Cambridge University Press. Cambridge.

Giddens, Anthony. 2001. *Sociology*. 4th edition, Polity Press. Cambridge.

Jeffery, Craig, Jeffery, Roger. and Jeffery, Patricia. 2005. 'Broken Trajectories: Dalit Young Men and Formal Education', in Chopra, Radhika. and Jeffery, Patricia. ed. *Educational Regimes in Contemporary India.* Sage Publications. New Delhi.

REFERENCES

Karna, G.N. 2001. *Disability Studies in India: Retrospect and Prospects.* Gyan Publishing House. New Delhi.

Macionis, John J. 1991. *Sociology.* Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Mander, Harsh. 2001. *Unheard Voices: Stories of Forgotten Lives.* Penguin India. New Delhi.

Shah, Ghanshyam. Mander, Harsh. Thorat, Sukhadeo. Deshpande, Satish. and Baviskar, Amita. 2006. *Untouchability in Rural India.* Sage Publications. New Delhi.

Sharma, Ursula. 1999. *Caste (Concepts in the Social Sciences Series).* Open University Press. Buckingham and Philadelphia.

Srinivas, M.N. ed. 1996. *Caste: Its Modern Avatar.* Viking Penguin. Delhi.

Zaidi, A.M. and Zaidi, S.G. 1984. 'A fight to Finish', in *Annual Report of the Indian National Congress 1939-1940.* Vol. 11,1936-1938; and 12, 1939-1946,

Notes

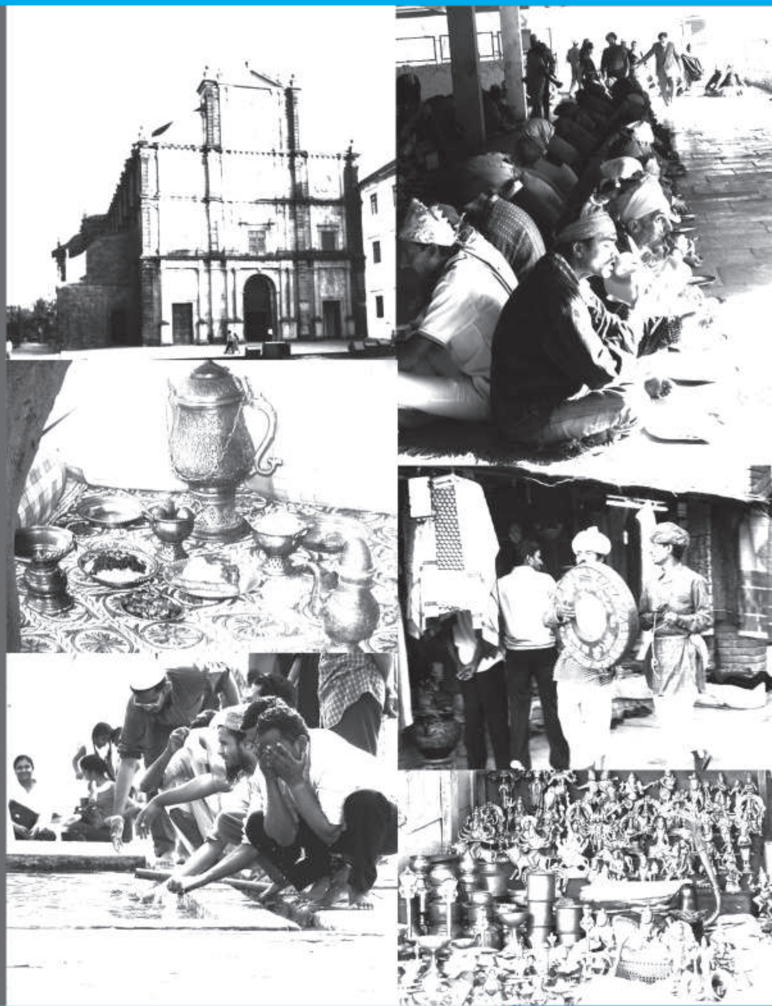

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতিবন্ধকতা

বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যেমন পরিবার থেকে বাজার, মানুষকে একত্রিত করে, বলিষ্ঠ যৌথ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে এবং সামাজিক একতাকেও শক্তিশালী করে তোলে যা তোমরা পূর্বের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে দেখেছে। কিন্তু অন্যদিকে চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, এই প্রতিষ্ঠানগুলোই আবার অসাম্যতা ও বহিষ্কারেরও উৎস। এই অধ্যায়ে তোমরা সামাজিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিছু চিন্তা এবং সমস্যা সম্পর্কে অবগত হবে। সঠিকভাবে 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য' বলতে কি বোঝায় এবং কেন তাকে প্রতিবন্ধকতা রূপে দেখা হয়?

'বৈচিত্র্য' শব্দটি ভিন্নতাকে বোঝায়, অসাম্যতাকে নয়। যখন আমরা ভারতবর্ষকে একটি মহান সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দেশ বলে আখ্যায়িত করি, তখন আমরা বোঝাই যে এখানে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় একসাথে বসবাস করে। এই সকল সম্প্রদায়গুলো ভাষা, ধর্ম, উপদল, বর্ণ অথবা জাতির মত সাংস্কৃতিক চিহ্নিতকারী বিষয় দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়। যখন এই বিচিত্র সম্প্রদায়গুলো আবার দেশের মতো এক বৃহৎ সত্তার অংশ হয়, তখন তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা দ্বন্দ্বের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন সমস্যার।

এইভাবে সাংস্কৃকি বৈচিত্র্য কঠিন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সমস্যার সৃষ্টি হয় এই ঘটনা থেকে যে সাংস্কৃতিক পরিচিতিগুলো ব্যাপক শক্তিশালী — তারা তীব্র আবেগ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম এবং প্রায়শ প্রচুর সংখ্যক মানুষকে সচল করতে পারে। কখনো কখনো সাংস্কৃতিক ভিন্নতার সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অসাম্যতাও যুক্ত হয় এবং ব্যাপারটিকে আরও জটিল করে তোলে। একটি সম্প্রদায়ের অসাম্যতা বা অবিচারকে মোকাবিলা করার জন্য নেওয়া পদক্ষেপ অন্য সম্প্রদায়ের দ্বারা বিরোধিতার সৃষ্টি করতে পারে। এই পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে যখন নদীর জল, চাকরি বা সরকারি তহবিলের মতো দুষ্প্রাপ্য সম্পদগুলি ভাগ করে ব্যবহার করতে হয়।

যদি তোমরা নিয়মিত খবরের কাগজ পড় বা টিভিতে খবর দেখ, তাহলে তোমাদের হয়তো বা প্রায়শই এই ভেবে বিষণ্ণতাবোধ হয়েছে যে ভারতবর্ষের কোন ভবিষ্যৎ নেই। দেশের একতা এবং অখণ্ডতাকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে অনেক বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তি কাজ করে চলছে — যেমন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, আঞ্চলিক স্বশাসনের জন্য চাহিদা, জাতি ভিত্তিক যুদ্ধ ইত্যাদি। তোমরা হয়তো বা দুঃখিত হয়েছ এই ভেবে যে জনসংখ্যার একটি বড় শ্রেণি স্বদেশপ্রেমী নয় এবং তোমার ও তোমার সহপাঠীদের মতো দেশের জন্য গভীর ভাবে অনুভূতিপ্রবণ নয়। কিন্তু তোমরা যদি আধুনিক ভারতের ইতিহাস সম্পর্কিত বা সম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতাবাদ সম্পর্কিত কোন পুস্পক দেখ (উদাহরণস্বরূপ, Brass 1974), তাহলে তোমরা উপলব্ধি করবে যে এই সমস্যাগুলো নতুন নয়। আজকের প্রায় সকল 'বিভেদ সৃষ্টিকারী' সমস্যাগুলি স্বাধীনতার সময় থেকে অথবা তার পূর্বেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাসত্ত্বেও শুধু দেশ হিসাবে টিকে থাকা নয়, ভারত আজ একটি শক্তিশালী জাতি — রাষ্ট্র।

এই অধ্যায়টি পড়তে যখন তোমরা নিজেকে প্রস্তুত করেছ, মনে রাখবে এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে এমন কঠিন সমস্যার যার কোন সহজ সমাধান বা উত্তর নেই। কিন্তু কিছু উত্তর অন্যান্য উত্তরের চেয়ে ভালো এবং নাগরিক হিসাবে আমাদের সর্বাধিক চেষ্টা করতে হবে ঐতিহাসিক ও সামাজিক সীমবন্ধতার মধ্যে থেকেই শ্রেষ্ঠ উত্তর বা সমাধান খুঁজে বের করার। এটাও মনে রাখবে যে, এই বিশাল ও অত্যন্ত বিচিত্র জনসংখ্যা এবং সংস্কৃতির অপরিসীম প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, ভারত অন্যান্য দেশের তুলনায় মোটামুটি ভালোভাবে কাজ করেছে। অন্যদিকে আমাদেরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভুল ত্রুটি রয়েছে। তাই যেমন উন্নতি করার অনেক ক্ষেত্র আছে তেমনি ভবিষ্যতে প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলার জন্যও প্রচুর কাজ করা আবশ্যক।

6.1 সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় ও জাতিরাষ্ট্র

ভারতে বৈচিত্র্যতার কারণে যে ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা — যেমন আঞ্চলিকতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতিভেদ সম্পর্কিত আলোচনার পূর্বে, আমাদের প্রয়োজন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় ও জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কটিকে বোঝার। কেন সাংস্কৃতিক পরিচিতি যেমন, জাতি, নৃজাতীয় গোষ্ঠী, অঞ্চল বা ধর্মের ভিত্তিতে সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মানুষের বসবাস করা গুরুত্বপূর্ণ? কেন এত আবেগের জাগরণ হয় যখন মানুষ তার নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন, অপমান বা অবিচার বোধ করে? কেন এই সকল আবেগ জাতি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সমস্যার কারণ?

সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের গুরুত্ব

এই পৃথিবীতে সক্রিয় থাকতে, প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন একটি স্থায়ী পরিচয়ের। আমাদের জীবনে ছেলেবেলা থেকেই সবসময় এই ধরনের কিছু প্রশ্ন জাগে যেমন — আমি কে? কি ভাবে আমি অন্যদের চেয়ে ভিন্ন? কিভাবে অন্যরা আমায় বোঝে এবং গ্রহণ করে? কি ধরনের লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা আমার থাকা উচিত? এরকম অনেক প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে সক্ষম কেননা আমরা এমন পদ্ধতিতেই সমাজীকৃত হই, অর্থাৎ আমাদের পরিবার এবং সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সমাজে কিভাবে বসবাস করতে হয় সেটা আমরা শিখি। (একাদশ শ্রেণির পাঠ্য বইয়ের সামাজিকীকরণের উপর আলোচনাটি মনে করে দেখ)। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত রয়েছে অনবরত কথোপকথন, আলাপ আলোচনা ও 'গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্যদের' (Significant Others) বিরুদ্ধে লড়াই (এখানে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্যরা বলতে তাদের বোঝায়, যারা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের জীবনে সম্পর্কযুক্ত) যেমন পিতামাতা, পরিবার, আত্মীয় গোষ্ঠী এবং আমাদের সম্প্রদায় আমাদের ভাষা (মাতৃভাষা) এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রদান করে, যার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীকে বুঝতে শিখি। এটা আমাদের আত্মপরিচয়ও গড়তে সাহায্য করে।

জন্ম এবং 'একাত্মতা' সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের ভিত্তি এবং কোন ধরনের অর্জিত যোগ্যতা বা উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল নয়। এই পরিচয় আমাদের জন্মগত পরিচয় সম্পর্কিত, যেখানে আমাদের 'যোগ্যতার' পরিচয়ের কোনো গুরুত্ব থাকে না। সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করতে কিছু করতে হয় না— আসলে এটা ব্যক্তির ব্যক্তিগত পছন্দের বাইরে যে সে কোন্ পরিবার বা সম্প্রদায়ে বা দেশে জন্ম নেবে। এই প্রকারের পরিচয়গুলোকে 'আরোপিত' বলা হয়, অর্থাৎ এই পরিচয় নির্ধারিত হয় জন্মসূত্রে এবং তা ব্যক্তির ব্যক্তিগত পছন্দের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। সামাজিক জীবনে এটা এক অদ্ভুত ঘটনা যে মানুষ নিজস্ব সম্প্রদায়ে নিরাপদ ও সন্তুষ্টি বোধ করে, অথচ সেই সম্প্রদায়ে তার সদস্যতা সম্পূর্ণরূপে আকস্মিক। আমরা প্রায়শ সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিজেকে অবিচ্ছেদ্য রূপে একাত্ম করি, কিন্তু সেই সম্প্রদায়ের 'উপযুক্ত' সদস্য হবার জন্য আমরা কিছুই করি না — যেমন কোন পরীক্ষা পাশ করি না, কোন দক্ষতা বা কর্মদক্ষতার প্রদর্শন করি না ... তাই এটা পেশাগত দলের সদস্য হওয়ার থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। একজন ডাক্তার বা নির্মাতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় এবং তার কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করতে হয়। খেলাধূলার ক্ষেত্রেও একটি দলের সদস্যতা অর্জন করার পূর্ব শর্ত হল নির্দিষ্ট কিছু দক্ষতা এবং প্রদর্শিত ক্রীড়াকৌশলাদি। অথচ আমাদের পরিবারে বা ধর্মীয় বা আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের সদস্যতা কোন পূর্বশর্ত ছাড়াই হয় এবং তা সম্পূর্ণরূপে হয়। বাস্তবে, বেশিরভাগ আরোপিত পরিচয়গুলো থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন; যদিও আমরা সেই পরিচয়গুলি প্রত্যাখ্যান করি, তা সত্ত্বেও অন্যরা হয়তো বা সেই পরিচয়ের ভিত্তিতেই আমাদের চিহ্নিত করতে থাকবে। সম্ভবত এই আকস্মিক, শর্তহীন ও প্রায় অপরিহার্য একাত্মতার কারণে আমরা সাম্প্রদায়িক পরিচিতির সঙ্গে আবেগপ্রবণভাবে সম্পর্কযুক্ত।

সাম্প্রদায়িক বন্ধনের বিস্তৃত ও অধিক্রমণ চক্র আমাদের সামাজিক পৃথিবীকে অর্থবহুল করে (পরিবার, আত্মীয়, জাতি, নৃজাতি, ভাষা, অঞ্চল বা ধর্ম) এবং আত্মপরিচয়বোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তাই মানুষ নিজের সাম্প্রদায়িক পরিচয়ে যখন হুমকি বা ভয় প্রদর্শন বোধ করে, তখন সাধারণত সে আবেগপূর্ণ বা হিংসাত্মক রূপে সাড়া দেয়।

কাজ 6.1

সাম্প্রদায়িক বন্ধনের বিস্তৃত চক্রগুলি যা আমাদের আত্মপরিচয়কে আকার দেয় তা স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য, তোমরা একটি ছোট সমীক্ষা খেলা রূপে করতে পারো। তোমার বিদ্যালয়ের সহপাঠী কিংবা অন্যান্য বন্ধুদের সাক্ষাৎকার নাও ঃ প্রত্যেক সাক্ষাৎকারীকে দুটো প্রশ্নের জন্য চারবার সুযোগ দেওয়া হবে ঃ ‘আমি কে এবং অন্যরা আমার সম্পর্কে কি ভাবে?’ কিন্তু উত্তর দিতে হবে ‘এক কথায়’ বা ‘ছোট বাক্যে’। তারা কোন নাম উলেখ করতে পারবে না। (তোমার নিজের নাম বা পিতামাতা অভিভাবকের নাম; শ্রেণি বা বিদ্যালয়ের নাম দেওয়া যাবে না)। সাক্ষাৎকার একক এবং ব্যক্তিগতভাবে নিতে হবে। অর্থাৎ অন্য কোন সাক্ষাৎকারীরা উত্তরগুলো যেন শুনতে না পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির মাত্র একবারই সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে (একই ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষাৎকারক দ্বারা স াক্ষাৎকার নেওয়া যাবে না)। তোমরা উত্তরগুলো রেকর্ড করে পরে বিশ্লেষণ করতে পারবে। কোন্ ধরনের পরিচয়গুলো প্রভাবশালী? সবচেয়ে প্রচলিত প্রথম পছন্দ কি? অন্তিম পছন্দই বা কোন্টা? উত্তরগুলোর কি কোন নমুনা আছে? ‘আমি কে’ এবং ‘অন্যরা আমার সম্পর্কে কি ভাবে?’ — এই দুটো প্রশ্নের উত্তর কি একে অপরের চেয়ে খুব ভিন্ন, কিছু ভিন্ন বা একদমই ভিন্ন নয়?

আরোপিত পরিচিতির এবং সাম্প্রদায়িক বোধের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল তারা সার্বজনীন। প্রত্যেকের একটি মাতৃভূমি, একটি মাতৃভাষা, একটি পরিবার, একটি বিশ্বাস রয়েছে। সাধারণ অর্থে তা সঠিক, কিন্তু তা প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে আবশ্যক নয়। তবে আমরা সমানভাবে সকল পরিচিতির সঙ্গে অনুগত এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আবার এমন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসাও সম্ভব যে তার নিজের পরিচয়ের সকল দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নাও হতে পারে। কিন্তু এই সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে বেশিরভাগ মানুষই সম্পর্কযুক্ত। এই সকল কারণে যে দ্বন্দ্ব আমাদের সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত (যেমন দেশ, ভাষা, ধর্ম, জাতি বা অঞ্চল সম্পর্কিত)। সেই সকল দ্বন্দ্বকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। দ্বন্দ্বে প্রতিপক্ষ অপর পক্ষকে শত্রু রূপে দেখে এবং নিজেদের সদ্‌গুণকে ও অন্যদের খুঁতকে অতিরঞ্জিত করার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। তাই, দুটো দেশেরমধ্যে যুদ্ধ চলাকালীন পরিস্থিতিতে, প্রত্যেক দেশের স্বদেশপ্রেমীরা অপর দেশকে আক্রমণকারী শত্রু রূপে গ্রাহ্য করে; প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে যে ভগবান এবং সত্য যেন তাদেরই পক্ষে। এই উত্তপ্ত মুহূর্তে উভয় পক্ষের মানুষের জন্য এটা বোঝা খুব কঠিন, যে তারা প্রত্যেকেই একই জিনিস রচনা করছে কিন্তু সেটা প্রত্যেকের প্রতিচ্ছবির বিপরীত।

এটা একটা সামাজিক সত্য যে, কোন দেশ বা গোষ্ঠী তার সদস্যদের অসত্য, অন্যায়, অবিচার বা অসাম্যতার জন্য লড়াই করার পথে চলতে শিখায় না — প্রত্যেকেই সর্বদা সত্য, ন্যায় বিচার, সমতার জন্য লড়াই করছে ... তার অর্থ এই নয় যে, প্রতিটি দ্বন্দ্বে উভয় পক্ষই সঠিক, অথবা কোন সঠিক এবং ভুল নেই, সত্য বলতে কিছুই নেই। কখনও কখনও দুটো পক্ষই সমানভাবে সঠিক বা ভুল হয়; অন্যান্য সময়ে, ইতিহাস এক পক্ষকে আক্রমণকারী/প্রতারক ও অন্য পক্ষকে প্রতারিত বলে বিচার করতে পারে। কিন্তু এটা হয়ে থাকে শুধুমাত্র উত্তপ্ত স্থিতি শান্ত হয়ে যাবার দীর্ঘদিন পরে। পরিচয় সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের পরিস্থিতিতে পরস্পর অনুমোদিত সত্য ধারণা স্থাপন করা কষ্টকর; এক পক্ষকে তার নিজের ভুল স্বীকার করতে সাধারণত কয়েক দশক শতাব্দী কখনও কখনও লেগে যায় (বাক্স 6.1 দেখো)।

বাক্স 6.1

'বিজেতা' যখন ক্ষমা প্রার্থনা করে

এটা কোন অসাধারণ ব্যাপার নয় যে যুদ্ধে পরাজিত পক্ষকে নিজের ভুল কাজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু এটা খুব কমই হয়ে থাকে যে বিজেতা পক্ষ নিজেদের ভুল বা দোষ স্বীকার করে নেয়। যাই হোক, বর্তমান সময়ে পৃথিবীময় এইধরনের অনেক উদাহরণ দেখা যাচ্ছে। দেশ বা সম্প্রদায় যারা 'বিজেতা' পক্ষের সঙ্গে ছিল, অথবা যারা এখনও প্রভাবশালী অবস্থানে আছে, তারা মেনে নিতে শুরু করেছে যে, অতীতের অন্যায়ের জন্য তারা দায়ী এবং এখন তারা পীড়িত সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

অস্ট্রেলিয়ার অস্ট্রেলিয় রাষ্ট্রের দ্বারা (বর্তমানে যেখানকার জন সংখ্যার বেশিরভাগই ইউরোপীয় উদ্ভুত সাদা চামড়ার লোক) সরকারি ভাবে সেখানকার মূল অধিবাসী যারা বলপূর্বক উপনিবেশীকরণের শিকার হয়েছিল তাদের বংশধরদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার ঘটনায় লম্বা সময় ধরে বিতর্ক চলছিল। অস্ট্রেলিয়ার বেশিরভাগ রাজ্যের সরকার নিম্নলিখিত কোন একটি প্রস্তাবের রূপে সেখানকার মূল অধিবাসীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে ঃ

> *আমরা, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উদ্ভুত, অস্ট্রেলিয়বাসী, পুনর্মিলনের ভাবনায় উৎসাহিত হয়ে এক সাথে এগিয়ে চলার প্রতিজ্ঞা করছি। আমরা আদিবাসী এবং টোরেস স্ট্রেইট দ্বীপের বাসিন্দাদের অন্যান্য মর্যাদার সঙ্গে এখানকার জল এবং স্থলের মূল অধিপতি এবং তত্ত্বাবধায়ক রূপে গুরত্ব প্রদান করছি।*
>
> *আমরা মেনে নিচ্ছি যে, এখানকার ভূমি এবং জলীয় অংশ কোন সন্ধি অথবা সম্মতি ছাড়াই, উপনিবেশ রূপে গড়া হয়েছিল (. . .)। আমাদের রাষ্ট্রের তার অতীতের ক্ষত সারাতে, এই সত্যতা স্বীকার করার সৎ সাহস থাকতে হবে যাতে আমরা সকলেই একসঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে চলতে এবং বসবাস করতে পারি। অতীতের ক্ষত সারানোর এই যাত্রায়, রাষ্ট্রের একটি অংশ অতীতের অন্যায়-অবিচারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং দুঃখ ও আন্তরিক অনুতাপ প্রকাশ করবে যাতে অন্য অংশ এই ক্ষমা প্রার্থনাকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রথম অংশকে ক্ষমা করে দেয় (. . .) এবং তাই আমরা এই প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমরা অন্যায়কে সমাপ্ত করে দেবো, অসুবিধাগুলোকে দূর করে দেবো এবং এই তথ্যের সম্মান করব যে আমাদের আদিবাসীদের এবং টোরেস স্ট্রেইট দ্বীপের বাসিন্দাদের রাষ্ট্রের সাধারণ জনজীবনের মধ্যে থেকে আত্ম নির্ণয়ের অধিকার আছে।*

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকার মূল সম্প্রদায় (যারা এই দেশের মূল অধিবাসী ছিল এবং যুদ্ধের মাধ্যমে বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছিল) এবং কালো নিগ্রো সম্প্রদায় (যাদের আফ্রিকা থেকে দাস হিসাবে আনা হয়েছিল) এর কাছে রাষ্ট্রীয় স্তরে ক্ষমা প্রার্থনা নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বিতর্ক চলে আসছে। এই বিষয়ে এখনো কোন সর্বসম্মতি হয়নি। জাপানে, সরকারি নীতির অন্তর্গত সেই সব অত্যাচারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা অনেক পূর্বে মানা হয়েছিল যা জাপানের দ্বারা যুদ্ধ এবং উপনিবেশিকীকরণের সময় পূর্ব-এশিয়ার অনেকাংশ বিশেষত কোরিয়া এবং চীনের কিছু অংশে করা হয়েছিল। এই সম্পর্কে অতি সম্প্রতি ক্ষমা প্রার্থী সেখানকার প্রধানমন্ত্রী জুনিচিরো কাইজুমির 2005 সালের 15 আগস্টে দেওয়া ভাষণে আছে ঃ

> *অতীতে, জাপান নিজের উপনিবেশিক শাসন এবং আক্রমণের মাধ্যমে অনেক দেশের, বিশেষত এশিয়া রাষ্ট্রের লোকদের অসাধারণ ক্ষতি এবং কষ্ট প্রদান করে। আন্তরিকভাবে, এই ঐতিহাসিক তথ্যকে স্বীকার করে, আমি আরও একবার গভীরভাবে অনুতপ্ত এবং আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা এবং দেশ বিদেশের সকল যুদ্ধ আক্রান্তদের প্রতি গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করছি যে, এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ থেকে যা শিক্ষা হয়েছে সেটা কোনদিন ভুলতে দেব না এবং যুদ্ধকে চিরদিনের জন্য বিদায় জানিয়ে বিশ্বের শান্তি এবং সমৃদ্ধিতে যোগদান করব।*

এই ধরনের বিতর্ক দক্ষিণ আফ্রিকাতেও চলছিল, যেখানে একজন সাদা চামড়ার সংখ্যালঘু ক্ষমতায় ছিল এবং স্থানীয় নিগ্রো সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতি অমানবিক অত্যাচার করছিল। ব্রিটেনেও এনিয়ে সর্বজনীন স্তরে আলোচনা চলছিল যে রাষ্ট্র কি উপনিবেশবাদ এবং দাস প্রথার সমর্থনে নিজেদের ভূমিকার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আশ্চর্যজনক বিষয় হল এই দাস প্রথা নিয়ে বিভিন্ন শহরেও আলোচনা হয় — উদাহরণস্বরূপ, ব্রিস্টলের বন্দর শহরে এই বিষয়ের উপর বিতর্ক শুরু হয়েছিল যে সেখানকার নগর পরিষদের কি এই ধরনের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত যাতে দাস প্রথায় ব্রিস্টলের ভূমিকার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়।

Sources:

http://en.wikipedia.org/wiki/Bringing_Them_Home#Apologies
http://www.kantei.go.jp/foreign/koizumispeech/2005/08/15danwa_e.html

কাজ 6.2

মনোযোগ সহকারে বাক্স 6.1 পড়। তোমার মতে এই ধরনের ক্ষমার উদ্দেশ্য কি? সর্বোপরি, বাস্তবে আসল প্রতারিত বা শোষিত দল এবং শোষকরা হয়তো বা দীর্ঘদিন আগেই মারা গেছে — তাদের ক্ষতিপূরণ বা শাস্তি দেওয়া সম্ভব নয়। তাহলে কি কারণে ও কাদের জন্য এই ধরনের ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়?

তোমরা কি অন্য কোন উদাহরণ সম্পর্কে ভাবতে পারো, যেখানে বেনামী সাধারণ মানুষ (অর্থাৎ এমন মানুষ যারা বিখ্যাত বা শক্তিশালী ছিল না), যারা আজ জীবিত নেই অথচ সর্বজনীন রূপে স্মরণীয়, উজ্জাপিত বা সম্মানিত? দিল্লির ইন্ডিয়া গেইট স্মৃতি স্তম্ভের মতো অন্যান্য স্মারক বা স্মৃতিস্তম্ভ কি উদ্দেশ্য সাধন করে? (উপরে উল্লিখিত স্মৃতিস্তম্ভ কার উদ্দেশ্যে নিবেদিত? যদি তোমরা না জেনে থাকো তাহলে খুঁজে বের করতে চেষ্টা কর)।

ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষাপটে কি ধরনের ক্ষমার কথা বাক্স 6.1 এ বলা হয়েছে। তোমাকে যদি এই রকম একটি বিষয়ের প্রস্তাব রাখতে বলা হয়, তাহলে তোমার মতে 'দেশ' হিসাবে আমাদের কোন্ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত? এবারে এটা তোমার শ্রেণিকক্ষে আলোচনা কর। বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রার্থীদের মতামতগুলো কি কি? শ্রেণিকক্ষের আলোচনার পর, এই ধরনের 'ক্ষমা' প্রার্থনার ক্ষেত্রে কি তোমার মতামতের কোন পরিবর্তন ঘটে?

সম্প্রদায়, দেশ এবং জাতি-রাষ্ট্র

প্রাথমিক স্তরে একটি দেশ হল এক ধরনের বড় মাপের সম্প্রদায় — এটা সম্প্রদায়গুলির সম্প্রদায়। একটি দেশের সদস্যরা একই রাজনৈতিক সমষ্টির অংশ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখে। এই রাজনৈতিক একতার বাসনা সাধারণত রাষ্ট্র গঠনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। তাই সাধারণ অর্থে, 'রাষ্ট্র' শব্দটি নির্দেশ করে এমন একটি বিমূর্ত সত্তা যার অন্তর্গত কিছু রাজনৈতিক-আইনি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেই প্রতিষ্ঠানগুলো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল এবং সেখানে বসবাস করা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। ম্যাক্স ওয়েবার এর সুপরিচিত সংজ্ঞায় রাষ্ট্র হল "একটি অঙ্গ যা বিশেষ এলাকায় সফলভাবে বৈধ শক্তির একটি একাধিপত্য দাবি করে" (ওয়েবার 1970:78)।

দেশ হল একটি অদ্ভুত প্রকারের সম্প্রদায় যা বর্ণনা করা সহজ অথচ সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। আমরা সাধারণ সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন — ধর্ম, ভাষা, নৃজাতি, ইতিহাস বা আঞ্চলিক সংস্কৃতির ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট দেশকে বর্ণনা করতে সক্ষম। কিন্তু একটি দেশের কোন সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য, কোন আবশ্যক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা কষ্টকর। প্রতিটি সম্ভাব্য নির্ণায়কের ব্যতিক্রমী এবং বিপরীত উদাহরণ ও রয়েছে। যেমন, অনেক দেশ আছে যেখানে একটিও সাধারণ ভাষা, ধর্ম, নৃজাতি ইত্যাদি নেই। অন্যদিকে এমনও দেশ বিদ্যমান যেখানে বহু ভাষা, ধর্ম বা নৃজাতি পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও সেটা একক ঐক্যবদ্ধদেশ গঠন করে না, যেমন সকলেই ইংরেজি ভাষাভাষী বা সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

তাহলে, কিভাবে আমরা একটি দেশকে অন্য ধরনের সম্প্রদায় যেমন নৃজাতীয় গোষ্ঠী (যা একটি প্রচলিত ভাষা বা সংস্কৃতি ছাড়াও একটি নির্দিষ্ট বংশের উপর নির্ধারিত), ধর্মীয় সম্প্রদায় বা আঞ্চলিক গোষ্ঠী থেকে পৃথক করব? ধারণাগত দিক থেকে দেখতে গেলে কোন কঠিন পার্থক্য নেই — যেকোন প্রকারের সম্প্রদায়, কোন এক দিন দেশ গড়তে পারে। বিপরীত ক্রমে, কোন বিশেষ ধরনের সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এটা নিশ্চিত রূপে বলা কঠিন যে তারা দেশ গঠন করতে পারবে।

কাজ 6.3

এটা কি বাস্তবে সত্য যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই যা প্রতিটি দেশেই পাওয়া যায়? তোমার শ্রেণিকক্ষে তা আলোচনা কর। দেশকে সংজ্ঞায়িত করে এমন কিছু সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা তৈরি কর। এই ধরনের প্রতিটি মানদণ্ডের জন্য এমন কিছু দেশের উদাহরণ দাও যারা এই মানদণ্ড মেনে চলে এবং এমন কিছু দেশের যারা এই মানদণ্ড লঙ্ঘন করে।

যদি তোমরা এমন এক মানদণ্ডের কথা ভাবো যাতে প্রতিটি দেশের অবশ্যকীয় ভৌগোলিক এলাকা ও অঞ্চল থাকতে হবে, তাহলে নিম্নলিখিত উদাহরণগুলো সম্পর্কে ভাবো (বিশ্ব মানচিত্রে প্রতিটি দেশ বা অঞ্চলকে চিহ্নিত করো; প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তোমাদের কিছু পূর্ব গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে ...)

- আলাস্কা এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র
- 1971 সালের পূর্বে পাকিস্তান (পূর্ব পাকিস্তান + পশ্চিম পাকিস্তান)
- মালভিনাস /ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ এবং ইউনাইটেড কিংডম (যুক্তরাষ্ট্র)
- অস্ট্রেলিয়া এবং জার্মানি
- ইকোয়াডর, কলোম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা
- ইমেন, সৌদি আরব, কোয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত

[Hint: প্রথম তিনটি ক্ষেত্রে একই দেশের ভৌগোলিক দিক থেকে দূরবর্তী অঞ্চলের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে; শেষ তিনটি উদাহরণ এমন কিছু দেশের যেখানে সংলগ্ন অঞ্চল, একই ভাষা ও সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হয় কিন্তু তারা ভিন্ন ভিন্ন জাতিরাষ্ট্র।]

■ এই উদাহরণের তালিকায় তোমরা কি কিছু যুক্ত করতে পারবে?

জাতি রাষ্ট্রকে যে মানদণ্ড দ্বারা বৈশিষ্ট্য প্রদান করে তা হল রাজ্য। পূর্বে উল্লিখিত ভিন্ন প্রকারের সম্প্রদায়ের মধ্যে, জাতি রাষ্ট্র হল সেই সম্প্রদায় যাদের নিজস্ব রাজ্য রয়েছে। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, সম্প্রতিকালে, জাতিরাষ্ট্র ও রাজ্যের মধ্যে একটি বন্ধন স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এটা এক নতুন উন্নয়ন। পূর্বে তা সত্য ছিল না যে একটি রাজ্য শুধু একটি জাতি রাষ্ট্রকে প্রতিনিধিত্ব করবে বা একটি জাতি রাষ্ট্রের নিজস্ব রাজ্য থাকা আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ, সোভিয়েত ইউনিয়ন সুষ্ঠুভাবে স্বীকৃতি দেয় যে তাদের অস্তিত্বে থাকাকালীন সময়ে তাদের শাসন করা, মানুষ বিভিন্ন 'রাষ্ট্রের' এবং সেই সময় একশোরও বেশি অভ্যন্তরীণ জাতির স্বীকৃতি দেওয়া হয়। একইভাবে, যে মানুষরা একত্রিত হয়ে রাষ্ট্র গঠন করে, তারা সেই রাষ্ট্রের নাগরিক অথবা বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাসিন্দাও হতে পারে। যেমন, জ্যামাইকাতে, বেশিরভাগ জ্যামাইকানরা বাইরে বসবাস করে অর্থাৎ জ্যামাইকার জনসংখ্যায় জামাইকার 'বাসিন্দার' চেয়ে 'অনাবাসী'দের সংখ্যা অনেক বেশি। অন্য আর একটি উদাহরণ হল 'দ্বৈত নাগরিকত্ব' আইন। এই আইন যে কোনও নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিককে একই সময় অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব নেওয়ার অনুমতি প্রদান করে। তাই, এই ধরনের একটি উদাহরণ হল, ইহুদি আমেরিকানরা একই সময় ইজরায়েল এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে; তারা একটি দেশের সশস্ত্র বাহিনীতেও কর্মরত হতে পারে অন্য দেশের নাগরিকত্ব না হারিয়ে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাষ্ট্রকে অন্যভাবে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন, তাই বলা যেতে পারে যে, রাষ্ট্র একটি সম্প্রদায় যা নিজস্ব রাজ্য অর্জন করতে সাফল্য লাভ করেছে। মজাদার তথ্য হল যে, এর বিপরীত রূপও অধিকতর সত্য হয়ে উঠেছে।

যে প্রকার এখন ভাবী বা উচ্চাকাঙ্খী জাতীয়তা বা রাষ্ট্রগুলি দ্রুত রাজ্য গড়তে কাজ করে চলেছে, তাই বিদ্যমান রাজ্যগুলোও প্রয়োজন বোধ করছে এই দাবি বজায় রাখার যে তারা একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত করা হল আধুনিক যুগের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা সাধারণত রাজনৈতিক বৈধতার একটি প্রভাবশালী উৎস (তোমাদেরএকাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই সমাজের ধারণার চতুর্থ অধ্যায় থেকে আধুনিকতার আলোচনাটি মনে করে দেখ)। এর অর্থ হল, আজ একটি রাজ্যের ক্ষেত্রে 'রাষ্ট্র' সর্বাধিক স্বীকৃত অথবা আবশ্যকীয়; অন্যদিকে, রাষ্ট্রের বৈধতার চরম উৎস হল 'মানুষ'। অন্যভাবে বলা যায় যে, একটি রাষ্ট্র রাজ্যের প্রয়োজনীয়তা যতটুকু অনুভব করে থাকে বা তার থেকেও বেশি রাজ্য রাষ্ট্রের 'প্রয়োজনীয়তা' অনুভব করে।

কিন্তু পূর্বের অনুচ্ছেদগুলোতে আমরা দেখেছি যে, ঐতিহাসিকভাবে স্থায়ী বা যুক্তিযুক্তভাবে প্রয়োজনীয় কোন সম্পর্ক জাতিরাষ্ট্র (nation states) বা বিভিন্ন প্রকারের সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে অনুপস্থিত। এর অর্থ হল যে, এই প্রশ্নের কোন পূর্ব নির্ধারিত উত্তর নেইঃ জাতি রাষ্ট্রের 'রাজ্য' ভাগ/অংশ কি রূপ ব্যবহার করবে বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে যা 'রাষ্ট্র' গড়ে তোলে? বাক্স 6.2 তে যেমন দেখানো হয়েছে (যা 2004 সালের United Nations Development Program (UNDP)-এর 'সংস্কৃতি এবং গণতন্ত্র' প্রতিবেদনটি অনুসারে), বেশিরভাগ রাষ্ট্রই সাধারণত সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতাকে সন্দেহজনক রূপে দেখে, তাই তারা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতাকে কমানোর কিংবা বর্জন করার চেষ্টা করছে। তা সত্ত্বেও, অনেক সফল উদাহরণও রয়েছে — যেমন, ভারতবর্ষ - যা সফলপূর্বক প্রদর্শন করেছে যে বিভিন্ন প্রকারের সাম্প্রদায়িক পরিচয়গুলো 'একরূপ' (homogenise) না করেও একটি শক্তিশালী জাতি রাষ্ট্র গড়া সম্ভব।

সাম্প্রদায়িক পরিচিতির ভয়ে ভীত হয়ে রাজ্যগুলোর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতাকে বর্জনের প্রচেষ্টা — বাক্স 6.2

ঐতিহাসিকভাবে, রাজ্যগুলো, রাষ্ট্র — গঠনমূলক কৌশলের মাধ্যমে রাজনৈতিক বৈধতা স্থাপন এবং বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। তারা তাদের নাগরিকদের আনুগত্য ও বশ্যতা সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিল বিভিন্ন আত্তীকরণ বা এককীকরণের নীতিগুলোর মাধ্যমে। এই সকল উদ্দেশ্য সাধন করা সহজ নয়, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে, যেখানে নাগরিকরা দেশের নাগরিক ছাড়াও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক পরিচয়গুলোর সঙ্গোও গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, নৃজাতীয় ধর্মীয়, ভাষাগত পরিচয় ইত্যাদি।

অধিকাংশ রাজ্য এই ধরনের ভিন্নতাকে স্বীকার করতে ভীত কেননা তারা বিশ্বাস করে যে এই স্বীকৃতি সমাজকে খণ্ডিত করবে এবং সমন্বয়পূর্ণ সমাজ গড়তে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এই প্রকারের পরিচিতির রাজনীতি রাষ্ট্রের একতার ক্ষেত্রে ভীতিজনক। তাছাড়া, এই ধরনের ভিন্নতা সহজে মানিয়ে নেওয়া রাজনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। তাই অধিকাংশ রাষ্ট্র এই ধরনের বিচিত্র পরিচিতিগুলোকে দমন করার অথবা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উপেক্ষা করার পথ অবলম্বন করে নিয়েছে।

আত্তীকরণের নীতি প্রায়শ নৃজাতীয়, ধর্মীয় বা ভাষাগত পরিচিতিগুলোকে সরাসরি দমন করে এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক ভিন্নতাকে মেটানোর প্রচেষ্টা করে। ঐক্যবদ্ধতার নীতি একক জাতীয়পরিচয় গড়তে চায় ও সর্বজনীন এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে সাংস্কৃতিক ও নৃজাতীয় - রাস্ট্রীয় ভিন্নতাকে বর্জন করতে চেস্টা করে। কিন্তু এই নীতি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ভিন্নতাকে বজায় রাখতে অনুমোদন দেয়। তবে একক জাতীয় পরিচয় উভয় প্রকার নীতিরই অন্তর্ভুক্ত। আত্তীকরণ এবং ঐক্যবদ্ধতার কৌশলগুলো একক জাতীয় পরিচিতি স্থাপন করতে বিভিন্নভাবে হস্তক্ষেপ করে, যেমন —

- সকল শক্তিগুলো এমন মঞ্চেও কেন্দ্রীভূত করা যেখানে প্রভাবশালী গোষ্ঠী, সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু বা স্থানীয় গোষ্ঠীর স্বায়ত্ত শাসনকে বর্জন করা।
- প্রভাবশালী গোষ্ঠীর ঐতিহ্য অনুসারে ঐক্যবদ্ধ আইনি ও বিচার ব্যবস্থা ধার্য করা এবং অন্যান্য গোষ্ঠী দ্বারা ব্যবহৃত বিকল্প ব্যবস্থাকে বাতিল করা।
- প্রভাবশালী গোষ্ঠীর ভাষাকে একমাত্র সরকারি 'জাতীয়' ভাষা রূপে গণ্য করা এবং সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে এর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।
- প্রভাবশালী গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত রাজ্য নিয়ন্ত্রিত গণ-মাধ্যম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা উন্নয়ন করা।
- প্রভাবশালী গোষ্ঠীর ইতিহাস, নায়ক এবং সংস্কৃতিকে সম্মান প্রদান করা, রাজ্য প্রতীকগুলোকে গ্রহণ করা এবং জাতীয় ছুটি বা রাস্তার নামকরণের মতো কাজের মাধ্যমে সেটা প্রতিফলন করা।
- সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এবং আদিবাসী মানুষের কাছ থেকে জমি, বনভূমি এবং মৎস্য সম্পদগুলোকে দখল করে 'জাতীয় সম্পদ' রূপে ঘোষণা করা।

Source: Adapted from UNDP Human Development Report 2004, ch.3 Feature 3.1

বাক্স 6.2 এ আত্তীকারক (assimilationist) এবং ঐক্যবদ্ধকারক (integrationist) নীতির কথা বলা হয়েছে। যে সকল নীতি আত্তীকরণের পক্ষে কাজ করে তা নাগরিকদের এরূপ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং নিয়মনীতিতে বিশ্বাস করতে উৎসাহিত করে বা বলপূর্বক অবলম্বন করতে নির্দেশ করে। সেই সব মূল্যবোধ বা নিয়মনীতি সাধারণ প্রভাবশালী সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে। সমাজের অন্যান্য অধীনস্ত গোষ্ঠীগুলোর কাছে প্রত্যাশা করা হয় যে তারা নিজস্ব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বর্জন করবে এবং যথাবিহিত নীতিগুলোকে গ্রহণ করবে। ঐক্যবদ্ধতার নীতিগুলো ভিন্ন প্রকারের কিন্তু সামগ্রিক উদ্দেশ্যগুলো নয়; তারা সার্বজনীন সংস্কৃতিকে সাধারণ জাতীয় রূপে সীমাবদ্ধ করতে জোর দেয় এবং সকল 'অ-জাতীয়' (non-national) সংস্কৃতিকে ব্যক্তিগত স্তরে নির্বাসিত করতে প্রয়াস নেয়। এইক্ষেত্রেও, প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে 'জাতীয়' সংস্কৃতি রূপে মান্য করার একটি ভীতি থাকে।

তাই তোমরা হয়তো বা বুঝতে পেরেছ যে সমস্যা কোথায়। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আধুনিক রাস্ট্রের কোন আবশ্যকীয় সম্পর্ক নেই। অনেক সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের কিছু ভিত্তি (যেমন ভাষা, ধর্ম, নৃজাতি ইত্যাদি) রাস্ট্র গঠনে উপাদান রূপে কাজ করতে পারে বা নাও করতে পারে —এর কোন গ্যারান্টি নেই। কিন্তু যেহেতু সাম্প্রদায়িক পরিচয় রাস্ট্র গঠনের ভিত্তি হতে পারে, তাই বিদ্যমান রাস্ট্রগুলো সকল প্রকারের সাম্প্রদায়িক পরিচয়কে বিপজ্জনক প্রতিবন্ধী হিসাবে দেখে। এই কারণে সাধারণত রাস্ট্রগুলো একক, সমরূপ জাতীয় পরিচয়ের পক্ষপাতিত্ব করে এবং আশা রাখে যে রাস্ট্র নিয়ন্ত্রণে ও পর্যবেক্ষণে তা সাহায্য করবে। তা সত্ত্বেও, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে দমন করা খুব বিপজ্জনক, বিশেষকরে সংখ্যালঘু উন্মত্ততা বা অধীনস্ত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে, যাদের সংস্কৃতিকে অ-জাতীয় বলে গণ্য করা হয়।

তাছাড়া, এই দমনকারী কার্য, বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে যেমন ঃ সাম্প্রদায়িক পরিচিতির তীব্র প্রভাব। তাই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করা বা অনুমোদন দেওয়া, কার্যকরীভাবে ও নিয়মাবদ্ধভাবে একটি ভালো নীতি।

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং ভারতীয় জাতি-রাষ্ট্র একটি সামগ্রিক চিত্র

ভারতীয় জাতি রাষ্ট্র সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে বিশ্বের এক বৈচিত্র্যময় দেশ। 2011 সালের জনগণনা অনুসারে, ভারতের জনসংখ্যা হল প্রায় 1.21 বিলিয়ন, যা পৃথিবীর দ্বিতীয় জনসংখ্যাবহুল দেশ। এই বিলিয়ন সংখ্যক লোক প্রায় 1,632 বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষায় কথা বলে। আঠারোটি ভাষা সরকারিভাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং সংবিধানের 8^{th} Schedule -এ স্থান পেয়েছে ও সুনিশ্চিত আইনি মর্যাদা পেয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে, জনসংখ্যার প্রায় 80.5% হল হিন্দু, যারা আবার নির্দিষ্ট আঞ্চলিক সীমানায় বসবাস করে, বহু সংখ্যক বিশ্বাস এবং প্রথা পোষণ করে এবং জাতি ও ভাষাগত দিক থেকে বিভক্ত। জনসংখ্যার প্রায় 13.4% হল মুসলমান, তাই ইন্দোনেশিয়া এবং পাকিস্তানের পর ভারত পৃথিবীর তৃতীয় মুসলমান দেশ। অন্যান্য বৃহৎ ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো হল খ্রীষ্টান (23%), শিখ (19%), বৌদ্ধ (8%) এবং জৈন (0.4%)। যদিও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংখ্যা খুব কম, কিন্তু ভারতের জনসংখ্যা বৃহৎ হওয়ার ফলে এই স্বল্প শতাংশও বড় সংখ্যায় পরিণত হতে পারে।

ভারত জাতিরাষ্ট্র এবং সাম্প্রদায়িক পরিচিতির ক্ষেত্রে আত্তীকরণ বা ঐক্যবন্ধ মডেল অনুসরণ করে না, যা বাক্স 6.2 তে বর্ণিত রয়েছে। স্বাধীন ভারত প্রারম্ভ থেকেই আত্তীকরণ মডেলকে বর্জন করেছে। তা সত্ত্বেও, হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু শ্রেণি থেকে এই মডেলের দাবি ব্যক্ত হয়েছে। যদিও রাষ্ট্রনীতির মধ্যে 'জাতীয় ঐক্যবন্ধতা' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু ভারত সেই অর্থে ঐক্যবন্ধ হয়নি, যেমন বাক্স 6.2 তে বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধান নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে, কিন্তু ধর্ম, ভাষা ও অন্যান্য বিষয়গুলো সর্বজনীন ক্ষেত্র থেকে বাতিল হয়ে যায়নি। এটা সত্য যে এই ধরনের সম্প্রদায়গুলি রাষ্ট্র দ্বারা স্পষ্টভাবে স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক মান অনুসারে, সংখ্যালঘু ধর্মগুলো বলিষ্ঠ সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রাপ্ত। সাধারণত, ভারতবর্ষে আইন-প্রণয়নে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না, কিন্তু আইনটি বাস্তবায়ন করতে বেগ পেতে হয়। তা সত্ত্বেও, সামগ্রিকভাবে, ভারত জাতি-রাষ্ট্রের একটি ভালো উদাহরণ, যদিও সে জাতি-রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়।

জাতীয় একতার সঙ্গে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য-একটি গণতান্ত্রিক 'রাজ্য-রাষ্ট্র'-এর নির্মাণ

বাক্স 6.3

'রাষ্ট্র-রাজ্য' বা জাতিরাষ্ট্র-এর বিকল্প হল রাজ্য-রাষ্ট্র, যেখানে বিভিন্ন 'রাষ্ট্র' তাদের বিভিন্ন নৃজাতীয়, ধর্মীয়, ভাষাগত বা দেশীয় পরিচিতিকে সঙ্গো নিয়ে একক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শান্তিপূর্ণ এবং সহযোগিতার সহিত সহাবস্থান করতে পারবে।

কেইস স্টাডি এবং বিশ্লেষণ এটা প্রমাণ করে যে বহু-সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও স্থায়ী গণতন্ত্র স্থাপন করা সম্ভব। ভিন্ন গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বহিষ্কারকে সমাপ্ত করার জন্য এবং বহুবিধ ও পরিপূরক পরিচয় গড়ে তুলতে প্রয়োজন সুস্পষ্ট প্রচেষ্টার।

এই ধরনের দায়িত্বশীল নীতিগুলো বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যবোধ গড়ে তুলতে উদ্দীপক রূপে কাজ করে --- তারা 'আমরা' বোধ গড়ে তোলে। নাগরিকরা তাদের দেশ ও অন্য সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সাথে সাথে প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক স্থানও খুঁজে পায়। তাছাড়া, সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলির উপর তাদের বিশ্বাস গড়ে ওঠে এবং তারা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে ও সহযোগিতাও করে। তাই স্থায়ী ও সহনশীল 'রাজ্য-রাষ্ট্র' নির্মাণ করতে এবং দৃঢ় ও শক্তিশালী গণতন্ত্র গড়তে এই সকল উপাদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় সংবিধান এই ধারণায় সংঘবদ্ধ। যদিও ভারত সাংস্কৃতিক রূপে বৈচিত্র্যপূর্ণ, তা সত্ত্বেও তুলনামূলক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ভারতের মতো দীর্ঘস্থায়ী গণতন্ত্রও 'সংযোজন' প্রদর্শন করে। কিন্তু আধুনিক ভারত বহুবিধ ও পরিপূরক পরিচয়ের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতিকে বজায় রাখতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, কেননা কিছু গোষ্ঠী দেশে একক হিন্দু পরিচিতি ধার্য্য করতে প্রচেষ্টা করছে। এই ধরনের ভীতি প্রদর্শন ভারতে সংখ্যালঘুর অধিকারকে অমান্য করে এবং সাংবিধানিক অন্তর্ভুক্তিবোধের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক হিংসা, সামাজিক ঐক্যের ক্ষেত্রে গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি করেএবং দেশের পূর্ব সাফল্যগুলোকে ক্ষতিসাধন করে।

এই সকল সাফল্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিকভাবে, ভারতের সাংবিধানিক স্বরূপ ভিন্ন গোষ্ঠীর দাবিকে স্বীকৃতি ও সাড়া দেয় এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও রাজ্য ব্যবস্থাকে একত্রিত করে রাখে। ভারতের পরিচয়গত, বিশ্বাস এবং সহায়তা সূচকের প্রদর্শন (চার্ট1) থেকে এই স্পষ্টীকরণ করা হয় যে ভারত বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং স্তরিত সমাজ হওয়া সত্ত্বেও তার নাগরিকেরা দেশে ও গণতন্ত্রে গভীরভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। অন্যান্য দীর্ঘ স্থায়ী এবং সমৃদ্ধ গণতন্ত্রগুলোর তুলনায় ভারতের এই প্রদর্শন বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

একাধিকত্ব, প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়বিধান এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দ্বন্দ্ব সমাধান করা এইসব এখন ভারতের কাছে বিশেষ সমস্যা। একটি বহু সাংস্কৃতিক গণতন্ত্র গঠন করতে, ঐতিহাসিক প্রয়াসগুলোর দুর্বলতা স্বীকার করতে হবে এবং বহুবিধ ও পরিপূরক পরিচিতিগুলোকে মর্যাদা দেওয়া আবশ্যক। তাছাড়া, সামাজিক পরিচয়, বিশ্বাস ও সহায়তা গঠনের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াসের মাধ্যমে সমাজে সকল গোষ্ঠীর মধ্যে আনুগত্য গড়ে তোলা সম্ভব। জাতীয় সংযোগের জন্য একক পরিচয় বহন এবং বৈচিত্র্যের উপর আঘাত করার কোনও প্রয়োজন নেই। তাই রাজ্য-রাষ্ট্র নির্মাণ করতে এবং গঠনমূলকভাবে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যেক খাপ খাওয়াতে প্রয়োজন সফল কৌশলের এবং সুষ্ঠু সংস্কৃতি স্বীকৃত নীতির। রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এবং সামাজিক ঐক্যের মত দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য প্রাপ্তির এই কৌশলগুলোই সুনিশ্চিত সমাধান।

Source: Adapted from UNDP Human Development Report 2004, Ch.3, Feature 3.1

চার্ট 1ঃ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য প্রতিপালনের মাধ্যমে ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হয়

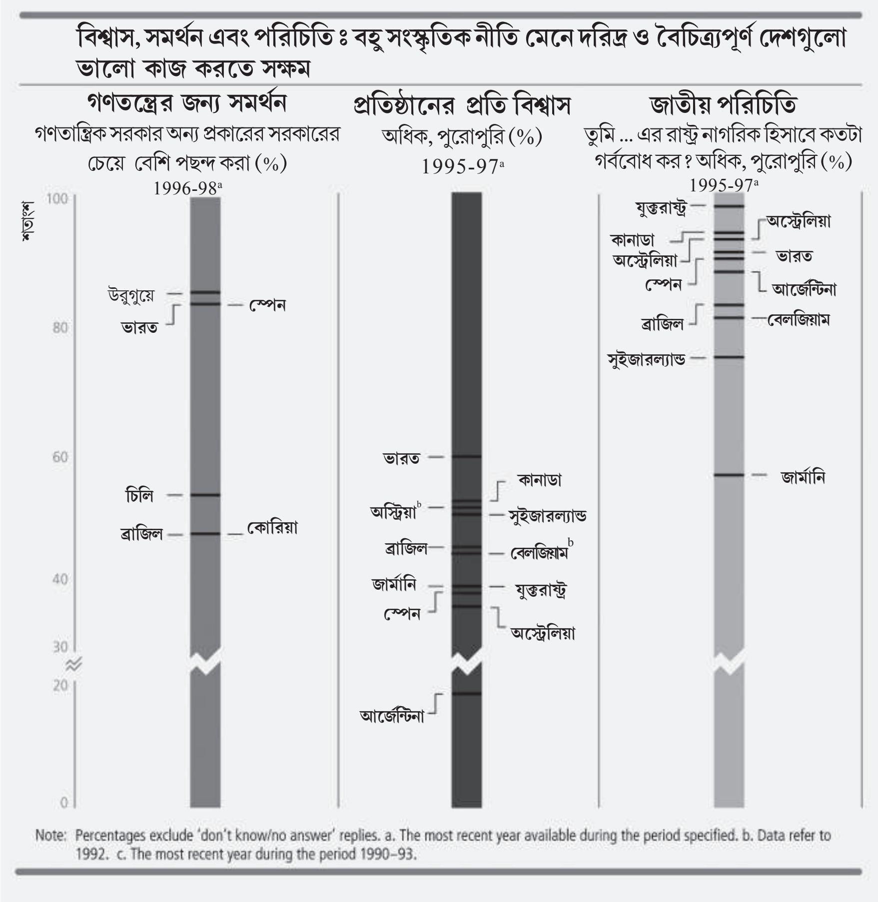

Source: UNDP Human Development Report 2004, Ch, Feature 3.1, Figure 2.

6.2 ভারতীয় প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিকতাবাদ

ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের মূলে রয়েছে ভারতের ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, উপজাতি এবং ধর্মীয় বৈচিত্র্যতা। ভারতের কিছু বিশেষ অঞ্চলে এই পরিচয়গত সংকেতগুলো ভৌগোলিক রূপে কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণে আঞ্চলিকতাবাদ বৃদ্ধি পায় এবং তার মধ্যে আঞ্চলিক বঞ্চনাবোধও প্রবলভাবে কাজ করে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রবাদের (Indian federalism) মাধ্যমে এই ধরনের আঞ্চলিক অনুভূতিকে সমন্বয় বিধান করা হয় (Bhattacharyya 2005)।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে, প্রাথমিকভাবে ভারত উপনিবেশিক ব্যবস্থাপনাকে বজায় রাখে, যার অন্তর্গত ভারতকে প্রদেশে বিভক্ত করা হয় এবং এগুলোকে 'প্রেসিডেন্সি' বলা হতো। মাদ্রাজ, বোম্বে ও কোলকাতা ছিল তিনটি বৃহৎ প্রেসিডেন্সি; (সম্প্রতিকালে, এই তিনটি শহর যেগুলোকে বলা হতো প্রেসিডেন্সি, তাদের নাম বদল করা হয়েছে) এই সকল প্রেসিডেন্সিগুলো বহু নৃজাতীয় ও বহুভাষী প্রদেশীয় রাজ্য হিসাবে গঠিত হয়, যা মূলত একটি আধা যুক্তরাষ্ট্রের (যাকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বলা হয়) গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশাসনিক ইউনিট রূপে কাজ করে।

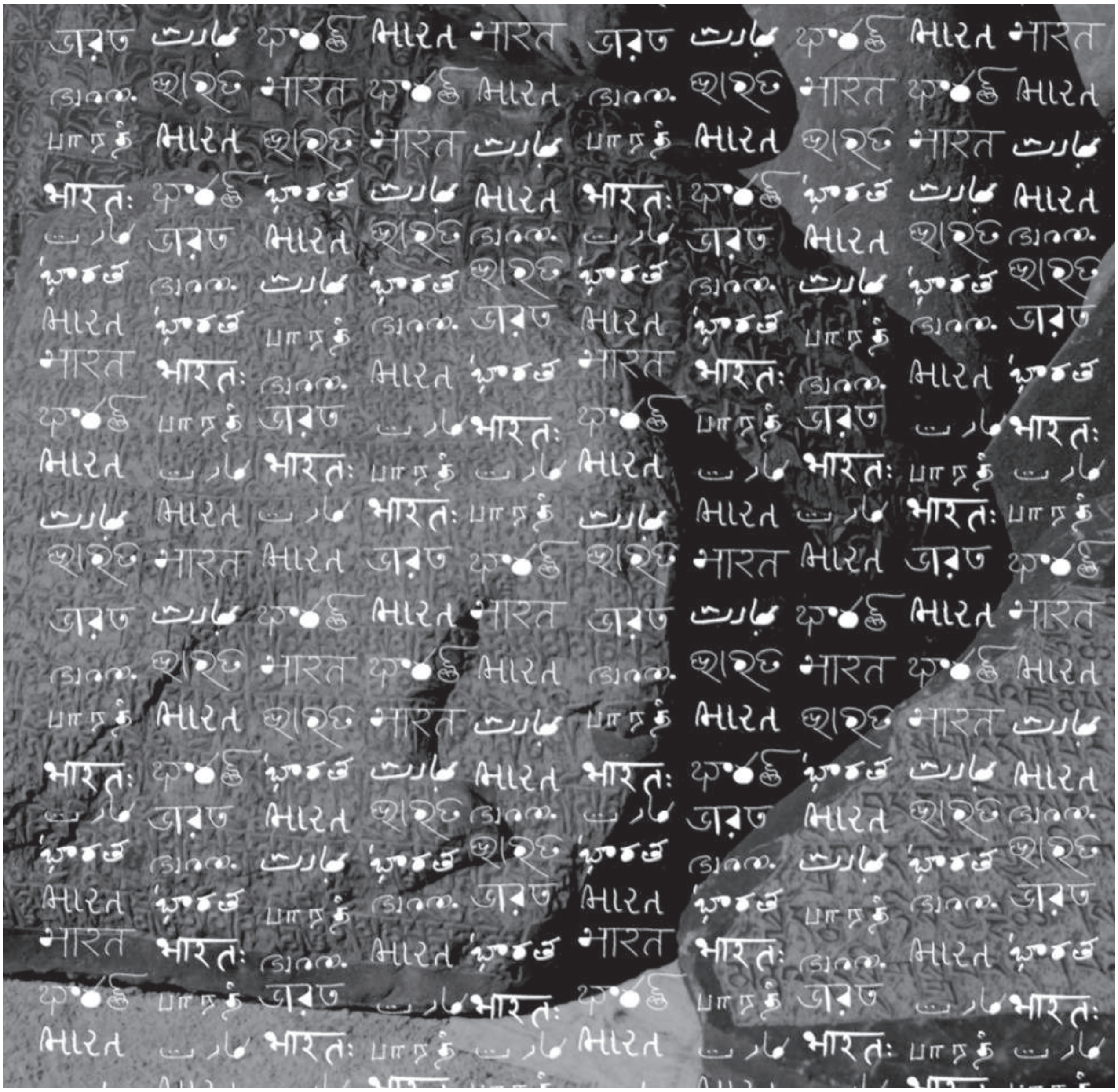

উদাহরণস্বরূপ, পুরাতন বোম্বে রাজ্য (যা বোম্বে প্রেসিডেন্সির অন্য নাম) একটি বহুভাষী রাজ্য যেখানে মারাঠী, গুজরাটী, কানাড়া এবং কোঙ্কানি ভাষী লোক বসবাস করতো। একই রূপে, মাদ্রাজ রাজ্যও তামিল, তেলেগু, কানাড়া এবং মালয়ালাম ভাষী মানুষদের নিয়ে গঠিত হয়। তাছাড়া, ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের অধীন প্রেসিডেন্সি ও প্রদেশগুলোর পাশাপাশি, সমগ্র ভারতে অসংখ্য দেশীয় রাজ্য এবং অঙ্গ রাজ্যের বিস্তার ছিল। এই বৃহৎ দেশীয় রাজ্যের অন্তর্গত ছিল মহীশূর, কাশ্মীর এবং বরোদা। কিন্তু সংবিধান অবলম্বন করার পর, তীব্র বিক্ষোভের কারণে, উপনিবেশিককালের সকল ইউনিটগুলোকে ভারতীয় যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত নৃজাতীয় ভাষাগত রাজ্য রূপে পুনর্গঠন করতে হয়। (পরবর্তী পৃষ্ঠায় বাক্স 6.4 দেখ)।

ভাষাগত রাজ্যগুলো ভারতীয় একতাকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে

বাক্স 6.4

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের প্রতিবেদন, যা 1 লা নভেম্বর 1956 সালে কার্যকরী হয়েছিল, সেটা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক জীবনকে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করে।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের (SRC) পটভূমি নিম্নে দেওয়া হল। 1920 সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা হয়েছিল। তাই এখন এটার প্রাদেশিক একক ভাষার যুক্তিকে অনুসরণ করে — মারাঠী ভাষা-ভাষীদের জন্য একটি, উড়িয়া ভাষা-ভাষীদের জন্য আরেকটি এইভাবে।একই সময়ে, গান্ধি এবং অন্যান্য নেতাগণ তাদের অনুসরণকারীদের প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন যে দেশ যখন স্বাধীন হবে, তখন নতুন রাষ্ট্র ভাষার নীতির উপর ভিত্তি করে গঠিত নতুন নতুন প্রদেশদ্বারা গঠিত হবে।

যাইহোক, পরিশেষে 1947 সালে যখন ভারত স্বাধীনতা লাভ করে, তখন সেটাকে ভাগও করে দেওয়া হয়। এখন, যখন ভাষাগত রাজ্যের প্রবক্তারা যখন নেতাদের কাছে এই প্রতিজ্ঞাকে পুরো করার কথা পুনরায় মনে করিয়ে দেয় তখন কংগ্রেসের মধ্যে সংশয় বা দ্বিধা দেখা দেয়। দেশের বিভাজন এক বিশ্বাসের সঙ্গে তীব্র সংযুক্তির পরিণাম; এইভাবে ভাষা, তীব্র আনুগত্য আরও কত বিভাজন করাবে কে জানে? এই ধরনের চিন্তাধারা তখনকার কংগ্রেস নেতাদের যেমন নেহরু, প্যাটেল এবং রাজাজীর মাথায় ছিল।

অন্যদিকে, সকল ছোট বড় কংগ্রেস নেতারা ভাষার ভিত্তিতে ভারতের এক নতুন মানচিত্র তৈরি করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। মারাঠী এবং কন্নড় ভাষা-ভাষীরা এটার জন্য প্রবল আন্দোলন শুরু করেছিলো, যারা সেই সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে ছড়িয়ে ছিল, যেমন— তৎকালীন বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রদেশে এবং পূর্বতন দেশীয় রাজাদের দ্বারা শাসিত অঞ্চল যেমন মহীশূর এবং হায়দ্রাবাদে কিন্তু সব থেকে সংগ্রামী প্রতিবাদ তেলেগু ভাষা-ভাষী সম্প্রদায়ের দ্বারা করা হয়েছিল, যাদের জনসংখ্যা ছিল অনেক বেশি। 1953 সালের অক্টোবরে, পট্টি শ্রীরামুলু নামের একজন ভূতপূর্ব গান্ধিবাদী এই বিষয়ে আমৃত্যু অনশন শুরু করার সাত সপ্তাহ পরে মারা যায়। পট্টি শ্রীরামুলুর বলিদান হিংসাত্মক প্রতিরোধকে আরও প্ররোচিত করে যার পরিণাম স্বরূপ অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এছাড়া, এটা রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠনে সহায়তা করে, যা 1956 সালে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগুলোর নীতিকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করে।

1950 দশকের প্রাথমিক সময়ে, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু সহ অনেক নেতাদের মনে এই ভীতি ছিল যে, ভাষা ভিত্তিক রাজ্য ভারতের উপ-বিভাজনের পদ্ধতিকে আরও শক্তিশালী করে দিতে পারে। কিন্তু বাস্তবে, তার বিপরীতই হয়েছে। ভাষাভিত্তিক রাজ্যগুলো ভারতীয় একতাকে আরও শক্তিশালী করতে ব্যাপক সাহায্য করেছে। যেমন কান্নাডিগা এবং ভারতীয়, বাঙালি এবং ভারতীয়, তামিল এবং ভারতীয়, গুজরাটি এবং ভারতীয় ... দুটোর একসঙ্গে থাকা পূর্ণরূপে সাঞ্জস্যপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু এটাও সত্য যে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগুলো কখনও কখনও নিজেদের মধ্য ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়। যদিও এই ধরনের বিরোধ কখনও ভালো হয় না, বরং আরও খারাপ হতে পারে। এই বছরেই 1956 সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন (SRC) ভাষার ভিত্তিতে ভারতের নতুন মানচিত্র প্রস্তুত করা বাধ্যতামূলক করে দেয় সিংহলের সংসদ (শ্রীলঙ্কার পূর্বনাম) উত্তরে তামিল ভাষাভাষী নাগরিকদের প্রবল বিরোধ উপেক্ষা করে সিংহলী ভাষাকে একমাত্র সরকারি ভাষা ঘোষণা করে। একজন বামপন্থী সিংহলী সাংসদ উগ্র দেশ ভক্তদের ভবিষ্যদ্বাণী রূপে এই সতর্কীকরণ করেছিলেন "এক রাষ্ট্র, দুই ভাষা" অথবা "এক ভাষা, দুই রাষ্ট্র"।

1983 সাল থেকে শ্রীলঙ্কাতে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে তার কিছু কারণ হল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাভিত্তিক গোষ্ঠীর দ্বারা সংখ্যালঘুদের অধিকারকে উপেক্ষা করা। ভারতের অন্য একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিভাজন হয় 1971 সালে যার কারণ ছিল পশ্চিমাংশের পাঞ্জাবী এবং উর্দু ভাষা-ভাষী লোকেরা পূর্বাংশের বাঙালিদের অনুভূতির সম্মান করতে চাইত না।

ভারত ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের ফলে এই ধরনের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সামনা করতে হয়নি। যদি ভারতে ভাষাভিত্তিক সম্প্রদায়ের অনুভূতির অবহেলা করা হতো, তাহলে আমাদের এখানেও এই অবস্থা হতে পারতো "এক ভাষা, চৌদ্দ অথবা পনেরো রাষ্ট্র"।

Adapted from an article by Ramachandra Guha *in the Times of India, 1 November 2006.*

এইভাবে, ধর্ম নয় --- পরিবর্তে ভাষা এবং আঞ্চলিক উপজাতীয় পরিচিতি ভারতে নৃজাতি --- জাতীয় পরিচয় (ethno-national identify) গড়তে অত্যন্ত শক্তিশালী সাধন রূপে কাজ করে। কিন্তু, এর অর্থ এই নয়, যে সকল ভাষাগত সম্প্রদায় পূর্ণরাজ্য গঠন করেছে যেমন, 2000 সালে ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড এবং ঝাড়খণ্ড এই তিনটি নতুন রাজ্য গঠনে ভাষারকোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না বরং উপজাতীয় পরিচিতি, ভাষা,আঞ্চলিক বঞ্চনা এবং বাস্তু সংস্থানের মত নৃজাতীয়তাবাদের সমন্বয়ে তীব্র আঞ্চলিকতাবাদ গড়ে উঠে। যার ফলস্বরূপ, পূর্ণরাজ্য (statehood) গঠিত হয়। বর্তমানে ভারতীয় রাষ্ট্র রাজ্যে 28 টি রাজ্য এবং 7 টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়েছে।

1880 থেকে 1930-এর সময়কালের বিভিন্ন অঞ্চলের দম্পতির ছবি ঃ উপরের বাঁ দিক থেকে গুজরাট, ত্রিপুরা, বোম্বে, আলিগড়, হায়দ্রাবাদ, গোয়া, কলকাতা। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউদিল্লি থেকে প্রকাশিত মানবিকা কারলেকরের বই Visualising India Women 1875-1947 থেকে নেওয়া চিত্র।

কাজ 6.4

তোমার রাজ্যের উদ্ভব সম্পর্কে খোঁজ করো। রাজ্যটি কবে গঠিত হয়? রাজ্য গঠনে মুখ্য নির্ণায়ক কী ছিল? ভাষা, নৃজাতীয়/ উপজাতীয়পরিচয়, আঞ্চলিক অবহেলা বা বঞ্চনা, পরিবেশগত ভিন্নতা না কি অন্য কোনো নির্ণায়ক মুখ্য রূপে ব্যবহৃত হয়? ভারতীয় জাতি-রাষ্ট্রের অন্তর্গত অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে এই রাজ্যের কি রূপ তুলনা করা যেতে পারে?

তোমরা কি বর্তমানে এখন কোনও সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে অবগত রয়েছে যা নতুন রাজ্য গঠনের দাবি জানায়। (তেলেঙ্গানা আন্দোলন, বিদর্ভ আন্দোলন এবং তোমার রাজ্যে হওয়া অন্যান্য আন্দোলন যেমন 'তিপ্রাল্যান্ড'-এর দাবির মতো আন্দোলন সম্পর্কে অধ্যয়ন করো।)

আঞ্চলিক আবেগ বা অনুভূতিকে সম্মান দেওয়ার জন্য শুধু রাজ্য নির্মাণই যথেষ্ট নয়। এর জন্য এমন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যা এক বৃহৎ যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে এই রাজ্যগুলোকে অপেক্ষাকৃত স্বশাসিত ইউনিট রূপে প্রতিষ্ঠিত করবে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে রাজ্য এবং কেন্দ্রের ক্ষমতা সংজ্ঞায়িত করা সাংবিধানিক নিয়ম কানুন (provisions) অনুযায়ী তা করা হয়। ভারতের সংবিধানে শাসন সম্পর্কিত বিষয়ে নির্দিষ্ট তালিকা রয়েছে যেখানে রাজ্য বা কেন্দ্রের কাজের দায়িত্বের স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে। তাছাড়া 'যুগ্ম তালিকা' ও রয়েছে যেখানে উভয় পক্ষ অর্থাৎ কেন্দ্র ও রাজ্য, কাজের পরিচালনা করতে অনুমোদন প্রাপ্ত। রাজ্য বিধানসভা দ্বারা পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষ অর্থাৎ রাজ্য সভার গঠন নির্ধারণ করা হয়। তাছাড়া, পিরিয়ডিক কমিটি এবং কমিশন রয়েছে যা কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক সুনিশ্চিত করে। এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ হল অর্থ কমিশন যা প্রতি দশ বছর অন্তর গঠিত হয় ও কেন্দ্র এবং রাজ্যের রাজস্ব ভাগ সম্পর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। প্রত্যেক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিস্তারিত রাজ্য পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকে যা প্রতি রাজ্যের রাজ্য পরিকল্পনা কমিশন দ্বারা প্রস্তুত করা হয়।

সার্বিকভাবে, এই যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা ভাল কাজ করেছে, যদিও অনেক বিতর্কমূলক বিষয়ও রয়েছে। উদারীকরণের সময়কাল থেকে (1990 সাল থেকে) নীতি নির্ধারক, রাজনীতিবিদ্ এবং পন্ডিতগণ অঞ্চল ভিত্তিক, অর্থনৈতিক এবং পরিকাঠামোগত অসাম্যতার দ্রুত বৃদ্ধি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। যখন ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে (বিদেশি ও ভারতীয়) অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিক ভূমিকা প্রদান করতে অনুমোদন দেওয়া হয়, তখন আঞ্চলিক সাম্য ভাব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এটা হওয়ার কারণ হল ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীরা সাধারণত উন্নত রাজ্যগুলোতে বিনিয়োগ করতে চায়, যেখানে পরিকাঠামো এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভালো। তাই শুধু মুনাফা বৃদ্ধি না করে, সরকার আঞ্চলিক সাম্যতার (এবং অন্য সামাজিক লক্ষ্য) ক্ষেত্রে কিছু বিবেচনা করতে পারে। তবে যদি বাজার ব্যবস্থাকে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে উন্নত এবং পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর মধ্যে ব্যবধান বাড়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই বর্তমান প্রবণতাকে বদল করতে প্রয়োজন নতুন সরকারি উদ্যোগের।

6.3 রাষ্ট্র-রাজ্য/জাতি-রাষ্ট্র ও ধর্ম সম্পর্কিত সমস্যা এবং পরিচিতি

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সকল উপাদানগুলোর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বিতর্কিত হল ধার্মিক সম্প্রদায় এবং ধর্মভিত্তিক পরিচয় সম্পর্কিত সমস্যা। এইসমস্যাগুলোকে বিস্তারিতভাবে দুটো সম্পর্কিত গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায় — ধর্মনিরপেক্ষতা- সম্প্রাদায়িকতা সমূহ এবং সংখ্যালঘু — সংখ্যাগরিষ্ঠ সমূহ। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাম্প্রদায়িতা সমূহ প্রশ্ন করে যে, ধর্ম এবং একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী যারা ধর্মকে প্রাথমিক পরিচয় মনে করে, তাদের সঙ্গে একটি রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী রূপ। অন্যদিকে সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সমূহের প্রশ্নে এমন সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্ত থাকে যা রাষ্ট্রকে বিভিন্ন ধর্মীয়, নৃজাতীয়

বা অন্যান্য সম্প্রদায় যারা সংখ্যায় বা ক্ষমতায় অসাম্য (সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা) তাদের সঙ্গে সঠিক আচরণ বা ব্যবহারের পথে চালিত করে।

সংখ্যালঘুর অধিকার এবং রাষ্ট্র/জাতি নির্মাণ

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রভাবশালী প্রবণতার অন্তর্ভুক্তি এবং গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চিহ্নিত। 'অন্তর্ভুক্তি' এই কারণে যে তা বৈচিত্র্যতা ও একাধিকত্বকে স্বীকার করে। পাশাপাশি ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গণতান্ত্রিক কারণ তা সামাজিক বৈষম্য ও বহিষ্কারের অবসান করে এবং যথাযথ ও ন্যায় সঙ্গত সমাজ গঠনে বিশ্বাস করে। 'লোক' বা 'মানুষ' শব্দটি ধর্ম, নৃজাতীয়, বর্ণ বা জাতির দ্বারা সংজ্ঞায়িত কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রসঙ্গে দেখা হয়নি। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা মানবতার ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হন এবং মহাত্মা গান্ধি ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা চূড়ান্ত জাতীয়তাবাদের কুৎসিত দিকগুলোর বিরোধিতা বা সমালোচনা করেন।

চূড়ান্ত জাতীয়তাবাদের অশুভ দিকগুলো সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিচার

বাক্স 6.5

... যেখানে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের ভাবনা প্রভাব বিস্তার করে, সকলকে ছেলেবেলা থেকে ঘৃণা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে শেখানো হয় — ইতিহাসে বর্ণিত অর্ধ সত্য ও অসত্য দ্বারা এক মুহূর্তের জন্য এটা ভেবো না যে অন্য জাতি/বর্ণের উপর তুমি যে আঘাত হানবে, তা তোমায় পাল্টা আঘাত করবে না। অথবা এটাও ভেবো না যে শত্রুতার বীজ, তুমি নিজের ঘরের আশেপাশে রোপন করো, তা চিরকাল তোমার রক্ষাকবজ হয়ে থাকবে? সকল মানুষের মনে তাদের নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অস্বাভাবিক আত্মগর্ব অনুপ্রাণিত করা, নিজের নৈতিক নির্দয়তা এবং ভুল পথে জমানো ধনের প্রতি গর্ববোধ শেখানো, যুদ্ধে প্রাপ্ত বিজয়ী স্মৃতিচিহ্নকে প্রদর্শিত করে পরাজিত দেশকে অপমানিত করা এবং শিশুদের মনে অন্যদের প্রতি অবমাননার ভাব গড়ার জন্য এই বিদ্যালয়গুলোর ব্যবহার, এই সকলই পাশ্চাত্যের অনুকরণ যেখানে মানবতা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে।

Source: On Nationalism by Rabindranath Tagore. First published in 1917, Reprint Edition of Macmillan, Madras 1930.

সববেত জাতীয়তাবাদকে কার্যকর করে তোলার ক্ষেত্রে, এই ধরাণাকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনছিল। যেমন, পূর্বে আলোচিত (পরিচ্ছেদ 6.1 এ) হয়েছে যে, প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মধ্যে নিজের সংস্কৃতি বা ভাষা বা ধর্মকে জাতি রাষ্ট্রের সঙ্গে সমানার্থক করানোর প্রবল প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তা সত্ত্বেও, একটি শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক দেশ গঠনে, বিশেষ সাংবিধানিক নিয়মনীতির প্রয়োজন, যা সকল গোষ্ঠীর এবং বিশেষ করে সংখ্যালঘুর অধিকারকে সুনিশ্চিত করবে। সংখ্যালঘুর সংজ্ঞার উপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমাদের এটা বুঝতে সাহায্য করবে যে, একটি শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ এবং গণতান্ত্রিক দেশে সংখ্যালঘুর সুরক্ষার গুরুত্ব কতটুকু।

সমাজতত্ত্বে 'সংখ্যালঘু' গোষ্ঠীর ধারণাটি বিস্তারিত রূপে ব্যবহৃত হয়, যা শুধু সংখ্যাগত বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় না — সাধারণত তা কোনো আপেক্ষিক প্রতিকূলতা নির্দেশ করে। তাই, সুবিধাপ্রাপ্ত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী যেমন অত্যধিক ধনী মানুষকে সাধারণত সংখ্যালঘু বলা যায় না; যদি তা হয়, এই ধারণাটি 'সুবিধাপ্রাপ্ত সংখ্যালঘু' হিসাবে ধরা হবে। যখন 'সংখ্যালঘু' শব্দটি কোন শর্ত ছাড়াই ব্যবহৃত হয়, সাধারণত তা আপেক্ষিকভাবে ছোট এবং পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীকে নির্দেশ করে।

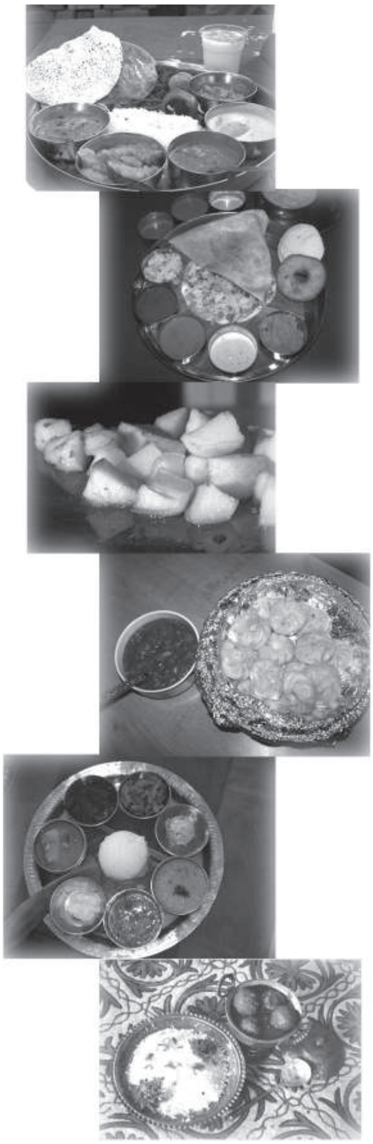

সংখ্যালঘুর সমাজতাত্ত্বিক বোধ নির্দেশ করে যে সংখ্যালঘু সদস্যরা একটি সমষ্টি গঠন করে অর্থাৎ তাদের মধ্যে গোষ্ঠী সংহতিবোধ, একতাবোধ এবং একাত্মবোধ প্রভাব বিস্তার করে। এটা অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায় কেননা অন্য গোষ্ঠী থেকে প্রাপ্ত বিদ্বেষ ও বৈষম্যের অনুভূতি এই সংখ্যালঘুদের গোষ্ঠীগত বিশ্বস্ততা এবং আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে তোলে (Giddens 2001:248)। তাই পরিসংখ্যানগতভাবে যে গোষ্ঠীরা সংখ্যালঘু, যেমন - বাঁ-হাতি মানুষ বা 29^{th} ফেব্রুয়ারিতে জন্ম নেওয়া মানুষ সমাজতাত্ত্বিক রূপে সংখ্যালঘু নয়, কেননা, তারা কোন সমষ্টি গঠন করে না।

একটি কাশ্মিরী বালিকা

যা হোক, ব্যতিক্রমী উদাহরণ থাকা সম্ভব, যেখানে একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী কোন একদিকে পিছিয়ে রয়েছে। তাই, উদাহরণস্বরূপ পারসী বা শিখ ধর্মাবলম্বীরা অর্থনৈতিক দিকে সমৃদ্ধ কিন্তু তারা ধর্মীয় দিকে সংখ্যালঘু। আবার সাংস্কৃতিক দিক থেকে তাদের অবস্থান অসুবিধাজনক, কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় তারা অল্প সংখ্যক। সংখ্যাগরিষ্ঠদের জনসংখ্যাগত প্রভাবের কারণে ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের বিশেষ সুরক্ষার প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে, নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত করা সম্ভব। এর অর্থ ধর্ম বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যারা সংখ্যালঘু তাদের অর্থনৈতিক বা সামাজিক স্থিতি ভালো হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা দুর্বল। তাদের এই ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হবে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করবে এবং তাদের ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি রাজ্য ব্যবস্থার দ্বারা দমন করবে। এর ফলস্বরূপ তাদের বিশেষ পরিচয়গুলোকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে।

বাঁ দিকে ঃ ভারতের বিভিন্ন অংশের আহার; ডানদিকে উপরে ঃ কাশ্মীরি পোশাক পরিহিত শিশু, নীচে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পোশাক পরিহিত পুতুল।

বাক্স 6.6

ধর্মীয় সংখ্যালঘুর আপেক্ষিক আকার এবং বন্টন ঃ-

এটা সুপরিচিত তথ্য যে ভারতবর্ষে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ঃ 2001 সালের গণনা অনুসারে, মোট জনসংখ্যার 80.5% অথবা প্রায় 828 মিলিয়ন হিন্দু জনসংখ্যা। হিন্দু জনসংখ্যা অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম্মিলিত জনসংখ্যার তুলনায় চার গুণ বেশি এবং সবচেয়ে বড় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী মুসলমানদের তুলনায় প্রায় ছয়গুণ বেশি।

কিন্তু, এই তথ্য বিভ্রান্তিকর হতে পারে কেন না হিন্দুরা সমজাতীয় গোষ্ঠী নয় এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত, যদি অন্যান্য সকল মুখ্য ধর্মগুলিও কিছুমাত্রায় বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। ভারতে, সবচেয়ে বৃহত্তর ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হল মুসলমান — তাদের সংখ্যা প্রায় 138 মিলিয়ন এবং 2001 সালের জনগণনা অনুসারে তারা মোট জনসংখ্যার প্রায় 13.4% গোটা দেশেই মুসলমানরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং জম্মু ও কাশ্মীরে তাদের বেশিরভাগ দেখতে পাওয়া যায়। তাদেরমধ্যে অল্প সংখ্যক পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও রাজস্থানে বসবাস করে।

খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা জনসংখ্যার প্রায় 2.3% (24 মিলিয়ন) এবং তারাও গোটা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে ও অল্প সংখ্যক উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণি রাজ্যগুলোতে পরিলক্ষিত হয়। উত্তর পূর্বাঞ্চলের তিনটি খ্রিষ্টধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য হল নাগাল্যান্ড (90%), মিজোরাম (87%) এবং মেঘালয় (70%)। গোয়া (27%) এবং কেরালাতেও (19%) অল্প সংখ্যক খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী লোক দেখা যায়।

শিখ ধর্মাবলম্বীরা জনসংখ্যার 1.9% অর্থাৎ প্রায় 19 মিলিয়ন। যদিও তারা সারা দেশে ছড়িয়ে থাকে, তবে তাদের বেশিরভাগ পাঞ্জাবে বসবাস করে, যেখানে তারা সংখ্যাবহুল (60%)।

এছাড়াও অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠী — যেমন বৌদ্ধ (4 মিলিয়ন, 0.8%), জৈন (4 মিলিয়ন, 0.4%) এবং 'অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়' (7 মিলিয়নের নীচে, 0.7%) রয়েছে। সব থেকে বেশি সংখ্যক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সিকিম (28%) এবং অরুণাচল প্রদেশে (13%) রয়েছে। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের মতো বড় রাজ্যে প্রায় 6% বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। জৈন ধর্মাবলম্বীরা বেশিরভাগ মহারাষ্ট্র (1.3%), রাজস্থান (1.2%) এবং গুজরাট (1%)-এর মতো রাজ্যে বসবাস করে।

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের সময়কালে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা এটা বুঝতে সক্ষম হন যে ভারতীয় বৈচিত্রতাকে যথাযথ স্বীকৃতি ও সম্মান দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই 'বৈচিত্রের মাঝে ঐক্য' কথাটির দ্বারা ভারতীয় সমাজের নানাবিধ বৈচিত্র্যের মেলবন্ধন ঘটানো হয়। এই ক্ষেত্রে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বহু কার্যকলাপে সংখ্যালঘু এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা লক্ষ্য করা যায় এবং তার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ভারতীয় সংবিধানে পরিলক্ষিত হয় (Zaidi 1984)।

বাক্স 6.7

সংখ্যালঘু সংরক্ষণ সম্পর্কে ডাঃ আম্বেদকরের বিচার ঃ

যারা সংখ্যালঘু সংরক্ষণের বিরোধিতা করে, তাদের উদ্দেশ্যে আমি দুটো কথা বলতে চাই। প্রথমত, সংখ্যালঘুরা একটা বিস্ফোরক শক্তি, যদি বিস্ফোরণ হয়, তাহলে সম্পূর্ণ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ভাঙন ধরাতে পারে। ইউরোপের ইতিহাসে এমন প্রচুর আতঙ্কজনক প্রমাণিত সাক্ষ্য রয়েছে যা এই সত্যকে সমর্থন করে। দ্বিতীয়ত, ভারতের সংখ্যালঘুরা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে নিজেদের অস্তিত্বকে সঁপে দিতে সম্মত হয়েছে। আয়ারল্যান্ড-এর বিভাজন প্রতিরোধ করার সময় হওয়া আলাপ আলোচনার ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে রেডমণ্ড কার্সনকে বলেছিলেন "প্রটেস্টান্ট সংখ্যালঘুদের জন্য তোমাদের পছন্দমত যে কোনও ধরনের সংরক্ষণ চাইতে পারো, কিন্তু চলো আমরা একটা একক আয়ারল্যান্ড গড়ে তুলি।" উত্তরে কার্সন বলেছিলেন, "রাখো তোমার সংরক্ষণ, আমরা তোমাদের দ্বারা শাসিত হতে চাই না।" কিন্তু ভারতের কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এই ধরনের হাতিয়ারকে আপন করেনি। (জন রেডমণ্ড, একজন ক্যাথলিক সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা; স্যার এডওয়ার্ড কার্সন একজন প্রটেস্টান্ট সংখ্যালঘু নেতা)

(Source: Constituent Assembly Debates 1950: 310-311, cited in Narang 2002:63)

ভীমরাও রামজী আম্বেদকর (1891-1956)

ভীমরাও রামজী আম্বেদকর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পুনর্জাগরণবাদী, আইনজ্ঞ, পন্ডিত ও রাজনৈতিক নেতা এবং ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতা ছিলেন। দরিদ্র, অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করায়, সারাজীবন তিনি অস্পৃশ্যতা এবং জাতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন।

সংসদ ভবন

ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা সচেতন ছিলেন যে একটি শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ দেশ তখনই গড়া সম্ভব যখন সকল শ্রেণির মানুষের কাছে নিজেদের ধর্ম অনুসরণ করার এবং নিজেদের সংস্কৃতি ও ভাষা বিকাশের স্বাধীনতা থাকে। ভারতীয় সংবিধানের মুখ্য রচয়িতা ডাঃ বি. আর. আম্বেদকর গণপরিষদে এই বিষয়টির স্পষ্টীকরণ করেন যা বাক্স 6.7-এ দেখানো হয়েছে।

বিগত তিনদশকে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে যখন একটি দেশের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না, সেটা জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক রূপে কাজ করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, বাংলাদেশ গঠনের অন্যতম মুখ্য কারণ ছিল পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশের মানুষদের সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত অধিকার স্বীকৃতিতে অসম্মতি।

বাক্স 6.8

সংখ্যালঘু এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের উপর ভারতীয় সংবিধানের বিচার ঃ-

ধারা 29

(1) ভারতীয় ভূখন্ডের যে কোন ভাগে বসবাসকারী যে কোন অংশের নাগরিকদের তাদের নিজস্ব ভাষা বা সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করার অধিকার থাকবে।

(2) কোনো নাগরিককে রাষ্ট্র পরিচালিত বা রাষ্ট্র তহবিল থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র ধর্ম, বর্ণ, জাতি, ভাষা ইত্যাদির নিরিখে ভর্তি করাতে অস্বীকার করবে না।

ধারা 30 ঃ

(1) সকল সংখ্যালঘুদের, সেটা ধর্মের ভিত্তিতেই হোক বা ভাষার ভিত্তিতে, তাদের পছন্দসই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করার অধিকার থাকবে।

(2) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না এই ভিত্তিতে যে এটা কোনও সংখ্যালঘু পরিচালিত, সেটা ধর্মের ভিত্তিতেই হোক বা ভাষার ভিত্তিতে।

শ্রীলঙ্কায় সংগঠিত জাতিগত দ্বন্দ্বের বিতর্কমূলক কারণগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম কারণ ছিল সিংহলী ভাষাকে জাতীয় ভাষা রূপে আরোপিত করা। একইভাবে, ভারতে বলপূর্বক কোনো ভাষা বা ধর্মকে কোন গোষ্ঠীর উপরে আরোপিত করা বা চাপিয়ে দেওয়ার অর্থ হল জাতীয় ঐক্যকে দুর্বল করা যা ভিন্নতার স্বীকৃতির উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এটা উপলব্ধি করে এবং ভারতীয় সংবিধানও তার স্বীকৃতি দেয় (বাক্স 6.8)।

সর্বশেষে, এটা জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে সংখ্যালঘুরা শুধু ভারতে নয়, সর্বত্র বিরাজ করে। বেশিরভাগ জাতি-রাষ্ট্রে বা রাষ্ট্র রাজ্যে এটা লক্ষ্য করা যায় যে সাংস্কৃতিক নৃজাতি, বর্ণ বা ধর্মের উপর ভিত্তি করে একটি সামাজিক গোষ্ঠী প্রভাবশালী হয়ে উঠে। পৃথিবীর এমন কোনো জাতি-রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র-রাজ্য নেই যেখানে একক স্বজাতীয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বিদ্যমান। তাসত্ত্বেও যেসব জায়গায় এ ধরনের গোষ্ঠীর খোঁজ পাওয়া যেত (যেমন আইসল্যান্ড, সুইডেন বা দীক্ষা কোরিয়ার মত দেশে সেখানে আধুনিক পুঁজিবাদ, উপনিবেশবাদ এবং বৃহত্তর প্রচরণের কারণে বহুবিধ গোষ্ঠী লক্ষ্য করা যায়। এমনকি ছোট রাজ্যেও ধর্মীয়, নৃজাতীয়, ভাষাগত বা বর্ণগত ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু পরিলক্ষিত হয়।

কাজ 6.5

এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে 'সংখ্যাগরিষ্ঠ' গোষ্ঠী অন্য কোনো ক্ষেত্রে 'সংখ্যালঘু'তে পরিবর্তিত হয়ে যায় (অথবা অন্যান্য কাছাকাছি উপায়ে)। এই বিষয়ে কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ খুঁজে বের করো এবং এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর। মনে রাখবে, সংখ্যালঘুর সমাজতাত্ত্বিক ধারণায় শুধু অপেক্ষিক সংখ্যা নয় আপেক্ষিক ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (পরামর্শঃ বর্ণবৈষম্য নীতির পূর্বে এবং পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের অবস্থান, কাশ্মীরে হিন্দুদের; গুজরাটে মুসলমানদের; উঁচু জাতির হিন্দুদের; উত্তরপূর্বাঞ্চলে উপজাতিদের অবস্থান।)

সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতি-রাষ্ট্র/রাষ্ট্র রাজ্য ঃ-

সাম্প্রদায়িকতা ঃ-

প্রচলিত ভাষায় 'সাম্প্রদায়িতা' শব্দটির দ্বারা ধর্মীয় পরিচিতির ভিত্তিতে উগ্র জাতীয়তাবাদ (Chauvinism) বুঝায়। 'উগ্র জাতীয়তাবাদ' হল এমন এক আচরণ যেখানে মানুষ শুধুই নিজের গোষ্ঠীকে ন্যায়সঙ্গত বা সুযোগ্য গোষ্ঠী বলে মনে করে এবং সংজ্ঞানুসারে অন্যান্য গোষ্ঠীকে নিকৃষ্ট, অবৈধ এবং বিরোধীবলে গণ্য করে। তাই, সরলভাবে বোঝাতে গেলে সাম্প্রদায়িকতা হল ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এক উগ্র রাজনৈতিক আদর্শ। সাম্প্রদায়িকতার এই অর্থটি হয়তো ভারত কিংবা দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাসঙ্গিক, কারণ এই অর্থটি ইংরেজি ভাষার 'Communal' শব্দের অর্থ থেকে ভিন্ন। ইংরেজি ভাষায় 'Communal' শব্দের অর্থ হল সম্প্রদায় বা সমগ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এমন কিছু যা ব্যক্তিগত নয়। সেই প্রসঙ্গে ইংরেজি অর্থটি নিরপেক্ষ, কিন্তু দক্ষিণ এশীয় অর্থে তা উগ্রতাকে বোঝায়। উগ্রতা শব্দটি ইতিবাচক তাদের জন্য যারা সাম্প্রদায়িকতার প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং যারা এর বিরোধিতা করে তাদের কাছে শব্দটি নেতিবাচক।

বিভিন্ন ধর্মের প্রার্থনা স্থল

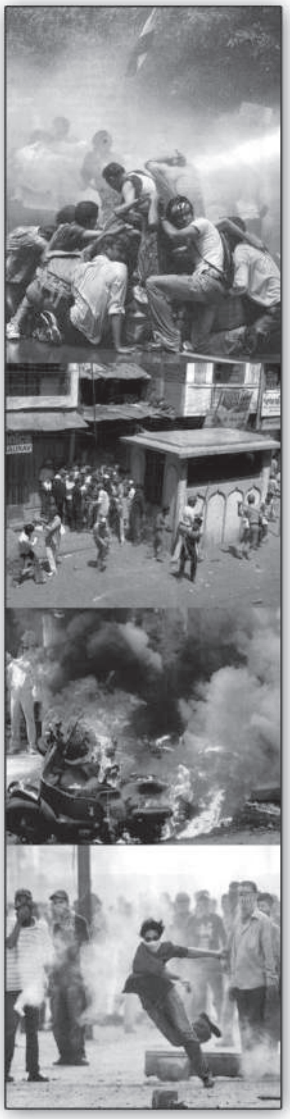
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

এটা জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে সাম্প্রদায়িকতা বস্তুত রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তবে ধর্মের সঙ্গে নয়। যদিও সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তীব্রভাবে ধর্মের সঙ্গে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সাম্পদায়িকতার মধ্যে কোনো অপরিহার্য সম্পর্ক বিদ্যামান নয়। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ধার্মিক ব্যক্তি হতেও পারে আবার নাও হতেপারে এবং কোনো ধর্ম বিশ্বাসী ব্যক্তি হয়তোবা সাম্প্রদায়িকতাবাদী হতেও পারে, বা নাও হতে পারে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ধর্ম অনুসারে রাজনৈতিক পরিচিতিতে বিশ্বাসী। তবে তার মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল অন্যদের প্রতি আচরণ বিশেষ করে যারা অন্য প্রকারের এবং অন্য ধর্মভিত্তিক পরিচিতিতে বিশ্বাস করে। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা উগ্র রাজনৈতিক পরিচয় পোষণ করে এবং সর্বদা অন্যান্য ব্যক্তির উপর আক্রমণ করতে প্রস্তুত থাকে যারা তাদের 'পরিচয়' অনুসরণ করে না।

সাম্প্রদায়িকতাবাদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে এটি ধর্মীয় পরিচয়কে সবকিছুর ঊর্ধ্বে বলে মনে করে। তাই একজন ব্যক্তি দরিদ্র না ধনী, তার পেশা, জাতি বা রাজনৈতিক বিশ্বাস, কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়, শুধুমাত্র ব্যক্তির ধর্মই গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা হয়। সকল হিন্দুরা একই ধর্মের, ঠিক যেমন সব মুসলমান, শিখ ইত্যাদি একই ধর্মের মানুষ। এর ফলে বৃহত্তর ও বৈচিত্র্যময় গোষ্ঠীকে একক ও স্বজাতীয় গোষ্ঠীতে পরিণত করা যায়। এটা লক্ষণীয় যে এমনটা নিজস্ব গোষ্ঠী এবং অন্য গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও করা হয়। তাই এই সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায় যখন কেরালায় বসবাস করা হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্যতা লক্ষ্য করা যায় যা কাশ্মীর, গুজরাট বা নাগাল্যান্ডে বসবাস করা তাদের সহধর্মাবলম্বীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। এটা এই সম্ভাবনাকেও অস্বীকার করে যে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক (অথবা শিল্পপতি)দের মধ্যে অনেক সাদৃশ্যতা থাকতে পারে, যদিও তারা ভিন্ন ধর্মের এবং ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত।

সাম্প্রদায়িকতা ভারতবর্ষে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা কেননা তা উদ্বেগ ও হিংস্রতার পৌণঃপুণিক উৎস। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়, মানুষ নিজের সাম্প্রদায়িক পরিচয়কেই বড় করে দেখে অর্থাৎ তখন মানুষের ব্যক্তিগত পরিচয়ের গুরুত্ব হারিয়ে যায়। সেই সময় তারা অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন বা অপহরণের মতো দুষ্কর্ম করতেও সম্মত থাকে যাতে তারা তাদের সামাজিক গর্বকে ধরে রাখতে ও সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত রাখতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে সাধারণত এই যুক্তি দেখানো হয় যে তাদের সহধর্মাবলম্বীদের অন্য কোথাও হত্যা বা অসম্মানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অথবা পূর্বে ঘটে যাওয়া এমন ঘটনার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তারা এমন কাজ করে থাকে। কোনো অঞ্চলই পুরোপুরিভাবে সাম্প্রদায়িক হিংসা থেকে মুক্ত নয় কারণ সব জায়গাতেই কোনো না কোনো ধরনের হিংস্রতা দেখা যায়। প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়কে কম-বেশি হিংস্রতার সম্মুখীন হতে হয়েছে যদিও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির ক্ষেত্রে এর আনুপাতিক প্রভাব অনেক বেশি মর্মান্তিক হয়। এই প্রসঙ্গে কোনো সরকার বা শাসক দল নির্দোষ হওয়ার দাবি করতে পারে না কারণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষেত্রে তাদের কিছু দায়বদ্ধতা থাকে। এটা সত্য যে সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষের যে দুটো মর্মান্তিক সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা পরিলক্ষিত হয়, তা দেশের দুই বৃহৎ রাজনৈতিক দলের শাসনকালে সংগঠিত হয়েছিল। 1984 সালে কংগ্রেসের শাসনকালে দিল্লিতে শিখ ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা সংগঠিত হয়। পুনরায় 2002 সালে গুজরাটে বিজেপি সরকারের শাসনকালে মুসলমান বিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত হয়।

প্রাক্‌স্বাধীনতা কাল থেকেই ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাস বিদ্যমান। প্রায়শই উপনিবেশিক শাসকদের 'বিভাজন এবং শাসন' (divide and rule) নীতিকে এর কারণ হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু আন্তঃসাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের উদ্ভব উপনিবেশবাদের কারণে হয়নি কারণ, প্রাক্-উপনিবেশিক দ্বন্দ্বের ইতিহাসও বিদ্যমান এবং নিশ্চিতরূপে স্বাধীনোত্তর দাঙ্গা এবং হত্যার ঘটনাগুলোর জন্য ব্রিটিশ উপনিবেশবাদকে দোষারোপ করা যায় না। তাই যদি আমরা ধর্মীয়,

বাক্স 6.9

কবীর দাস ঃ বিভিন্ন বিশ্বাস এবং চিন্তাধারার সমন্বয়ের এক দীর্ঘজীবী প্রতীক

হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের এক অভূতপূর্ব সমন্বয়সাধরনের ফলে কবীর দাস কর্তৃক রচিত কবিতাসমূহ ধর্মীয় কর্তৃত্ববাদের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়।

তুই কোথায় আমার খোঁজ করিস?	Where do you search for me?
আমি তো তোর সাথেই রয়েছি	I am with you
তীর্থে নয়, বিগ্রহে নয়,	Not in pilgrimage, nor in icons
নিঃসঙ্গতায়ও নয়,	Neither in solitude
মন্দির বা মসজিদ কোথাও নয়,	Not in temples, nor in mosques
কাবা শরিফ কিংবা কৈলাশেও নয়	Neither in *Kaaba* nor in *Kailash*
আমি তোর সাথেই আছি রে পাগল	I am with you o man
আমি তোর সাথেই থাকি ...	I am with you ...

সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক বা নৃজাতীয় দ্বন্দ্বের ঘটনা সম্পর্কে ভাবি, তাহলে ইতিহাসের প্রায় সকল পর্যায়েই এই প্রকার দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আমাদের এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে ভারতে ধর্মীয় বহুত্ববাদের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে, যার ব্যাপ্তি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পর্যায় হতে আন্তঃমিশ্রণ বা সমন্বয় প্রচেষ্টার পর্যায় অব্দি লক্ষ্য করা যায়। ভক্তি এবং সুফি আন্দোলনের (বাক্স 6.9) ভক্তিগীতি এবং কবিতা থেকে এই সমন্বয়ের ঐতিহ্যের স্পষ্টীকরণ পরিলক্ষিত হয়। তাই সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইতিহাস আমাদের ভালো ও খারাপ উভয় উদাহরণই প্রদান করে; তবে আমরা কী শিখতে ইচ্ছুক, আমাদের উপরেই নির্ভর করে।

কাজ 6.6

তোমার মাতাপিতা এবং পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে কথা বলে এমন কিছু কবিতা, সংগীত এবং ছোটগল্প সংগ্রহ কর যা ধর্মীয় বহুত্ববাদ, সমন্বয় প্রচেস্টা বা সাম্প্রদায়িক শান্তির বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। যখন সকল উপাদান সংগ্রহ করা হয়ে যাবে এবং তা শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপিত হবে, তোমরা আনন্দিত ও অবাক হয়ে দেখবে যে ধর্মীয় বহুত্ববাদের ঐতিহ্য কত প্রসারিত এবং বিভিন্ন ভাষাগত গোষ্ঠী, অঞ্চল এবং ধর্মে তার প্রভাব কিভাবে ছড়িয়ে রয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা ঃ

আমরা ইতিমধ্যেই যা দেখেছি তাতে সাম্প্রদায়িক এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদ শব্দের অর্থ এখন আমাদের কাছে কমবেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা স্বত্বেও সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে এ নিয়ে তিক্ত বিতর্ক রয়েছে। অপরদিকে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ বা ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দটি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা কঠিন, কেননা এগুলো সমানভাবে বিতর্কমূলক। কার্যত, সামাজিক এবং রাজনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ একটি জটিল শব্দ। পাশ্চাত্য প্রসঙ্গে এর প্রধান অর্থ হল চার্চ এবং রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ করা। পশ্চিমের সামাজিক ইতিহাসে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের পৃথকীকরণ এক মুখ্য সন্ধিক্ষণের সূচনা করে। এই পৃথকীকরণ ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ অথবা সামাজিক জীবন থেকে ধর্মের পশ্চাদসরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল, যার মাধ্যমে ‘ধর্ম’ বাধ্যতামূলক এই বাধ্যতামূলক থেকে সেটাকে স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তিগত অনুশীলনে রূপান্তরিত হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার এই প্রক্রিয়াটি আধুনিকতার আগমণ এবং বিজ্ঞান ও যৌক্তিকতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল যা ধর্মীয় উপায়ে বিশ্বকে উপলব্ধি করার বিকল্প হিসেবে কাজ করতো। ধর্মনিরপেক্ষ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভারতীয় অর্থে পাশ্চাত্য অনুভূতিকে শামিল করা হয় কিন্তু পাশাপাশি অন্যান্য অনুভূতিগুলোও অন্তর্ভুক্ত থাকে। দৈনন্দিন জীবনে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দটি সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিপরীত বলে ধরা হয়। সুতরাং এর অর্থ হল একজন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্র কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের পক্ষপাত করে না। এই অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ থেকে ভিন্ন এবং এটি ধর্মের পরিপন্থী নয়। এই অর্থে, রাষ্ট্র ধর্ম সম্পর্কে

ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্নতা বা ব্যবধান বোঝায় না বরং সকল ধর্মের জন্য সমান মর্যাদার ভাব প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সকল ধর্মের উৎসব সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষিত হয়।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্র চেতনায় রাষ্ট্রের দ্বারা সকল ধর্মের মধ্যে ব্যবধান এবং ভারতীয় রাষ্ট্র চেতনায় সকল ধর্মের প্রতি সমান মর্যাদা প্রদর্শন করার কারণে কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হয় যার ফলে এক ধরনের কঠিন পরিস্থিতির সূত্রপাত হয়। যখন রাষ্ট্র কোন একটি চেতনার সমর্থন করে তখন অন্যান্য চেতনার সমর্থকরা মর্মাহত হয়ে যায়। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কি উচিত হজ যাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা অথবা তিরুপতি তিরুমালা মন্দির প্রাঙ্গণের পরিচালনা করা অথবা হিমালয়ের পবিত্র স্থানগুলোর তীর্থযাত্রীদের সহায়তা করা? উদাহরণস্বরূপ, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, গান্ধি জয়ন্তী এবং আম্বেদকর জয়ন্তী ছাড়া সকল ধর্মীয় ছুটি কি রদ করা প্রয়োজন? কোন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কি গো-হত্যা বন্ধ করার ঘোষণা করা উচিত যেহেতু কোন নির্দিষ্ট ধর্মে গরুকে পবিত্র মানা হয়? যদি এমন হয় তাহলে কি শূকর হত্যাও বন্ধ করা উচিত কেননা অন্য একটি ধর্মে শূকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ? যদি শিখ সৈনিকদের সেনাবাহিনীতে লম্বা চুল রাখার এবং পাগড়ি পরার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে কি হিন্দু সৈনিকরাও মাথা মুণ্ডন করতে অনুমতি প্রাপ্ত অথবা মুসলমান সৈনিকরা লম্বা দাড়ি রাখতে অনুমতি প্রাপ্ত? এই ধরনের প্রশ্ন তীব্র মতবিরোধের সৃষ্টি করে যার সমাধান কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতীয় রাষ্ট্রদ্বারা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণ দেওয়ার ফলে আরও অন্যান্য ধরনের জটিলতা উৎপন্ন হয়। সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণ প্রয়োজন কারণ যেসব রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের অবস্থান দুর্বল রয়েছে অথবা তাদের অন্য সংখ্যাগরিষ্ঠদের সম্মুখীন হতে হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে তাদের সংরক্ষণের জন্য বিশেষ বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের সুরক্ষা প্রদানের ফলে অবিলম্বে সংখ্যালঘু পক্ষপাত বা তুষ্টি-র অভিযোগ উঠে। বিরোধীরা যুক্তি দেখান যে এই ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতা সংখ্যালঘুদের ভোট এবং অন্যান্য সহায়তার জন্য আনুকূল্যে আনার শুধুমাত্র একটি অজুহাত। অন্যদিকে সমর্থকরা যুক্তি দেখান যে, এই ধরনের বিশেষ সুরক্ষা ছাড়া, ধর্মনিরপেক্ষতা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মূল্যবোধ এবং নিয়ম নীতি সংখ্যালঘুদের উপর আরোপ করার একটি অজুহাতে পরিণত হতে পারে।

এই ধরনের বিতর্কের সমাধান করা কঠিনতর হয়ে যায় যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক আন্দোলন কায়েমী স্বার্থ বিকাশের জন্য এই বিতর্কগুলিকে জীবিত রাখে। সাম্প্রতিককালে, সকল ধর্মের সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এই অচলাবস্থার জন্য দায়ী। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার পুনরুত্থান এবং নতুনভাবে অর্জিত রাজনৈতিক ক্ষমতা গুরুতর জটিলতার সৃষ্টি করেছে। পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি তত্ত্ব হিসেবে বোঝার এবং একটি নীতি হিসেবে অনুশীলন করার জন্য আমাদের অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা এখনো সত্য যে ভারতীয় সংবিধান এবং আইনগত কাঠামো বিভিন্ন ধরনের সাম্প্রদায়িকতাবাদ থেকে তৈরি সমস্যার যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিচালনা করতে কার্যকর প্রমাণিত হয়।

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রজন্মের নেতারা (যারা বিশেষত হিন্দু এবং উঁচু জাতির) গণতান্ত্রিক সংবিধান দ্বারা এক উদার, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় সরকার বেছে নিয়েছিলেন। এভাবে, একটি নিরপেক্ষ রাজ্যের ধারণা তৈরি হয় এবং 'রাষ্ট্র'কে সকল নাগরিকের জন্য আঞ্চলিক-রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করার কল্পনা করা হয়। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে মূলত রাজ্য চালিত অর্থনৈতিক বিকাশ এবং সামাজিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়। এটা

প্রত্যাশিত ছিল যে নাগরিকত্বের অধিকারের সর্বজনীনকরণ এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত উন্মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতিতে সাংস্কৃতিক বিবিধতার অন্তর্ভুক্তির ফলে বিভিন্ন নৃজাতীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে এবং সেইসব সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের এক নতুন সমীকরণের উদ্ভব ঘটবে (Sheth : 1999)। এই প্রত্যাশাগুলো হয়তো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু স্বাধীনতার সময়কাল থেকে ভারতীয় জনগণ সরাসরি রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং তাদের প্রদত্ত নির্বাচনি রায় দ্বারা একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান এবং রাষ্ট্রের বারংবার সমর্থন জাহির করেছেন। এক্ষেত্রে তাদের অভিমত নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়।

6.4 রাজ্য এবং নাগরিক সমাজ ঃ

তোমরা সম্ভবত লক্ষ্য করেছ যে, এই অধ্যায়ের বেশিরভাগ অংশ রাজ্য সম্পর্কিত। জাতীয় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজ্য প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। যদিও একটি রাজ্য সেই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হওয়ার দাবি করে, তথাপি রাষ্ট্র এবং তার জনগণ ছাড়াও একটি রাজ্য নিজের স্বতন্ত্র অবস্থাও তৈরি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি রাজ্যের কাঠামো — আইনসভা, আমলাতন্ত্র, বিচার ব্যবস্থা, সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য ক্ষেত্র জনগণ থেকে পৃথক হয়ে যেতে পারে আবার এটি সম্ভাব্য স্বৈরাচারীও হয়ে উঠতে পারে। একটি স্বৈরাচারী রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে ভিন্ন। এটি এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে জনগণের বাক্‌স্বাধীনতা থাকে না এবং যারা ক্ষমতায় থাকে তারা কারও কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকে না। একটি স্বৈরাচারী রাষ্ট্র তার জনগণের উপর প্রায়ই কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপ করে থাকে। সেখানে জনগণের স্বাধীনতাকে বিলোপ করা হয়, যেমন- বাক্ স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক কার্যকলাপের স্বাধীনতা, কর্তৃত্বের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা, আইনের যথাযথ প্রয়োগ ইত্যাদি। স্বৈরতন্ত্র ছাড়াও, দুর্নীতি, অদক্ষতা অথবা সম্পদের অভাবের কারণে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক থাকে। সংক্ষেপে, এমন অনেক কারণ আছে যার ফলে একটা রাষ্ট্রের যেমন হওয়া উচিত তেমন হয় না। এক্ষেত্রে অ-রাষ্ট্রীয় উপাদান এবং প্রতিষ্ঠান খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে, কেন না এগুলো রাষ্ট্রের পর্যবেক্ষণ করতে, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে অথবা তাদের কার্যে সহায়তা করতে পারে।

'নাগরিক সমাজ' নামটি এমন এক বৃহৎ কর্মক্ষেত্রকে দেওয়া হয়েছে যা পরিবারের ব্যক্তিগত সীমার উর্ধ্বে কিন্তু রাজ্য ও বাজার উভয়ের এক্তিয়ারের বাইরে থাকে। নাগরিক সমাজ হল সর্বজনীন ক্ষেত্রের অ-রাষ্ট্রীয় ও অ-বাজারের অংশ, যেখানে সকল ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন প্রতিস্টার জন্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এটি সক্রিয় নাগরিকত্বের কর্মক্ষেত্র ঃ এখানে প্রত্যেকে সামাজিক বিষয়ে তার মতামত ব্যক্ত করে, রাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে অথবা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেটার দাবি জানায়, যৌথ আগ্রহ অন্বেষণ করে এবং বিভিন্ন কাজের সমর্থন পেতে চেস্টা করে। এটা গঠিত হয় স্বেচ্ছাসেবী সংঘ, নাগরিকদের দ্বারা গঠিত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে রাজনৈতিক সংগঠন, গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সংগঠন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (NGOs), ধর্মীয় সংগঠন এং অন্যান্য যৌথ সংস্থাগুলো। নাগরিক সমাজে অন্তর্ভুক্তির প্রধান মানদণ্ড হল সংগঠন কখনও রাষ্ট্র বা রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে না এবং এটি কখনও সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যক মুনাফা তৈরির সত্তা হবে না। এই কারণে 'দূরদর্শন' অন্যান্য ব্যক্তিগত টেলিভিশন চ্যানেলের ন্যায় — নাগরিক সমাজের অংশ নয়; একটি গাড়ি প্রস্তুতকারক কোম্পানি নাগরিক সমাজের অংশ নয়, কিন্তু শ্রমিক যে শ্রমিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত সেটা নাগরিক সমাজের অংশ। বাস্তবে এই মাণদণ্ডে অনেক ক্ষেত্র অস্পস্ট রয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি

সংবাদপত্র সম্পূর্ণভাবে একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ হিসেবে পরিচালিত হতে পারে, অথবা একটি বেসরকারি সংস্থা সরকারি তহবিল দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারে।

1975 সালের জুন এবং 1977 সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে ভারতে 'জরুরি অবস্থা' জারি হয়। সে সময় ভারতের জনগণের 'স্বৈরাচারী শাসন' সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সে সময় পার্লামেন্ট স্থগিত রাখা হয়েছিল ও সরাসরি সরকার থেকে একটি নতুন আইন তৈরি করা হয়েছিল। ব্যক্তি স্বাধীনতা রদ করা হয়েছিল এবং ব্যাপক সংখ্যায় রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় ব্যক্তিদের বিনা বিচারে গ্রেফতার করা হয়। গণমাধ্যমের উপর সেন্সরশীপ আরোপিত হয় এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়মমাফিক পদ্ধতি ছাড়াই বরখাস্ত করা হয়। সরকার নিম্ন শ্রেণির কর্মকর্তাদের তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং তার তাৎক্ষণিক ফলাফল প্রদান করতে বাধ্য করে। সবচেয়ে কুখ্যাত ছিল জোরপূর্বক নির্বীজন প্রচারাভিযান যার ফলস্বরূপ অস্ত্রোপচারের জটিলতার কারণে ব্যাপক সংখ্যায় মানুষের মৃত্যু হয়। 1977 সালের শুরুতে যখন অপ্রত্যাশিতভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, জনগণ তাতে অপ্রতিরোধ্যভাবে কংগ্রেস পার্টির বিরুদ্ধে ভোট দেয়।

ভারতে 'জরুরি অবস্থা' জারি হওয়ার ফলে জনসাধারণ সক্রিয়ভাবে নাগরিক সমাজের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। পাশাপাশি নাগরিক সমাজ কর্তৃক 1970 সালে যেসব উদ্যোগের উদ্ভব হয় সেগুলোও বলিষ্ঠ হয়ে উঠে। এই পর্যায়ে বিস্তৃত সামাজিক আন্দোলনের পুনরুত্থান হয় যার মধ্যে অন্যতম হল নারী, পরিবেশ, মানবাধিকার এবং দলিত আন্দোলন। বর্তমানে নাগরিক সমাজের ক্রিয়াকলাপের পরিসর অনেক বিস্তৃত, সেই সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রচার ও তদবিরমূলক ক্রিয়াকলাপ ও বিভিন্ন আন্দোলনেও তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত হয়।

সরকারকে জনগণের কাছে জবাব দিতে বাধ্য করা ঃ তথ্যের অধিকার আইন

বাক্স 6.10

তথ্যের অধিকার আইন হল 2005 সালে (Act No. 22/2005) ভারতের সংসদ দ্বারা ভারতীয়দের জন্য অনুমোদিত আইন (জম্মু ও কাশ্মীর, যাদের নিজস্ব বিশেষ আইন আছে, সেখানকার বসবাসকারীরা ছাড়া) যার মাধ্যমে সরকারি নথিকে জানার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই আইনের শর্তাবলীর মধ্যে রয়েছে যে কোনো ব্যক্তি তথ্যের জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষ (সরকারি সংস্থা বা রাষ্ট্রের/রাজ্যের সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থা)-র কাছে অনুরোধ করতে পারে এবং ওই কর্তৃপক্ষের কাছে দ্রুততর অর্থাৎ ত্রিশ দিনের মধ্যে উত্তর আশা করা যায়। এই আইনের ব্যাপক প্রচারের জন্য সকল সরকারি কর্তৃপক্ষকে তাদের তথ্যগুলোকে কম্পিউটারাইজড করা প্রয়োজন এবং কিছু বিশেষ প্রকারের তথ্য সক্রিয়ভাবে প্রকাশ করা যায় ফলে নাগরিকদের প্রয়োজনীয় যথাবিধি তথ্যের জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করার আবশ্যকতা না হয়।

2005 সালের 15 জুন এই আইনটি সংসদে অনুমোদিত হয় এবং 2005 সালের 13 অক্টোবর আইনটি কার্যকর করা হয়।এযাবৎ ভারতে 1923 সালের সরকারি গোপনীয়তা রক্ষা আইন (Official Secrets Act) এবং অন্যান্য বিভিন্ন আইন দ্বারা তথ্য প্রকাশ সীমাবদ্ধ ছিল যা নতুন এই তথ্যের অধিকার আইন (RTI Act) দ্বারা বাতিল করা হয়। এই আইন বিশেষভাবে নাগরিকদের নিম্নলিখিত অধিকার প্রদান করে ঃ

- যে কোনো তথ্যের জন্য অনুরোধ করা (যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা আছে) যেতে পারে।
- নথিপত্রের অনুলিপি পাওয়া যেতে পারে।
  - কাগজপত্র, কাজ এবং নথিপত্রের পরিদর্শন করা যেতে পারে।
  - কাজের উপকরণের প্রত্যয়িত নকল নেওয়া যেতে পারে।
  - প্রিন্টআউট, ডিসকেট, ফ্লপি, টেপ্স, ভিডিও কেসেট অথবা অন্যান্য ইলেকট্রনিক উপকরণের মাধ্যমে তথ্য জানা যেতে পারে।

এই আন্দোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা তুলে ধরা হয় যেমন- জমির অধিকারের জন্য উপজাতিদের সংগ্রাম, শহুরে শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, নারীদের বিরুদ্ধে হিংসা এবং ধর্ষণের প্রতিবাদ, বাঁধ এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ফলে বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসন, মাছ ধরার যান্ত্রিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে মৎস্যজীবীদের সংগ্রাম, রাস্তার পাশের জিনিস বিক্রেতা এবং ফুটপাতে বসবাসকারীদের পুনর্বাসন, বস্তি ধ্বংসকরণের বিরুদ্ধে ও আবাসনের অধিকারের দাবিতে প্রচার, প্রাথমিক শিক্ষা ও দলিতদের জমি বণ্টনের দাবিতে আন্দোলন। রাষ্ট্রের উপর নজরদারি করা এবং এটিকে আইন মান্য করার জন্য বাধ্য করার ক্ষেত্রে স্বাধীন নাগরিক সংস্থার (Civil liberties organisations) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেই সঙ্গে গণমাধ্যমও ক্রমবর্ধমানভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, বিশেষ করে দৃশ্যমান এবং বৈদ্যুতিন ক্ষেত্রের উদ্ভবের পরে।

কাজ 6.9

তোমার আশেপাশের বিভিন্ন নাগরিক সমাজ সংগঠন অথবা বেসরকারি সংগঠন সম্পর্কে খোঁজ করো। তারা কী প্রকারের সমস্যা তুলে ধরে? সেখানে কি ধরনের লোকজন কাজ করে? এই সংগঠনগুলো কীভাবে নিম্নলিখিতগুলো থেকে ভিন্ন ঃ

a) সরকারি সংগঠন

b) বাণিজ্যিক সংগঠন

সাম্প্রতিক উদ্যোগগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তথ্যের অধিকারের প্রচার। এর সূচনা হয়েছিল গ্রামীণ রাজস্থানের একটি আন্দোলনের মাধ্যমে যেখানে গ্রামের বিকাশের জন্য খরচ করা সরকারি তহবিলের তথ্য প্রকাশের জন্য চালু হয়। পরে এই প্রচেষ্টা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। আমলাতন্ত্রের বিরোধিতা স্বত্বেও, সরকার এই প্রচেষ্টার উপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে এবং নাগরিকদের জন্য নতুন আইন অর্থাৎ তথ্যের অধিকার আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়। (বাক্স 6.10)। এই ধরনের উদাহরণ নাগরিক সমাজের বিশেষ গুরুত্বের ব্যাখ্যা করে এবং রাষ্ট্র তার দেশ ও জনগণের কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য এটা স্পষ্ট করে।

প্রশ্নাবলী

1. সাংস্কৃতিক বৈচিত্র বলতে কী বোঝায়? ভারতবর্ষকে কেন বৈচিত্রময় দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়?
2. সাম্প্রদায়িক পরিচিতি কি এবং তা কিভাবে গঠিত হয়?
3. রাষ্ট্রকে (Nation) ব্যাখ্যা করা কঠিন কেন? আধুনিক সমাজে রাষ্ট্র এবং রাজ্য কিভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত?
4. সামাজিক বৈচিত্রতা সম্পর্কে রাষ্ট্র প্রায়ই সন্দেহ প্রবণ হয় কেন?
5. আঞ্চলিকতাবাদ কী? এটি কী কী কারণের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়?
6. তোমার মতে, রাজ্যের ভাষাগত পুনস্থাপন ভারতের ক্ষেত্রে সহায়ক না অপকারী?
7. 'সংখ্যালঘু' কী? রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কেন রয়েছে?
8. সাম্প্রদায়িকতা কী?
9. ভারতে ধর্ম নিরপেক্ষতা' কী কী অর্থে অনুভূত হয়?
10. বর্তমান সময়ে নাগরিক সামাজিক সংগঠনের প্রাসঙ্গিকতা কী?

REFERENCES

Bhargava, Rajeev. 1998. 'What is Secularism for?', in Bhargava, Rajeev. ed. *Secularism and its Critics*. Oxford University Press. New Delhi.

Bhargava, Rajeev. 2005. *Civil Society, Public Sphere and Citizenship.* Sage Publications. New Delhi.

Bhattacharyya, Harihar. 2005. *Federalism and Regionalism in India: Institutional Strategies and Political Accommodation of Identities.* working paper No. 27, South Asia Institute, Dept of Political Science. University of Heidelberg, Heidelberg.

Brass, Paul. 1974. *Language, Religion and Politics in North India.* Vikas Publishing House. Delhi.

Chandra, Bipan. 1987. *Communalism in Modern India.* Vikas Publishing House.
New Delhi.

Miller, David. 1995. *On Nationality.* Clarendon Press. Oxford.

Sheth, D.L. 1999. 'The Nation-State and Minority Rights', in Sheth, D.L. and Mahajan, Gurpreet. ed. *Minority Identities and the Nation-State.* Oxford University Press. New Delhi.

Notes

সপ্তম অধ্যায়

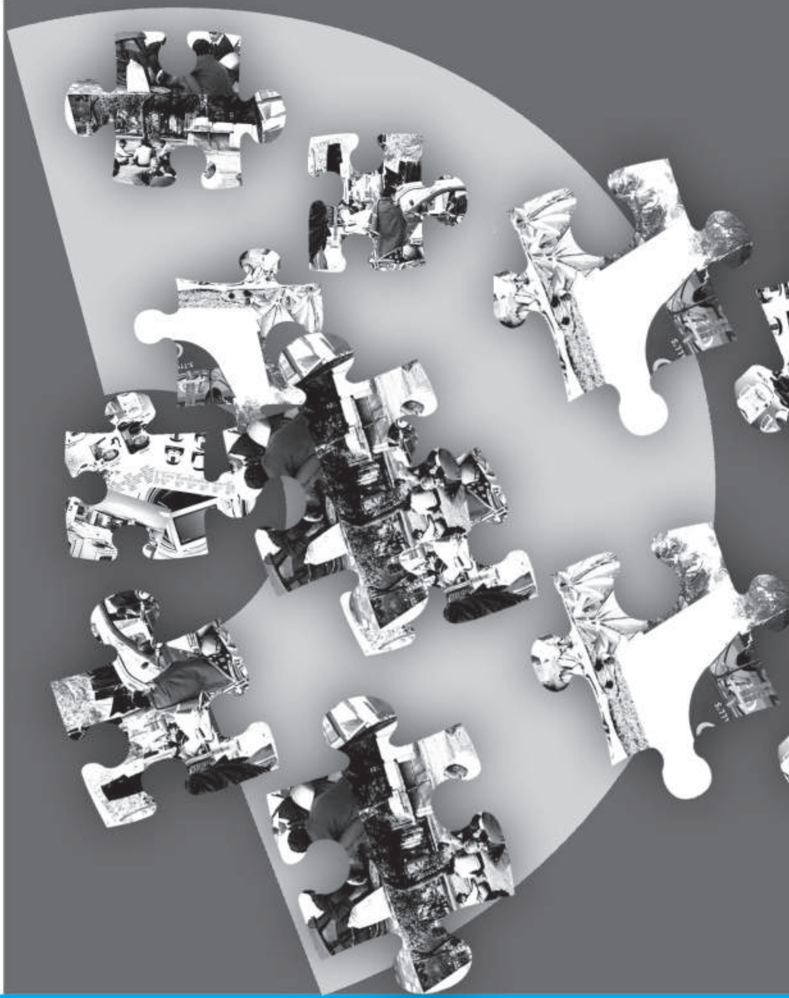

প্রকল্প রূপায়ণের জন্য পরামর্শ

এই অধ্যায়ে কিছু ছোটো ব্যবহারিক গবেষণা প্রকল্পের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যা তোমরা চেষ্টা করতে পারো। বাস্তবক্ষেত্রে, গবেষণা করা এবং গবেষণা সম্পর্কে পড়াশোনা করার মধ্যে বিস্তর ফারাক/ব্যবধান। একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং নিয়মানুযায়ী তথ্য-প্রমাণ একত্রিত করা একটি বিশাল মূল্যবান অভিজ্ঞতা। এটা আশা করা যায় যে এই ধরনের অভিজ্ঞতা তোমাদেরকে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার কিছু উৎফুল্লতা এবং কিছু অসুবিধার সঙ্গে পরিচয় করাবে। এই অধ্যায় পাঠের পূর্বে, অনুগ্রহ করে আরও একবার একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই, 'সমাজতত্ত্ব পরিচয়'-এর পঞ্চম অধ্যায় ("সমাজতত্ত্বে করণীয়ঃ গবেষণা পদ্ধতি সমূহ") দেখো।

এখানে দেওয়া প্রকল্পগুলির দ্বারা বিভিন্ন ধরনের প্রেক্ষাপটে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ের বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষার্থীদের এই ধরনের প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে হওয়া সম্ভাব্য অসুবিধাগুলিকে দেখানোর প্রত্যাশিত চেষ্টা করা হয়েছে। এসবের দ্বারা তোমাদের মধ্যে গবেষণার যথাযথ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি "প্রকৃত" গবেষণা প্রকল্পকে সুস্পষ্টরূপে আরও সম্প্রসারিত হতে হবে এবং সেটা অনেক বেশি সময়সাপেক্ষ ও প্রচেষ্টাজনিত যা তোমাদের মতো অবস্থায় করা সম্ভব নয়। এগুলো শুধুমাত্র পরামর্শ হিসেবে দেওয়া হল; এব্যাপারে তোমরা তোমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে নিজের ধারণার উপর গবেষণা প্রকল্প প্রস্তুত করে কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

প্রতিটি গবেষণা প্রশ্নের জন্য একটি সঠিক এবং উপযুক্ত গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োজন। একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর একাধিক পদ্ধতির দ্বারা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু নির্দিষ্ট একই গবেষণা পদ্ধতি সকল প্রশ্নের জন্য অপরিহার্যভাবে যথোপযুক্ত নাও হতে পারে। অন্যভাবে বলা যায় যে, একজনের কাছে বেশিরভাগ গবেষণা প্রশ্নের জন্য সম্ভাব্য পদ্ধতি পছন্দের সুযোগ রয়েছে, কিন্তু এটা সাধারণত সীমিত। একজন গবেষকের প্রথম কাজ হল যত্নসহকারে গবেষণা প্রশ্নের উল্লেখ করার পর একটি উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করা। এই নির্বাচন শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত মানদণ্ডের (অর্থাৎ প্রশ্ন এবং পদ্ধতির সামঞ্জস্যের মাত্রা) ভিত্তিতে করা হয় না সেই সঙ্গে ব্যবহারিক সিদ্ধান্তও থাকে। এখানে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য প্রাপ্ত সময়; সংস্থান অর্থাৎ মানুষ এবং বস্তুগত উপাদান উভয়ের পর্যাপ্ততার উপর; কোন্ পারিপার্শ্বিকতা বা অবস্থায় সেটা করা হচ্ছে ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, ধরে নাও তোমরা/তুমি সহ-শিক্ষাগত বিদ্যালয়ের (co-educational school) সঙ্গে 'শুধু ছেলেদের' বা 'শুধু মেয়েদের' বিদ্যালয়ের তুলনামূলক অধ্যয়ন করতে আগ্রহী। এটি নিশ্চিতভাবে একটি বিস্তৃত বিষয়। প্রথমে তোমাকে একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হবে যার উত্তর তুমি দিতে চাও। উদাহরণ হতে পারে ঃ সহ শিক্ষাগত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কি পড়াশোনাতে 'শুধু ছেলেদের' অথবা 'শুধু মেয়েদের' বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তুলনায় ভালো? 'শুধু ছেলেদের' বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কি খেলাধুলাতে সহ শিক্ষাগত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের থেকে ভালো? একক লিঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কি সহ শিক্ষাগত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের থেকে বেশি হাসিখুশি? অথবা এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন। নির্দিষ্ট প্রশ্ন ঠিক করার পর, পরবর্তী পর্যায় হল সঠিক পদ্ধতির নির্বাচন করা।

উদাহরণস্বরূপ শেষ প্রশ্নটি যেমন "একক লিঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কি বেশি হাসিখুশি?" এটার জন্য তোমরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার নিতে পারো। সাক্ষাৎকারে তোমরা সোজাসুজি তাদের জিজ্ঞেস করতে পারো যে বিদ্যালয় সম্পর্কে তাদের অনুভব কী? এরপর তোমরা সেইসব উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখতে পারো যে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীদের উত্তরের মধ্যে কী পার্থক্য আছে। এই পদ্ধতির পরিবর্তে, গবেষণা প্রশ্নের উত্তরের জন্য তোমরা অন্য পদ্ধতির প্রয়োগ করতে পারো — যেমন প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ — অর্থাৎ কীভাবে শিক্ষার্থীরা আচরণ করছে সেটা পর্যবেক্ষণের জন্য তোমাদেরকে সহশিক্ষাগত বিদ্যালয়, ছেলেদের /মেয়েদের বিদ্যালয়ে কিছুটা সময় কাটাতে হবে বা থাকতে হবে। তোমাদেরকে/তোমাকে কিছু মানদণ্ডের উপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে যার দ্বারা তোমরা/তুমি এটা বলতে পারবে যে

শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ বিদ্যালয় নিয়ে খুশি কিনা। তাই, বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত সময়ের জন্য পর্যবেক্ষণের পরে, তোমরা আশা করতেপারো যে এবার তোমরা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। তোমরা তৃতীয় আর একটি পদ্ধতির প্রয়োগও করতে পারো, যেমন- নিরীক্ষা বা সার্ভে পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তাদের বিদ্যালয় সম্পর্কে অনুভবের কথা জানতে তোমাদের/তোমাকে একটি প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করতে হবে। তারপর এই প্রশ্নপত্র সমান সংখ্যায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিতরণ করতে হবে এবং উত্তর-পূর্ণ প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে তোমরা ফলাফল বিশ্লেষণ করে নেবে।

এই ধরনের গবেষণা করার সময় তোমরা যে ধরনের ব্যবহারিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারো তার কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হল। মনে করো, তোমরা সার্ভে বা নিরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ। তাই প্রথমেই তোমাকে /তোমাদেরকে পর্যাপ্ত সংখ্যায় প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করে নিতে হবে। এটারসঙ্গে সময়, প্রচেষ্টা এবং টাকা পয়সা জড়িত। পরবর্তীতে, শ্রেণিকক্ষে গিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্র বিতরণ করার জন্য শিক্ষকের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। প্রথম অবস্থায় তোমরা অনুমতি নাও পেতে পারো, অথবা তোমাদেরকে পরে আসার জন্যও বলা হতে পারে ... প্রশ্নপত্র বিতরণের পরে, তোমরা দেখতে পাবে যে অনেকেই সেটা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে না বা সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দেয়নি অথবা এই ধরনের অন্যকিছু অসুবিধা। তখন এটা কীভাবে মোকাবিলা করবে সেই সিদ্ধান্ত তোমাদের নিতে হবে — উত্তরদাতার কাছে গিয়ে প্রশ্নপত্র সম্পূর্ণ করতে বলবে; অথবা অসম্পূর্ণ প্রশ্নগুলোকে ছেড়ে দেবে এবং শুধুমাত্র সম্পূর্ণ করা প্রশ্নপত্রগুলোকেই বিবেচনার জন্য নেবে এবং এই ধরনের আরো অনেক কিছু গবেষণার কাজ চলাকালীন তোমাদের অবশ্যই এই ধরনের অসুবিধা মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

7.1 বিভিন্ন পদ্ধতি

তোমরা একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই ‘সমাজতত্ত্ব পরিচয়’-এর পঞ্চম অধ্যায়ে গবেষণা পদ্ধতির আলোচনাকে মনে করে দেখতে পারো। এই অধ্যায়কে দ্বিতীয়বার দেখার এবং তোমাদের স্মৃতিশক্তিকে সতেজ করার এটাই খুব ভালো সময়।

সার্ভে বা সমীক্ষা পদ্ধতি

সার্ভে বা সমীক্ষা পদ্ধতিতে সাধারণত তুলনামূলকভাবে বিশাল সংখ্যার উত্তরদাতাকে জিজ্ঞেস করা হয় (যেমন 30, 100, 2000 এবং আরও বেশি; যাকে ‘বিশাল’ গণ্য করা হয় সেটা বিষয়ের ধরন এবং প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভরশীল) নির্দিষ্ট ধরনের কিছু প্রশ্ন। প্রশ্নগুলো অন্বেষণকারীদ্বারা মুখোমুখি জিজ্ঞেস করে উত্তর লিখে নেওয়া হয় অথবা প্রশ্নপত্র উত্তরদাতাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয় এবং পরে সেটা সংগ্রহ করে নেওয়া হয়। সার্ভে বা সমীক্ষা পদ্ধতির প্রধান সুবিধা হচ্ছে যে এতে বিশাল সংখ্যার লোকের মতামত জানা যায় যার ফলে সেই গোষ্ঠীর অথবা জনসংখ্যক সত্যিকারের প্রতিনিধিরূপে কাজ করে। এই পদ্ধতির অসুবিধা হচ্ছে যে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলো নির্দিষ্ট করা থাকে। সরাসরি কোনো সমন্বয় (adjustment) সম্ভব হয় না। তাই, যদি উত্তরদাতারা কোনো প্রশ্ন সঠিকভাবে বুঝতে না পারে, তাহলে ভুল অথবা বিভ্রান্তিকর ফলাফল উৎপন্ন হতে পারে। আবার যদি কোনো উত্তর দাতা কোনো মজাদার উত্তর দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রেও আরও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে সেটাকে এগিয়ে নেওয়া যায় না কারণ তোমাদের প্রশ্নপত্রের বিন্যাস অনুসারেই চলতে হবে। তাছাড়া, প্রশ্নপত্রগুলো হলো একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তের ছবির (snapshot) মতো। পরবর্তী সময়ে অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে অথবা পূর্বে হয়তো ভিন্ন অবস্থা ছিল, কিন্তু সমীক্ষাতে সেটা ধরা পড়ছে না।

সাক্ষাৎকার ঃ

একটি সাক্ষাৎকার একটি সমীক্ষা থেকে ভিন্ন এই অর্থে যে সাক্ষাৎকার সবসময় ব্যক্তিগতভাবে পরিচালনা করা হয় এবং সাধারণত খুব কম সংখ্যক লোক জড়িত থাকে (স্বল্প সংখ্যক যেমন 5,20 অথবা 40 , সাধারণত এর থেকে বেশি হয় না)। সাক্ষাৎকার পরিকাঠামোগত (structured) হতে পারে অর্থাৎ পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় অথবা পরিকাঠামোবিহীন (unstructured), যেখানে শুধুমাত্র বিষয়টি পূর্ব-নির্ধারিত থাকে এবং প্রকৃত প্রশ্নগুলো কথোপকথনের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। সাক্ষাৎকার অধিক গভীরতাপূর্ণ বা স্বল্প গভীরতাপূর্ণ হতে পারে এই অর্থে যে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী দীর্ঘ সময় (2-3 ঘণ্টা) পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিতে পারে অথবা কাহিনি বিস্তৃতভাবে জানার জন্য বার বার সাক্ষাৎ করতে পারে।

সাক্ষাৎকার পদ্ধতির একটি সুবিধা হল যে এটা নমনীয় কেন না সম্পর্কিত বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা যায়, প্রয়োজন অনুসারে প্রশ্নগুলো পরিমার্জিত এবং সংশোধিত করা যায় এবং উত্তরদাতাকে তার উত্তরের ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগও রয়েছে। সাক্ষাৎকারের একটি অসুবিধা হচ্ছে যে এখানে বেশি সংখ্যার মানুষকে যুক্ত করা যায় না এবং সেটা ব্যক্তিবর্গের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মতামতকে উপস্থাপিত করে।

পর্যবেক্ষণ ঃ

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে গবেষককে তার গবেষণার জন্য নির্ধারিত পরিস্থিতিতে বা প্রেক্ষাপটে কী হচ্ছে সেটা নজর রাখতে এবং লিপিবদ্ধ করে রাখতে হয়। এটা খুব সহজ মনে হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এটা সবসময় এত সহজে হয় না। কোন্ ঘটনা গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সেটার প্রাক্-বিচার না করে গবেষকের উচিত যা কিছু ঘটছে তার উপর সতর্কতার সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে দেখা।কখনও কখনও, যা ঘটছে না সেটা বাস্তবে যা ঘটছে সেটার মতোই গুরুত্বপূর্ণ বা মজাদার হয়ে থাকে । উদাহরণস্বরূপ, যদি তোমার গবেষণার প্রশ্ন হয়ে থাকে কীভাবে বিভিন্ন শ্রেণির লোক নির্দিষ্ট কিছু খোলা জায়গার ব্যবহার করে থাকে, তাহলে এটা উল্লেখযোগ্য যে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি বা গোষ্ঠীর (উদাহরণস্বরূপ গরিব অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ) মানুষ ওই জায়গায় কোনোদিন যায়নি অথবা তারা সে জায়গা কখনও দেখেনি।

একাধিক পদ্ধতির সমন্বয় ঃ

তোমরা একই গবেষণা প্রশ্নকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার জন্য পদ্ধতির সমন্বয় করতে পারো। বস্তুত, এটা প্রায়ই অত্যন্ত প্রস্তাবিত একটি পদ্ধতি। যদি তোমরা সামাজিক জীবনে সংবাদপত্র অথবা টেলিভিশনের মতো গণমাধ্যমগুলোর পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপর গবেষণা কর, তোমরা তখন সার্ভে বা সমীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে আর্কাইভাল (archival) পদ্ধতির সমন্বয় করে নিতে পারো। সমীক্ষা পদ্ধতি তোমাদের এটা বলে দেবে যে আজকাল/বর্তমানে কী হচ্ছে, যেখানে আর্কাইভাল পদ্ধতি থেকে তোমরা এটা বুঝতে পারবে যে কোনো ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র বা টেলিভিশন প্রোগ্রাম অতীতে কেমন ছিল।

7.2 ছোটো গবেষণা প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্য থিম্ এবং বিষয়

এখানে গবেষণার সম্ভাব্য কিছু বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হল ঃ তাছাড়া তোমরা তোমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে অন্য বিষয়ও পছন্দ করতে পারো। মনে রাখতে হবে যে এগুলো

শুধুমাত্র বিষয় — এই বিষয়গুলোর উপর নির্দিষ্ট প্রশ্ন তোমাদের/তোমাকে নির্বাচন করতে হবে। এটাও মনে রাখতে হবে যে, অধিকাংশ পদ্ধতি এই বিষয়গুলোর অধিকাংশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে, কিন্তু নির্দিষ্ট প্রশ্নের নির্বাচন যাতে নির্বাচিত পদ্ধতির উপযুক্ত হয়। তোমরা একসঙ্গে একাধিক পদ্ধতিরও প্রয়োগ করতে পারো। সম্ভাব্য বিষয়গুলো কোনো নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে দেওয়া হয়নি। যে বিষয়গুলো সুস্পষ্টরূপে অথবা সরাসরি তোমাদের পাঠ্যবই থেকে নেওয়া হয়নি তার উপর এখানে জোর দেওয়া হয়েছে কারণ এতে তোমাদের এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পক্ষে সুবিধাজনক হবে পাঠ্যবই সম্পর্কিত নিজস্ব প্রকল্পের বিষয় চিন্তা করতে।

1. সর্বজনীন পরিবহণ ঃ

মানুষের জীবনে এটার ভূমিকা কী? এটা কাদের প্রয়োজন? কেন এটা তাদের প্রয়োজন? বিভিন্ন ধরনের লোক সর্বজনীন পরিবহণের উপর কতখানি নির্ভরশীল? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে সর্বজনীন পরিবহণ ব্যবস্থার ধরন পরিবর্তিত হয়েছে? সর্বজনীন পরিবহণের পার্থক্যমূলক উপলব্ধি কি সামাজিক অসুবিধার কারণ? এই ধরনের কোনো গোষ্ঠী আছে কি যাদের সর্বজনীন পরিবহণের প্রয়োজনীয়তা নেই? এটার প্রতি তাদের কী মনোভাব/চিন্তাধারা? তোমরা কোনো নির্দিষ্ট ধরনের একটি পরিবহণ যেমন- টাঙ্গা, বা রিক্সা বা রেল গাড়িকেও পছন্দ করতে পারো এবং তোমার শহর অথবা নগরের সাথে এটার তুলনামূলক ইতিহাস লিখতে পারো। এই ধরনের পরিবহণ পদ্ধতি কী কী পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলছে? তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কারা? এই ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এগুলো কি হারিয়ে যাচ্ছে নাকি জয়ী হচ্ছে? এসবের কারণ কী? এই ধরনের পরিবহণ পদ্ধতির সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কী? কেউ কি এটার অভাববোধ করবে?

তুমি / তোমরা যদি দিল্লিতে বসবাস করে থাকো, তাহলে দিল্লির মেট্রো সম্পর্কে আরও কিছু খোঁজার চেষ্টা করো। এখন থেকে পঞ্চাশ বছর পরে, আনুমানিক 2050 অথবা 2060 এর দশকে মেট্রো দেখতে কেমন হবে তার উপর তোমরা কি কোনো সায়েন্স ফিক্‌শন (Science-fiction) লিখতে পারবে? (মনে রাখবে, একটি ভালো সায়েন্স ফিক্‌শন লেখা এত সহজ নয়! যে জিনিসগুলোর চিন্তা তোমরা করছ সেটার কারণ দেখাতে হবে; এই ভবিষ্যৎ বস্তু বা জিনিসগুলো সুসঙ্গত ছন্দে বা কায়দায় বর্তমানে উপস্থিত কোনো বস্তু/সম্পর্ক/পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকতে হবে। তাই তোমাদের চিন্তা করতে হবে যে বর্তমান পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে সর্বজনীন পরিবহণের কী বিবর্তন হবে এবং বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যত মেট্রোর ভূমিকা কী হবে।)

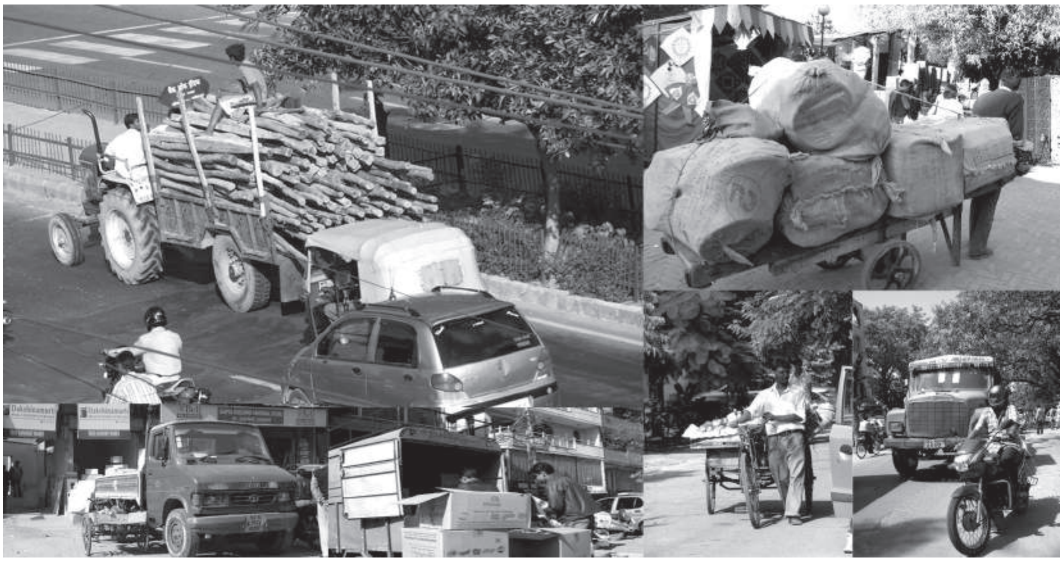

2. সামাজিক জীবনে যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা ঃ

সংবাদপত্র, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, ইন্টারনেট ইত্যাদির মতো গণমাধ্যমগুলো যোগাযোগ মাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে অর্থাৎ যে মাধ্যম খবরা খবর বা তথ্য বহন করে এবং বিশাল সংখ্যার জনগণের দ্বারা সেটা ব্যবহৃত হয়। এটার মধ্যে এই মাধ্যমগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেমন- টেলিফোন, চিঠি, মোবাইল ফোন, ই-মেল এবং ইন্টারনেট। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক জীবনে গণমাধ্যমের পরিবর্তিত স্থান এবং মুদ্রিত সামগ্রী (বই, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন), রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির মুখ্য বিন্যাসের মধ্যে বদল/পরিবর্তনের ক্ষেত্রেগুলোতেও তোমরা অনুসন্ধান করতে পারো। অন্য একটিস্তরে, তোমরা একটি নিদিষ্ট গোষ্ঠীর (শ্রেণি, বয়স-গোষ্ঠী, লিঙ্গ) চলচ্চিত্র, বই ইত্যাদি সম্পর্কে পছন্দ এবং অপছন্দের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারো। নতুন যোগাযোগ মাধ্যম (যেমন- মোবাইল ফোন অথবা ইন্টারনেট) এবং সেটার প্রভাব সম্পর্কে লোকের দৃষ্টিভঙ্গি কী? লোকের জীবনে এগুলোর ভূমিকা কী, এই সম্পর্কে আমরা পর্যক্ষেণ এবং জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে কী জানতে পারি? পর্যবেক্ষণ তোমাদের বিবৃত মতামত এবং প্রকৃত আচরণের মধ্যে পার্থক্যকে (যদি থাকে) বুঝতে সাহায্য করবে। (মানুষ যত ঘণ্টা টেলিভিশন দেখার কথা ভেবে থাকে বাস্তবে কি তত ঘণ্টাই টেলিভিশন দেখে অথবা তাদের দৃষ্টিতে কতঘণ্টা টেলিভিশন দেখা উচিত ইত্যাদি)। বিন্যাস পরিবর্তনের কিছু ফলাফল কী? (উদাহরণস্বরূপ, বাস্তবিক ক্ষেত্রে টেলিভিশন কি রেডিও এবং সংবাদপত্রের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছে অথবা প্রতিটি বিন্যাস (format) কি এখনও তাদের নিজের নিজের বিশিষ্ট জায়গা দখল করে আছে কী কী কারণে মানুষ/জনগণ কোনো একটি অথবা অন্য আরেকটি বিন্যাস বা মাধ্যমকে বেশি পছন্দ করে?

বিকল্প হিসেবে, তোমরা যোগাযোগ মাধ্যমের (সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, টেলিভিশন ইত্যাদি) বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এবং এই মাধ্যমগুলো কোনো একটি বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে কী ধরনের আচরণ করে থাকে যেমন, বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় শিক্ষা, পরিবেশ, জাতি, ধর্মীয় দ্বন্দ্ব, খেলাধুলার ঘটনা, স্থানীয় বনাম জাতীয় বা আঞ্চলিক সংবাদ ইত্যাদির উপর তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী প্রকল্প করার চিন্তা করতে পারো।

3. গৃহস্থালি উপকরণ এবং সাংসারিক কার্য ঃ

এখানে একটি পরিবারে ব্যবহৃত সব ধরনের উপকরণকে বোঝানো হয়েছে, যেমন- গ্যাস, কেরোসিন অথবা অন্য ধরনের স্টোভ; মিক্সি, গ্রাইন্ডার এবং বিভিন্ন ধরনের ফুড প্রসেসর; কাপড় ইস্ত্রি করার বৈদ্যুতিক অথবা অন্য ধরনের ইস্ত্রি; ওয়াশিং মেশিন; ওভেন, টোস্টার; প্রেসার কুকার ইত্যাদি। সময়ের সঙ্গে কীভাবে সাংসারিক কাজকর্মের পরিবর্তন হয়েছে? এই উপকরণগুলোর সংযোজনের ফলে কাজের ধরনের বিশেষত, পরিবারের মধ্যে শ্রম বিভাজনের ক্ষেত্রে কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে? এই উপকরণগুলোর ব্যবহার কারা করে থাকে? তদের মধ্যে কি বেশিরভাগ মহিলা বা পুরুষ, যুবা বা বয়স্কা, বেতনভোগী বা বেতনহীন কাজের লোক? এই উপকরণগুলো সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের কী ধারণা? এগুলো কি সত্যিকার অর্থে কাজকে সহজ করে দিয়েছে? পরিবারের বয়স ভিত্তিক কাজগুলোতে কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে? (অর্থাৎ এখন কি যুবা/বয়স্কদের করা বিভিন্ন ধরনের কাজে আগের তুলনায় কোনো পার্থক্য দেখা যায়।)

অন্যথায়, তোমরা শুধু এই বিষয়ের উপরও মনোযোগ দিতে পারো যে কিভাবে পরিবারের মধ্যে গৃহস্থালি কাজের বণ্টন করা হয় --- কে কোন্ কাজ করে এবং পরবর্তী সময়ে সেটাতে কোনো পরিবর্তন হয় কি না?

4. সর্বজনীন স্থানের ব্যবহার ঃ

গবেষণার এই বিষয়টি বিভিন্ন সর্বজনীন স্থানের (যেমন- খোলা মাঠ, রাস্তার পাশের জায়গা বা ফুটপাথ, আবাসন কলোনির খালি জমি, সরকারি দফতরের সামনে পড়ে থাকা খালি জায়গা ইত্যাদি) যার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কিছু কিছু খালি জায়গা বিভিন্ন ধরনের ছোটো ছোটো বাণিজ্যিক কার্যকলাপে সাহায্য করে যেমন- রাস্তার পাশে বসা ছোটোখাটো জিনিস বিক্রেতা, ছোটো অস্থায়ী দোকান এবং পার্কিং লট ইত্যাদি। অন্যান্য জায়গাগুলো প্রায় খালি পড়ে থাকতে দেখা যায় কিন্তু সময়মতো এগুলো বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয় — কোনো ধর্মীয় অথবা বিবাহ অনুষ্ঠানে, সর্বজনীন সম্মেলনে, নানা ধরনের আবর্জনা ফেলার জায়গা হিসেবে ... অনেক খালি জায়গা গৃহহীন গরিব লোকেরা বসবাসের জন্য দখল করে নেয় এবং সেটা তাদের ঘর বাড়িতে পরিণত হয়ে যায়। এই ধরনের সাধারণ বিষয়ের উপর তোমরা তোমাদের অনুসন্ধান প্রশ্নের চিন্তা করতে পারো ঃ বিভিন্ন শ্রেণির লোক (যেমন- গরিব, মধ্যবিত্ত, সমৃদ্ধশালী) সর্বজনীন জায়গার ব্যবহার সম্পর্কে কী অনুভব করে? এই শ্রেণির লোকজনের কাছে খালি জায়গা কোন্ ধরনের সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে? তোমাদের আশেপাশে অবস্থিত কোনো খালি জায়গার সময়ের সঙ্গো সঙ্গো কীভাবে পরিবর্তন হয়েছে? এটার জন্য কি কোনো দ্বন্দ্ব অথবা সংঘর্ষের উৎপত্তি হয়েছে? এই ধরনের দ্বন্দ্ব অথবা সংঘর্ষের কারণ কী?

5. বিভিন্ন বয়স-গোষ্ঠীর পরিবর্তনীয় আকাঙ্ক্ষা ঃ

সারাজীবন ধরে তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কি একই ছিল? বেশিরভাগ লোক, বিশেষ করে, তরুণ বয়সে তাদের লক্ষ্য পাল্টাতে থাকে। গবেষণার এই বিষয়টির অন্তর্গত এটা জানতে চেষ্টা করা হয় যে এই পরিবর্তনগুলো কী ধরনের এবং বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে এই পরিবর্তনের কি কোনো নির্দিষ্ট আদর্শ বা নমুনা আছে। এই সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য তোমরা বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বয়স-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থী (উদাহরণস্বরূপ), ৫ম, ৮ম এবং একাদশ শ্রেণি); বিভিন্ন লিঙ্গ; বিভিন্ন পৈতৃক পটভূমি ইত্যাদি থেকে তোমাদের গবেষণা গোষ্ঠী পছন্দ করে নিতে পারো এবং দেখতে পারো সেখানে পরিবর্তনের কোনো বিশেষ নমুনা বা আদর্শ পাওয়া যায় কি না। তোমরা তোমাদের গবেষণা পরিকল্পনায় প্রাপ্তবয়স্কদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে পারো এবং দেখতে পারো এই ধরনের কোনো পরিবর্তন সম্পর্কে তাদের কিছু মনে আছে কিনা এবং বিদ্যালয় যাওয়ার বয়সে যে ধরনের পরিবর্তন হয়, তুলনামূলকভাবে সেই ধরনের কোনো পরিবর্তনের নমুনা কি বিদ্যালয়ের পরের জীবনে দেখা যায়।

6. একটি পণ্যের 'জীবনী' ঃ

তোমাদের নিজের বাড়ির একটি ভোগ্যবস্তু যেমন- টেলিভিশন, মোটর সাইকেল, কার্পেট অথবা একটি আসবাবপত্র সম্পর্কে চিন্তা করো। এটা কল্পনা করার চেষ্টা করো যে ওই পণ্যের জীবনের ইতিহাস কী হবে। তোমরা নিজেকে ওই পণ্য মনে করে তোমার 'আত্ম-জীবনী' লেখো। ওই পণ্যকে তার আজকের অবস্থায় পৌঁছাতে বিনিময়ের কোন্ কোন্ আবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে? তোমরা কি সেই সামাজিক সম্পর্কগুলোকে খুঁজে বের করতে পারো যার মাধ্যমে এই পণ্য উৎপন্ন হয়েছিল, বিক্রয় হয়েছিল এবং ক্রয় করা হয়েছিল? তার মালিকদের জন্য অর্থাৎ তোমার জন্য, তোমার পরিবারের জন্য, সম্প্রদায়ের জন্য এই পণ্যের/বস্তুর সাংকেতিক তাৎপর্য কী?

যদি তোমার/তোমাদের টেলিভিশন (অথবা সোফা-সেট্ অথবা মোটর সাইকেল ...) নিজে চিন্তা করতে এবং বলতে পারত তাহলে তাদের সম্পর্কে কী বলত যাদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে এবং যাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছে (যেমন- তোমার পরিবার অথবা অন্য পরিবার বা গৃহস্থালি যা তুমি কল্পনা করতে পারো)?

গবেষণার বিষয়/ক্ষেত্র	গবেষণা পদ্ধতি / কৌশলের ধরণ	
	পর্যবেক্ষণ	সার্ভে / সমীক্ষা
সর্বজনীন পরিবহণের ধরন ; স্থানীয় রেল বা বাস স্টেশন	ব্যবহারের ধরন, প্রত্যাশিত শিষ্টাচার, জায়গার ভাগাভাগি	সময়ের সঙ্গো হওয়া পরিবর্তন সম্পর্কে মতামত; অভিজ্ঞতা, অসুবিধা ইত্যাদি
গৃহস্থালি উপকরণ (রান্নার ইন্ধনের ব্যবহার/ধরন; ফ্যান, কুলার, এয়ার কন্ডিশনার; ইস্ত্রী; ফ্রিজ; মিক্সী ...)	ব্যবহারের নমুনা ; সাংসারিক শ্রম-বিভাজন; লিঙ্গ ক্ষেত্র	বিভিন্ন ধরনের উপকরণের সঙ্গো সম্পর্কিত অনুভব / স্মৃতি
সর্বজনীন স্থানের ব্যবহার (রাস্তার পাশের জায়গা, খালি জমি ইত্যাদি)	বিভিন্ন এলাকায় খালি জমি কীভাবে ব্যবহার করাহয় তা তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করো	নির্দিষ্ট সর্বজনীন স্থানের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের উপর বিভিন্ন অংশের/শ্রেণির লোকের মতামত
বিভিন্ন বয়সে স্কুল-শিশুদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন (উদাহরণস্বরূপ 5,8,11 শ্রেণী)	উপযুক্ত নয়	ছেলে এবং মেয়ে বিভিন্ন বয়সের প্রাপ্তবয়স্ক (স্মৃতি থেকে)
সামাজিক জীবনে যোগাযোগ মাধ্যমের স্থান (মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে স্যাটেলাইট টি.ভি. পর্যন্ত)	সর্বজনীন স্থানে লোকজন কিভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে তা পর্যবেক্ষণ করো — তাদের জীবনে এগুলোর ভূমিকা কী ?	বিভিন্ন ধরনের লোক কত সময় টি.ভি দেখে এবং তাদের পছন্দের কার্যক্রমগুলো কী কী ?

গবেষণা পদ্ধতি / কৌশলের ধরন		
আর্কাইভেল	সাক্ষাৎকার	মন্তব্য / পরামর্শ
পরিবর্তনের ইতিহাসের জন্য সংবাদপত্র এবং অন্যান্য সূত্র	নিয়মিত বনাম অনিয়মিত ব্যবহারকারী; পুরুষ বনাম মহিলা ইত্যাদির মতামত	শুধু বড়ো বড়ো শহরগুলোর জন্য উপযুক্ত ?
বিভিন্নধরনের সামগ্রীর বিজ্ঞাপনের নমুনা	কীভাবে বিভিন্ন ধরনের লোক একটি নির্দিষ্ট সামগ্রীর প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ?	ছেলেদের এই কাজ করতে উৎসাহিত করা; একটি 'মেয়ের বিষয়' যাতে না হয়
বিগত বছর ধরে কোনো নির্দিষ্ট একটি স্থানকে কী ধরনের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল ?	খালি স্থানের /জমির ব্যবহার সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক শ্রেণী, গোষ্ঠীর লোকের মতামত কি ভিন্ন ভিন্ন হয় ?	গবেষণার কাজের জন্য পরিচিত, নির্দিষ্ট স্থানগুলোকে নেওয়া ভালো যা লোকের পরিচিত এবং যে জায়গার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আছে।
অতীতের বস্তুগত উপাদানের প্রাপ্যতার উপর নির্ভরশীল (যেমন এই বিষয়ের উপর বিদ্যালয়ে লেখা প্রবন্ধ)	একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে অথবা বিভিন্ন বয়স-গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের নিজেদের বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করো	সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থী যেন নিজের বিদ্যালয়ের না হয়
সাম্প্রতিক কালের কোনো আগ্রহের বিষয় এবং সঞ্চার মাধ্যমে সেটা সম্প্রচারের বিশ্লেষণ	ফোন আসার পরে চিঠি লেখা বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে লোকের ধারণা কী ?	বিষয়ের প্রাক্-বিচার না করতে চেষ্টা করবে (যেমন- এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে চিঠি লেখা কমে গেছে) — জিজ্ঞেস করো, বলবে না।

NOTES

গাণিতিক অগ্রগতি (Arithmatic Progression) ঃ 'অগ্রগতি — গাণিতিক' দেখো।

আত্তীকরণ (*Assimilation*) ঃ আত্তীকরণ হল সাংস্কৃতিক একীকরণ এবং সমশ্রেণিভুক্তকরণের একটি পদ্ধতি যার দ্বারা নতুন অন্তর্ভুক্ত হওয়া অথবা নিম্ন শ্রেণির লোকেরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলে এবং প্রভাবশালী সংখ্যাগরিষ্ঠদের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে নেয়। আত্তীকরণ জোরপূর্বক অথবা স্বেচ্ছাকৃত হতে পারে এবং সাধারণত অসম্পূর্ণ অথবা থেমে থাকে যেখানে নিম্নশ্রেণির অথবা নতুন অন্তর্ভুক্তদের সমানভাবে পূর্ণ সদস্যতা দেওয়া হয় না। উদাহরণস্বরূপ, যখন কোনো অভিবাসী সম্প্রদায়কে প্রভাবশালী সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় এবং বিবাহের সম্পর্ক স্থাপনে বাধা দেওয়া হয়।

কর্তৃত্ববাদ (*Authoritarianism*) ঃ এক ধরনের সরকার যা জনগণের কাছ থেকে তার বৈধতা আহরণ করে না। এটা গণতান্ত্রিক অথবা প্রজাতান্ত্রিক ধরনের সরকার নয়।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ (*Birth Control*) ঃ গর্ভধারণ এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য গর্ভনিরোধক কৌশলের ব্যবহার।

বি.পি.ও (*BPO-(Business Process Outsourcing)* ঃ একটি পদ্ধতি যেখানে উৎপাদন পদ্ধতির একটি নির্দিষ্ট অংশে অথবা সেবা শিল্পের কোনো অংশে তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে কাজ করানোর জন্য চুক্তি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি টেলিফোন কোম্পানি যা ফোনের লাইন এবং সেবা প্রাপ্তি ঘটায়, যা তার 'গ্রাহক সেবা' বিভাগ বাইরে থেকে সংগ্রহ করে অর্থাৎ অন্য একটি ছোট কোম্পানিকে গ্রাহকদের সকল ধরনের ফোন সংক্রান্ত অভিযোগ পরিচালনা করার জন্য সংযুক্ত করে।

মূলধন (*Capital*) ঃ বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের একত্রিত পুঁজি। সাধারণত 'সক্রিয়' পুঁজি অর্থাৎ যে পুঁজি শুধু সংরক্ষিত বা জমা নয়, কিন্তু তাকে বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং এটার সঙ্গে যুক্ত করতে মূলধন বা পুঁজি বাড়াতে চায় — এটা হচ্ছে সংগ্রহ বা আহরণ পদ্ধতি।

পুঁজিবাদ (*Capitalism*) ঃ উৎপাদনের উপায় যা সাধারণীকৃত পণ্য উৎপাদনের উপর নির্ভর করে, অথবাএকটি সমাজ ব্যবস্থা যেখানে (a) ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং বাজার সকল অংশে অনুপ্রবেশ করে, শ্রমশক্তিসহ সবকিছুকেই বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিবর্তিত করেছে; (b) দুটি মুখ্য শ্রেণি গঠিত হয় — একটি মজুরি শ্রমিকদের দল যাদের কাছে নিজেদের শ্রমশক্তি (তাদের কাজ করার ক্ষমতা) ছাড়া আর কিছুই নেই এবং পুঁজিপতিদের একটি শ্রেণি, যাদের পুঁজিপতি রূপে টিকে থাকার জন্য প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থ ব্যবস্থায় পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে এবং সবসময় বৃদ্ধি হতে থাকা লাভের আয় করতে হবে।

ধনাত্মক কার্য (*Checks - positive*) ঃ টি.আর. ম্যালথুস এই শব্দটির ব্যবহার করেন যার দ্বারা মানুষের ইচ্ছার বিচার না করে প্রকৃতির দ্বারা আরোপিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিরোধকে বোঝানো হয়। এই ধরনের প্রতিরোধকের উদাহরণ হল — খরা, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি।

প্রতিরক্ষামূলক কার্য (*Checks - preventive*) ঃ টি.আর. ম্যালথুস এই শব্দটির ব্যবহার করেন যার দ্বারা এটা বোঝানো হয় সে মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের উপর কিছু প্রতিরোধ আরোপ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিরোধক হিসেবে। এই ধরনের কিছু প্রতিরোধকের উদাহরণ হল — বিলম্বিত বিবাহ এবং কৌমার্য পালন অথবা জন্ম নিরোধকের ব্যবহার।

নাগরিক সমাজ (*Civil Society*) ঃ সমাজের একটি অংশ যা পরিবারের বাইরে কিন্তু সেটা বাজার বা রাষ্ট্রের কোনো অংশ নয়। সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ধর্মীয় অথবা অন্যান্য অ-বাণিজ্যিক এবং অ-রাষ্ট্রীয় যৌথ অগ্রগতির জন্য বানানো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের আওতায় পড়ে।

শ্রেণি (*Class*) ঃ উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে আয় এবং সম্পদের পরিমাণের মধ্যে, জীবনশৈলী এবং রাজনৈতিক পছন্দসমূহের মধ্যে সাধারণ অথবা সম অবস্থানের ভিত্তিতে গঠিত একটি অর্থনৈতিক গোষ্ঠী।

উপনিবেশবাদ (*Colonialism*) ঃ যে চিন্তাধারার মাধ্যমে একটি দেশ অন্য একটি দেশ দখল করে এবং উপনিবেশ গড়ে তোলে (বলপূর্বক বসতি স্থাপন করে এবং শাসন করে)। এই উপনিবেশটি ঔপনিবেশিক দেশের শাসিত অঞ্চলে পরিণত হয় এবং বিভিন্নভাবে সেটাকে শোষণ করাহয় ঔপনিবেশিক লাভের জন্য। এই ধারণাটি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত কিন্তু লুটপাট করে প্রস্থান বা দূর থেকে শাসন করে না (সাম্রাজ্যবাদের মতো) বরং আরও বেশি টেকসই স্বার্থ জড়িত থাকে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য এবং উপনিবেশকে শাসন করার জন্য (অর্থাৎ বিস্তারিত পরিচালনা করা এবং অকুস্থলে থেকে দমন করা)।

পণ্যকরণ (*Commodification or commoditisation*) ঃ একটি অ-পণ্যের (অর্থাৎ কোনোকিছু যা বাজারে আনা হয় না এবং অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করা হয় না) পণ্যে পরিবর্তন হওয়া।

পণ্য (Commodity) ঃ কোন বস্তু বা সেবা যা বাজারে আনা হয় এবং বিক্রি করা হয়।

পণ্যের বস্তুকাম (*Commodity fetishism*) ঃ পুঁজিবাদের একটি অবস্থা যার অধীনে সামাজিক সম্পর্কগুলোকে 'জিনিসের মধ্যে সম্পর্কের' মতো প্রকাশ করা হয়।

সম্প্রদায় (*Community*) ঃ কোনো একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক গোষ্ঠীকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয় যার সদস্যরা সচেতনভাবে স্বীকৃত সামঞ্জস্য এবং আত্মীয়তার বন্ধন, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির দ্বারা জড়িত থাকে। এই ধরনের সামঞ্জস্যের বিশ্বাস তাদের অস্তিত্বের প্রকৃত প্রমাণের চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যবহার/ ভোগ (*Consumption*) ঃ ব্যক্তি (ক্রেতা)র কেনা কোনো জিনিস বা বস্তুর চূড়ান্ত ব্যবহার।

গণতন্ত্র (*Democracy*) ঃ এক ধরনের সরকার যা জনগণের কাছ থেকে বৈধতা পায় এবং নির্বাচনের মাধ্যমে অথবা জনগণের মতামত নির্ণয়ের অন্য কোনো পদ্ধতির মাধ্যমে স্পষ্ট জনপ্রিয় অনুমোদনের উপর নির্ভর করে।

অভিমুখ (*Discourse*) ঃ সামাজিক জীবনে একটি নির্দিষ্ট দিক বা বিষয় নিয়ে চিন্তার কাঠামো। যেমন অপরাধমূলক অভিমুখ বলতে বোঝায় এই নির্দিষ্ট সমাজের মানুষ অপরাধ সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করে।

বৈষম্য (*Discrimination*) ঃ যে সুযোগ সুবিধা সাধারণত অন্যান্যরা পেয়ে থাকে, যেমন পণ্যদ্রব্য, সেবা, চাকরি, সম্পদ ইত্যাদির উপলব্ধি থেকে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সদস্যদের অহেতুক বঞ্চনা করার যে চর্চা, আচরণ বা কাজ করা হয়ে থাকে। বৈষম্যকে পক্ষপাত থেকে আলাদা করে দেখতে হবে, যদিও দুটোই কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

বৈচিত্র্যতা /সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা (*Diversity (Cultural Diversity)*) ঃ বৈচিত্রতা বলতে বৃহত্তর জাতীয় ক্ষেত্রে বা আঞ্চলিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় যাদের ভাষা, ধর্ম, অঞ্চল, গোষ্ঠী ইত্যাদির ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়, তাদের উপস্থিতিকে বোঝায়। বলা যায় পরিচিতির সংখ্যাধিক্য বা একাধিকত্ব।

প্রভাবশালী জাতি (*Dominant Caste*) ঃ মধ্যবর্তী বা উচ্চ মধ্যবর্তী অবস্থানে অবস্থিত জাতি যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং নতুন নতুন ভূমির মালিকানার অধিকার পেয়েছে। এই সংযোগ জাতিগুলোকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম এলাকায় রাজনৈতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে এবং সামাজিকভাবে প্রভাবশালী করে তোলে। এই প্রভাবশালী জাতি আগের পুরনো প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল জাতিকে প্রতিস্থাপিত করে; পূর্ববর্তী জাতিগুলোর অসদৃশ, তারা 'দ্বিজ' নয় (অর্থাৎ তারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অথবা বৈশ্য বর্ণের অন্তর্ভুক্ত নয়)।

অর্থনৈতিক নৃতত্ব (*Economic anthropology*) ঃ সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃতত্বের উপ-ক্ষেত্র যা প্রাক্-ঐতিহাসিক, ঐতিহাসিক এবং গোষ্ঠীর তথ্যের ভিত্তিতে অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির পুরো পরিসীমা অধ্যয়ন করে, বিশেষকরে, অ-বাজার অর্থনীতির।

অনুবিদ্ধ (*Embedded*) ঃ 'সামাজিকভাবে অনুবিদ্ধ' সমাজ অথবা সংস্কৃতির বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান যা একটি পদ্ধতি বা ঘটনাকে 'গঠিত' অথবা প্রাসঙ্গিক করে তোলে। যেমন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজে অনুবিদ্ধ বলতে বোঝায় যে সেগুলো সমাজে বিদ্যামান এবং কাজ করতে সক্ষম কারণ সমাজ সেটার নেপথ্য নীতি এবং ব্যবস্থা গুলো সম্ভবপর করে তোলে।

অন্তর্বিবাহ (*Endogamy*) ঃ সাংস্কৃতিকভাবে সংজ্ঞায়িত গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বিবাহ। উদাহরণস্বরূপ, জাতি বিবাহ।

পরিগণনা (*Enumeration*) ঃ আক্ষরিক অর্থে 'সংখ্যায়িত করা'; অর্থাৎ গণনা এবং পরিমাপের পদ্ধতি বোঝায়, বিশেষত যা মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত, যেমন একটি জনগণনা অথবা সমীক্ষা।

মহামারী (*Epidemic*) ঃ গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভুত। মহামারী বলতে বোঝায় কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে কোনো একটি রোগের আকস্মিক হারে বৃদ্ধি। এখানে মুখ্য বিষয় হল ঘটনার হার (অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ে কতগুলো নতুন রোগীর ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে যেমন একদিনে, এক সপ্তাহে অথবা একমাসে) যা 'স্বাভাবিক' হারের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে। এটা এক ধরনের আংশিক আত্মপ্রকাশক সিদ্ধান্ত হতে পারে। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় যদি কোনো রোগের তীব্র কিন্তু অপরিবর্তনীয় হার দেখা যায় (অর্থাৎ হঠাৎ করে রোগের হার বৃদ্ধি হয় না), সেটাকে আঞ্চলিক রোগ (endemic disease) বলা হয়ে থাকে। অন্যদিকে, মহামারী বা epidemic যা কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় সীমাবদ্ধ নয় এবং আরও ব্যাপকভাবে ছড়ানো (অর্থাৎ জাতীয়, আন্তর্জাতিক এমনকি বিশ্বব্যাপী) তাকে পৃথিবীব্যাপী রোগ (pandemic disease) বলা হয়।

গোষ্ঠীর শোধক (*Ethnic cleansing*) ঃ অন্যান্য গোষ্ঠীর জনগণের গণবিতাড়নের মাধ্যমে নৃজাতিয় ভিত্তিতে সমপ্রকৃতির অঞ্চল সৃষ্টি করা।

গোষ্ঠীকতা (*Ethnicity*) ঃ একটি জাতির গোষ্ঠী বলতে বোঝায় যার সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিচয়ের স্বতন্ত্র সচেতনতার অংশীদার এবং অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে নিজেদের পৃথক করে রাখে।

বহির্বিবাহ (*Exogamy*) ঃ এটার অন্তর্গত একজন ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর বাইরে বিবাহ বন্ধনে লিপ্ত হয়।

পরিবার (*Family*) ঃ পরিবার ব্যক্তিবর্গের এমন এক সমষ্টি যা আত্মীয়তার সম্পর্কের মাধ্যমে সংযুক্ত, এখানে বয়স্ক সদস্যরা বাচ্চাদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিজেরা পালন করে থাকে।

প্রজনন ক্ষমতা (*Fertility*) ঃ মানব জনসংখ্যার প্রেক্ষাপটে, এটার বিশেষত্ব মানুষের প্রজনন অর্থাৎ সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত। যেহেতু প্রজনন প্রাথমিকভাবে মহিলা কেন্দ্রিক পদ্ধতি, তাই প্রজনন ক্ষমতা মহিলা-জনসংখ্যা অর্থাৎ সন্তান জন্ম দেওয়ার বয়সি গোষ্ঠীর মহিলাদের সংখ্যার নিরিখে হিসেব করা হয়।

লিঙ্গ (*Gender*) ঃ সামাজিক ধারণায়, এই শব্দ পুরুষ এবং মহিলাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক রূপে উৎপন্ন পার্থক্য বোঝানোর জন্য প্রয়োগ করা হয় (এটা 'যৌন' (*Sex*) শব্দ থেকে ভিন্ন যা পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে শারীরিক-জীব বিজ্ঞানীয় পার্থক্যকে বুঝায়)। প্রকৃতি 'যৌন' পার্থক্য উৎপাদন করে এবং সমাজ লিঙ্গা-ভিত্তিক পার্থক্য উৎপাদন করে।

জ্যামিতিক অগ্রগতি (*Geometric Progression*) ঃ 'অগ্রগতি-জ্যামিতিক' দেখো।

বিশ্বায়ন (*Globalisation*) ঃ অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তিগত, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের এক জটিল শৃঙ্খলা যা বিভিন্ন স্থানের মানুষ এবং অর্থনৈতিক-কর্মকর্তাদের (কোম্পানির) মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা, একীকরণ এবং মিথঃস্ক্রিয়াকে বাড়িয়ে তোলে।

একীকরণ (*Integration*) ঃ সাংস্কৃতিক বন্ধন একটি পদ্ধতি যেখানে সংস্কৃতিগত বিভেদকে ব্যক্তিগত ক্ষেত্র পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখে সকল গোষ্ঠীর জন্য একটি সর্বজনীন সংস্কৃতি গ্রহণ করা হয়। সাধারণত এখানে প্রভাবশালী সংস্কৃতিকে সরকারিভাবে গ্রহণ করার পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত থাকে। সাংস্কৃতিক পার্থক্য বা অসাধারণতাকে এখানে উৎসাহিত করা হয় না এবং কখনও কখনও সর্বজনীন ক্ষেত্রে সেটাকে নিষিদ্ধও করা হয়ে থাকে।

যজমানী প্রথা (*Jajmani System*) ঃ জাতি ব্যবস্থা এবং প্রথাগত পদ্ধতির ভিত্তিতে, গ্রামীণ ভারতে (উত্তর ভারতে) উৎপাদন, পণ্য এবং সেবার টাকা-পয়সা ছাড়া, বাজার-বিহীন আদান-প্রদান।

জাতি (*Jati*) ঃ চতুঃবর্ণের একটি অঞ্চল ভিত্তিক পর্যায় ক্রমিক শ্রেণিবিন্যাস হল জাতি যেখানে তাদের পরিসীমার মধ্যেই বিবাহ সংগঠিত হয়, উত্তরাধিকার সূত্রে পেশা গ্রহণ করা হয় এবং সেটা জন্মগতভাবে ধার্য করা। এটা এক ধরনের ঐতিহ্যগত বা গতানুগতিক ব্যবস্থা, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

আত্মীয়তা (*Kinship*) ঃ এক ধরনের সম্পর্ক যা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এবং বিবাহ সূত্রে আত্মীয়তার মাধ্যমে অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে রক্তের সম্পর্কিতদের (মা, বাবা, ভাই-বোন, সন্তান ইত্যাদি) মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রমশক্তি (*Labour power*) ঃ শ্রমের ক্ষমতা; মানুষের মানসিক এবং শারীরিক সামর্থ যা উৎপাদন পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয় (যা 'শ্রম' মানে কাজ সম্পন্ন করা, থেকে ভিন্ন)।

অবাধ নীতি (*Laissez-faire*) ঃ (আক্ষরিক ফরাসি অর্থে 'হতে দাও' অথবা 'একা থাকতে দাও') — একটি অর্থনৈতিক দর্শন যা মুক্ত বাজার প্রথা এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে যৎসামান্য সরকারি হস্তক্ষেপ সমর্থন করে।

উদারীকরণ (*Liberalisation*) ঃ যে পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে শিথিল করা হয় এবং বাজার শক্তিকে সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া হয়। সাধারণত, আইনকে আরও উদার এবং অনুমতিসূচক করার পদ্ধতি।

জীবন সম্ভাবনা (*Life-chances*) ঃ একজন ব্যক্তির জীবনে পাওয়া সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা অথবা সম্ভবপর কৃতিত্ব।

জীবন শৈলী (*Lifestyle*) ঃ জীবন যাপনের একটি উপায়; আরও ভালোভাবে বললে ভোগ বা খরচের একটি নির্দিষ্ট ধরন এবং মাত্রা যা একটি নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনধারাকে সংজ্ঞায়িত করে।

বাজারীকরণ (*Marketisation*) ঃ সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে বাজার ভিত্তিক সমাধানের ব্যবহার।

বিবাহ (*Marriage*) ঃ দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে যৌন সম্পর্কের সামাজিক স্বীকৃতি এবং অনুমোদন।

সংখ্যালঘু গোষ্ঠী (*Minority groups*) ঃ কোনো নির্দিষ্ট সমাজে অল্পসংখ্যক লোকের একটি গোষ্ঠী, যা স্বতন্ত্র শারীরিক অথবা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং সেই সমাজের বৈষম্যমূলক পরিস্থিতির শিকার। জাতিগত সংখ্যালঘুদের এই ধরনের গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

উৎপাদন পদ্ধতি (*Mode of production*) ঃ মার্কস এর ঐতিহাসিক বস্তুবাদে, উৎপাদনের শক্তি এবং উপাদানের সম্পর্কের একটি নির্দিষ্ট সমন্বয় যা ঐতিহাসিকভাবে স্বতন্ত্র একটি সামাজিক সংগঠন সৃষ্টি করে।

আদান-প্রদান (*Reciprocity*) ঃ একটি অ-বাজার অর্থনীতিতে, অবিধিবদ্ধ, সাংস্কৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত পণ্য এবং সেবার বিনিময় (বাণিজ্য)।

ভূমিকা দ্বন্দ্ব (*Role conflict*) ঃ একই ব্যক্তির দ্বারা যে সব সামাজিক ভূমিকা পালনের প্রত্যাশা করা হয়, সে সব বিভিন্ন সামাজিক ভূমিকার মধ্যে দ্বন্দ্ব। উদাহরণস্বরূপ, একজন কর্মরত পিতা কর্মী হিসেবে তার ভূমিকা এবং পিতা অথবা স্বামীর ভূমিকার মধ্যে ভূমিকা দ্বন্দ্বের অভিজ্ঞতা পেতে পারে।

একক বিবাহ (*Monogamy*) ঃ একজন ব্যক্তি একই সময়ে শুধুমাত্র একজনের সঙ্গেই বিবাহ সূত্রে আবন্ধ হতে পারবে। এই পদ্ধতির অন্তর্গত, সময়ে একজন ব্যক্তির শুধুমাত্র একজন স্ত্রী এবং একজন মহিলার শুধুমাত্র একজন স্বামী থাকতে পারে।

জন্মগত পরিবার (*Natal family*) ঃ একজন ব্যক্তি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, সেটাই তার জন্মগত পরিবার। (বিবাহ সূত্রে পাওয়া পরিবারের থেকে ভিন্ন)।

রাষ্ট্র (*Nation*) ঃ এমন একটি সম্প্রদায় যা নিজেকে একটি সম্প্রদায় বলে বিশ্বাস করে এবং সাধারণ ভাষা, ভৌগোলিক এলাকা, ইতিহাস, ধর্ম, বর্ণ, নৃজাতিয়তা, রাজনৈতিক আকাঙ্খা ইত্যাদি অংশীদারী বৈশিষ্ঠ্যগুলোর উপর নির্ভরশীল। যদিও এমন এক বা একাধিক বৈশিষ্ঠ্য ছাড়াও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকতে পারে। একটি রাষ্ট্র তার জনগণ দ্বারা গঠিত হয় যারা সেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, উদ্দেশ্য এবং শক্তির চরম নিরাপত্তা প্রদান করে।

জাতি-রাষ্ট্র/রাষ্ট্র-রাজ্য (*Nation-State*) ঃ একটি নির্দিষ্ট ধরনের রাষ্ট্র, যা আধুনিক বিশ্বের বিশেষত্ব, যেখানে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে এবং সেখানে বসবাসকারী জনগণকে নাগরিক বলা হয় যারা নিজেদের এই একক রাষ্ট্রের অংশ বিশেষ মনে করে। রাষ্ট্র-রাজ্য জাতীয়তাবাদের সূচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, যদিও জাতীয়তাবাদী আনুগত্য সবসময় বিদ্যমান নির্দিষ্ট রাজ্য সীমানা মেনে চলে না। জাতি-রাষ্ট্র ইউরোপে উদ্ভুত উত্থাপিত রাষ্ট্র-রাজ্যের অংশরূপে বিকশিত হয়, কিন্তু বর্তমান সময়ে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিস্তার লাভ করছে।

জাতীয়তাবাদ (*Nationalism*) ঃ নিজের রাষ্ট্রের প্রতি এবং রাষ্ট্র সম্পর্কিত সব কিছুর প্রতি প্রতিশ্রুতি, সাধারণত আবেগ-সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি। রাষ্ট্রকে প্রথম স্থান দেওয়া, সেটার স্বপক্ষে পক্ষপাতি হওয়া ইত্যাদি। এক্ষেত্রে চিন্তাধারা এমন যে ভাষা, ধর্ম, ইতিহাস, বর্ণ, গোষ্ঠীকতা ইত্যাদির মিল সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র এবং অনন্য করে তোলে।

পূর্ব ধারণা (*Prejudire*) ঃ কোনো ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী সম্পর্কে পূর্বকল্পিত ধারণাকে ধরে রাখা, নতুন তথ্যের ভিত্তিতেও যে ধারণা পরিবর্তনের প্রতিরোধী। পূর্ব ধারণা ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক হতে পারে, কিন্তু সাধারণত নেতিবাচক বা ক্ষতিকারক পূর্ব পরিকল্পনা রূপে ব্যবহৃত হয়।

কৃষি উৎপাদনশীলতা (*Productivity of agriculture*) ঃ প্রতি একক এলাকায় (যেমন একর, হেক্টর, বিঘা ইত্যাদি) উৎপাদিত কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ (অর্থাৎ খাদ্যশস্য বা অন্যান্য ফসলের পরিমাণ)। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি মানে চাষ পদ্ধতি এবং নিবেশের (*input*) মান পরিবর্তনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধি, কিন্তু চাষ-এলাকার কোনো বিস্তার হয় না। এই ধরনের পরিবর্তনের উদাহরণ হল ট্রাক্টরের ব্যবহার, সার ও উন্নতমানের বীজ প্রয়োগ ইত্যাদি।

অগ্রগতি গাণিতিক (*Progression-arithmatics*) ঃ নম্বরের একটি সারি অথবা ক্রম যা যে কোন নম্বর দিয়ে শুরু হতে পারে, কিন্তু প্রতিটি পরবর্তী নম্বর পূর্ববর্তী নম্বরের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ (নম্বর) যোগ করে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ 6, 10, 14, 18 ইত্যাদি যেখানে 6 হল একটি ইচ্ছানুযায়ী শুরুর সংখ্যা, কিন্তু 10=6+4; 14=10+4; 18= 14+4 এবং এইভাবে চলতে থাকে।

অগ্রগতি-জ্যামিতিক (*Progression-geometric*) ঃ নম্বরের একটি সারি অথবা ক্রম যা যেকোন নম্বর দিয়ে শুরু হতে পারে, কিন্তু প্রতিটি পরবর্তী নম্বর পূর্ববর্তী নম্বরের সঙ্গে একটি ধ্রুবক গুণিতক (*constant multiple*) গুণ করে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ 4, 20, 100, 500 ইত্যাদি ইত্যাদি যেখানে 4 হল একটি ইচ্ছানুযায়ী শুরুর সংখ্যা, কিন্তু 20=4X5; 100=20X5; 500=100X5 এবং এইভাবে চলতে থাকে।

আত্মবাচক (*Reflexive*) ঃ আক্ষরিক অর্থে, নিজের দিকে ফিরে দেখা। আত্মপ্রকাশ (অথবা স্ব-আত্মবাচক) তত্ত্ব যা শুধুমাত্র বিশ্বের ব্যাখ্যা করতে চায় না সেই সঙ্গে বিশ্বের মধ্যে নিজস্ব ক্রিয়াকলাপকেও ব্যাখ্যা করে। তাই, আত্মবাচক সমাজতত্ত্ব অন্যান্য যে বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করতে চায় তার সঙ্গে সমাজতত্ত্বকেও একটি সামাজিক ঘটনা হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। সাধারণত, তত্ত্ব তার বস্তুর ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, নিজেদের নয়।

আঞ্চলিকতাবাদ (*Regionalism*) ঃ একটি নির্দিষ্ট আঞ্চলিক পরিচয়ের প্রতিশ্রুতির মতাদর্শ যা ভৌগোলিক ভিত্তি ছাড়াও ভাষা, গোষ্ঠীকতা এবং আরও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেও হতে পারে।

উৎপাদনের সম্পর্ক (*Relations of production*) ঃ উৎপাদনের দৃষ্টিতে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক, বিশেষ করে যারা মালিকানা এবং শ্রমের সঙ্গে জড়িত।

প্রতিস্থাপন স্তর (*Replacement Level*) ঃ উর্বরতার স্তর যেখানে বর্তমান প্রজন্ম শুধুমাত্র সেই সংখ্যক সন্তানের জন্ম দেয় নিজেদের প্রতিস্থাপিত করতে, যাতে পরবর্তী প্রজন্মেও বর্তমান প্রজন্মের সমান সংখ্যক (পূর্ণ জনসংখ্যা) মানুষ থাকে। এটার অর্থ হল যে স্ত্রীদের মোটামুটি 2.1 বাচ্চা জন্ম দেওয়ার প্রয়োজন হয় যাতে এটা সুনিশ্চিত হয় যে দম্পতির মৃত্যুর পর তাদের শূন্য স্থান পূরণ হয়ে যাবে (অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক মৃত্যুতে হওয়া ক্ষতি পূরণের জন্য অতিরিক্ত 0.1 প্রয়োজনীয়)। অন্যভাবে বলতে গেলে, মোট উর্বরতা হারের প্রতিস্থাপন স্তর সাধারণ 2.1 হয়ে থাকে।

সংস্কৃতায়ণ (Sanskritisation) ঃ এম.এন. শ্রীনিবাস 'সংস্কৃতায়ণ' শব্দটির উদ্ভাবন করেন এই পদ্ধতিকে বোঝানোর জন্য যেখানে মধ্যবর্তী অথবা নিচু জাতি তাদের চেয়ে উঁচু জাতির, সাধারণত ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় যাদের 'দ্বিজ' বলা হয়ে থাকে, তাদের সামাজিক রীতিনীতিগুলোকে অনুকরণ করে সামাজিক সচলতায় উর্ধ্বগামী হতে চাইত।

ময়লা, আবর্জনা পরিষ্কার করা (*Scavenging*) ঃ মানুষের মল, অন্যান্য আবর্জনা এবং বর্জনীয় পদার্থ হাত দিয়ে পরিষ্কার করার প্রথা। যেসব স্থানে নর্দমার ময়লা যাওয়ার সুব্যবস্থা নেই সেইসব স্থানে এখনও এই প্রথা চালু রয়েছে। এটা এক ধরনের জীবিকা যা অস্পৃশ্য জাতিকে করতে বাধ্য করা হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা (*Secularism*) ঃ এটার ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা ধরণ আছে ঃ (*a*) একটি মতবাদ যার দ্বারা রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে পুরোপুরি আলাদা করে রাখা হয় অর্থাৎ পাশ্চাত্য সমাজের মতো '**চার্চ এবং রাষ্ট্র**'কে আলাদা করা। (*b*) এটি এমন মতবাদ যার অন্তর্গত রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ভেদাভেদ করে না এবং সকলকে সমান সম্মান প্রদর্শন করে। (*c*) সাম্প্রদায়িকতাবাদ-এর জনপ্রিয় বৈপরীত্য অর্থাৎ একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা ধর্মের প্রতি অথবা ধর্মের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক নয়।

সামাজিক নির্মাণবাদ (*Social constructionism*) ঃ যে পরিপ্রেক্ষিত বাস্তবতার ব্যাখ্যা করতে সমাজের ওপর বেশি জোর দেয়। এটা বাস্তবতার অর্থ এবং বিষয়বস্তু নির্ধারণে নির্ণায়কের কাজ করে যে জীব বিজ্ঞান বা প্রকৃতি, সেটা বাদ দিয়ে বরং সামাজিক সম্পর্ক, মূল্যবোধ এং মিথষ্ক্রিয়ার উপর জোর দেয়। (উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক নির্মাণবাদ লিঙ্গ, বৃদ্ধাবস্থা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির মতো ব্যাপারগুলোকে ভৌতিক অথবা প্রাকৃতিক ঘটনা থেকে বেশি সামাজিক ঘটনা বলে বিশ্বাস করে।)

সামাজিক বর্জন (*Social Exclusion*) ঃ বঞ্চনা এবং বৈষম্যের মিলিত ফলাফল, যা কোনো সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সেই সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে পুরোপুরিভাবে অংশগ্রহণ করতে বাধা প্রদান করে। সামাজিক বর্জন কাঠামোগত অর্থাৎ এটা ব্যক্তিগত কার্যের পরিবর্তে সামাজিক পদ্ধতি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর ফল।

পুত্র পক্ষপাত (*Son preference*) ঃ একটি সামাজিক ঘটনা যেখানে কোনো সম্প্রদায়ের সদস্যরা কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্রসন্তান লাভের জন্য কামনা করে থাকে, অর্থাৎ তারা কন্যা সন্তান থেকে পুত্র সন্তানকে বেশি উপযুক্ত মনে করে। পুত্রসন্তান এবং কন্যাসন্তান এর প্রতি সামাজিক ব্যবহার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অথবা সোজাসুজি মানুষকে তাদের পছন্দ এবং উপলব্ধি সম্পর্কে প্রশ্ন করে পুত্র সন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অস্তিত্ব স্থাপন করা যেতে পারে।

রাষ্ট্র (*State*)ঃ একটি বিমূর্ত সত্ত্বা যা গঠিত হয় একগুচ্ছ রাজনৈতিক-আইনি প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা যা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা এবং সেখানে বসবাসকারী জনগণের উপর নিয়ন্ত্রণ দাবি করে। একত্রে সংযুক্ত হওয়া প্রতিষ্ঠানসমূহ যা নির্দিষ্ট আঞ্চলিক এলাকায় বৈধ হিংসা প্রয়োগ করে নিজেদের একাধিপত্য বজায় রাখতে চায়। এই প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্তর্গত হল আইনসভা, বিচারকমণ্ডলী, কার্যনির্বাহী, সেনাবাহিনী, নীতি এবং প্রশাসন। অন্য অর্থে, একটি বড় জাতীয় কাঠামোর অন্তর্গত একটি আঞ্চলিক সরকারকেও এই নাম (রাজ্য, *State*) দেয়া হয়, যেমন- তামিলনাড়ু রাজ্য সরকার।

বাঁধাধরা (*Stereotype*) ঃ মানুষের একটি গোষ্ঠীকে কিছু নির্দিষ্ট এবং অনমনীয় বৈশিষ্ট্য প্রদান করা।

স্তরবিন্যাস (*Stratification*) ঃ সমাজের বিভিন্ন অংশকে 'স্তর' অথবা উপ-গোষ্ঠীর ক্রমোচ্চ বিন্যাস ব্যবস্থা যার সদস্যরা ক্রমোচ্চ বিন্যাস ব্যবস্থায় অনুরূপ সাধারণ অবস্থান উপভোগ করে। স্তর বিন্যাস মানে অসাম্যতা; স্তরবিহীন সাম্যবাদী সমাজ শুধুমাত্র ধারণাগত; যদিও তাদের মধ্যে অন্যান্য ধরনের উপগোষ্ঠী থাকতে পারে কিন্তু সেগুলো ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস এর শর্তে নয়।

স্টক মার্কেট (*Stock Market*) ঃ কোম্পানিগুলোর 'পুঁজি' বা অংশীদারীর বাজার। জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলো অংশীদারী (*Share*) বিক্রয় করে তাদের পুঁজি বা মূলধন বৃদ্ধি করে — অংশীদারি বা *share* হল কোম্পানির সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট অংশ। অংশীদারি অধিকৃত ব্যক্তি (*share holder*) একটি কোম্পানিতে অংশীদারি পাওয়ার জন্য মূল্য প্রদান করে এবং কোম্পানি সেই মূল্য তাদের ব্যবসার কাজে লাগায়। অংশীদারদের কোম্পানির লভ্যাংশ থেকে অর্থ প্রদান করা হয় অথবা প্রত্যেক অংশীদারকে তার অংশীদারির ভিত্তিতে কোম্পানির লাভের একটি অংশ দেওয়া হয়। এই ধরনের অংশীদারি বেচা-কেনার জন্য একটি জায়গা বা পদ্ধতি হল স্টক মার্কেট বা পুঁজি বাজার।

উদ্বৃত্ত মূল্য (*Surplus Value*) ঃ বিনিয়োগ মূল্যের বৃদ্ধি অথবা মূলধনের সমান মূল্য ফিরে পাওয়া; পুঁজিবাদের অন্তর্গত, উদ্বৃত্ত মূল্য উদ্বৃত্ত শ্রম থেকে লব্দ অথবা সম্পন্ন শ্রম যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি সেটা শ্রমিকদের প্রদান করা মজুরির সমান।

সমন্বয়বাদ (*Syncretism*) ঃ একটি সাংস্কৃতিক ঘটনা বা প্রক্রিয়া যার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম অথবা ঐতিহ্যের পরস্পর মিলন অথবা মিশ্রণ। দুটো ভিন্ন ভিন্ন ধার্মিক অথবা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বর্ণসংকর।

উলঙ্ঘন (*Transgression*) ঃ কিছু নিয়মনীতি ভঙ্গ করা; সামাজিকভাবে অথবা সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত নীতি এবং প্রথার বিপরীতে চলা; সামাজিক অথবা সাংস্কৃতিক 'আইন' (সেটা লিখিত অথবা আইনগত নাও হতে পারে) ভঙ্গ করা।

উপজাতি (*Tribe*) ঃ কতগুলো পরিবারের অথবা বংশের (অথবা গোত্রের) মিলিত একটি গোষ্ঠী যারা আত্মীয়তার বন্ধন, গোষ্ঠীকতা, সাধারণ ইতিহাস অথবা আঞ্চলিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অংশীদার। উপজাতি জাতি থেকে ভিন্ন এই অর্থে যে জাতি পারস্পরিকভাবে স্বতন্ত্র জাতির একটি পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতি যেখানে উপজাতি হল একটি একক অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠী (যদিও তাদের মধ্যে বংশ অথবা গোত্রের ভিত্তিতে বিভাজন হতে পারে)।

অস্পৃশ্যতা (*Untouchability*) ঃ জাতি ব্যবস্থার অন্তর্গত একটি সামাজিক অনুশীলন যেখানে নীচু জাতির সদস্যদের শাস্ত্রমতে এতটাই অপবিত্র মানা হয় যে তাদের স্পর্শও অপবিত্রতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক মানদণ্ডে অস্পৃশ্য জাতি সব থেকে নিম্ন স্তরে অবস্থিত এবং তারা বেশিরভাগ সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে বহির্ভূত।

বর্ণ (*Varna*) ঃ আক্ষরিক অর্থে 'রং'; জাতি ব্যবস্থার দেশব্যাপী সংস্করণ যা সমাজকে চারটি বর্ণে অথবা জাতি গোষ্ঠীতে পর্যায়ক্রমে ভাগ করে যেমন- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র।

ভার্চুয়াল মার্কেট (*Virtual Market*)ঃ যে বাজার বা মার্কেট শুধুমাত্র বৈদ্যুতিনভাবে বিদ্যমান এবং কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে লেন-দেন পরিচালনা করা হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে এই বাজারের কোনো অস্তিত্ব নেই, শুধুমাত্র কিছু উপাত্তের মাধ্যমে বৈদ্যুতিনভাবে রক্ষিত থাকে।

ইচ্ছা (*Will*) ঃ আক্ষরিক অর্থে, সাধ বা ইচ্ছা (বেঁচে থাকার ইচ্ছা ইত্যাদি)। কিন্তু বিশেষ্য রূপে, এটা আইনি দলিল যাতে একজন ব্যক্তির নিজের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির কী হবে সেই ইচ্ছা উল্লিখিত থাকে। সাধারণত উত্তরাধিকারের সঙ্গে জড়িত — মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মালিকানা কার হাতে হস্তান্তরিত হবে সেটার সবিস্তার বিবরণী।